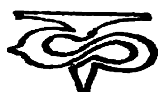
গীতার শিক্ষা
ও
ভারতের আধ্যাত্মিকতা

শ্রীসুব্রতকুমার দিণ্ডা

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯



প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

১৮·০০

ভূমিকা

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কিছু লোকে যেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্মচিন্তা করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্মচিন্তা হয় নাই। ইহার সুফল ও কুফল দুইই হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তার ফলে চতুর্বেদ, ষড় দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, বহুস্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়া ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নহে। সেই জন্য উত্তর গীতার একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয়ও অনেক, কিন্তু সময় (অর্থাৎ মানুষের পরমায়ু) অল্প এবং ইহার ভিতর অনেক বিঘ্নও ঘটে। সুতরাং যাহা সার, কেবল তাহাই গ্রহণীয়। উত্তর গীতার অন্য একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে চন্দনকাষ্ঠবহনকারী গর্দভ যেমন কেবল কাষ্ঠভারই বুঝিতে পারে, চন্দনের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা বহুশাস্ত্র পড়িয়াও তাহার সার বুঝিতে পারে না, তাহারা কেবল শাস্ত্রের বোঝাই বহন করে। ঐ দুইটি উক্তি অনুসারে শাস্ত্রসমূহের সার গ্রহণ করাই প্রত্যেক বুদ্ধিমান হিন্দুর কর্তব্য।

সুখের বিষয় তৎকালীন শাস্ত্রসমূহের সারসংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে অর্জুনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম, মুক্তি, স্থায়ী সুখশান্তিলাভের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শিক্ষাসমূহকে ভিত্তি করিয়া পরে সাত শত শ্লোক রচিত হইয়াছিল এবং শ্লোকগুলি বর্তমান সময় হইতে প্রায় তিনহাজার বৎসর পূর্বে রচিত মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই শ্লোকগুলি গীতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ছোট পুস্তকভাবে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে বর্তমান সময় হইতে সাড়ে ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক। বেদে তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ আছে এবং কোন কোন দেবতার উদ্দেশে কর্মবহুল দ্রব্যময় যাগযজ্ঞ এবং কোন কোন দেবতার উদ্দেশে স্তবস্তুতির ব্যবস্থা ছিল। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের প্রথম অংশে এই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাকে বেদের কর্মকাণ্ড বলা হয়। কিন্তু স্বাধীনভাবে শত শত বৎসরের গভীর চিন্তার ফলে কিছু কিছু ঋষি দেখিলেন যে বেদের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা

ঠিক নহে। সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিমান চিৎশক্তি রহিয়াছেন। তিনিই সমস্ত বিশ্বের পরিচালক ও নিয়ন্তা এবং তাঁহারই নিকট হইতে সমস্ত মানুষ তাহাদের আত্মা লাভ করে। ঋষিগণ এই বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির নাম দিলেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বলিলেন যে এই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করা আমাদের উচিত। তাঁহাদের এই শিক্ষা বেদের দ্বিতীয় বা শেষ অংশে স্থান লাভ করিল এবং ইহা উপনিষদ্ বা বেদান্ত (অর্থাৎ বেদের অন্ত বা শেষভাগ) নামে পরিচিত হইল। ইহাকে বেদের জ্ঞানকাণ্ডও বলা হয়। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল। গীতা বেদের এই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদসমূহের অনুগামী।

কিন্তু গীতায় যে কেবল উপনিষদ্‌সমূহের সারাংশ গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে। জ্ঞানমূলক সাংখ্যদর্শন ও সাধনামূলক যোগদর্শনের যে সমস্ত অংশ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত, তাহাও গীতায় গৃহীত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নাধিকারিগণের জন্য (অর্থাৎ যাহারা দার্শনিক চিন্তা বা সূক্ষ্ম বস্তুর চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের জন্য) বেদের কর্মকাণ্ডের কিছু শিক্ষাকে গীতায় একটা নিম্নস্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সহিত আবার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু পৌরাণিক ধারণাকেও সংযোজিত করা হইয়াছে। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা অনুসারে গীতাকে হিন্দুধর্মের একখানি সারগ্রাহীপুস্তক করা হইয়াছে, এবং ক্ষুদ্রগীতা বা গীতার অনুবাদ পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মের সাধারণ শিক্ষার ও অত্যুচ্চ শিক্ষার যে পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য কোন একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দুধর্মের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। সেইজন্য গীতা সর্বজন আদরণীয় ও সর্বজনমান্য পুস্তক হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু গীতা প্রধানতঃ দার্শনিক পুস্তক হওয়ায়, ইহা সকলের নিকট সমানভাবে সহজবোধ্য নহে। সেইজন্য ইহার প্রধান শিক্ষাসমূহকে আংশিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। আশ্রমধর্মপালন ও চতুর্বর্গ সাধন হিন্দুধর্মের অঙ্গ। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে গীতায় যথাযথভাবে কিছু বলা হয় নাই। এই পুস্তকে এই দুইটি বিষয় সংযোজিত করিয়া, হিন্দুধর্মের আরও ভাল পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। গীতার ভিতর দিয়া যে ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বেদান্তের অনুগামী হওয়ায়, ইহা প্রকৃতপক্ষে বেদান্তধর্ম। সেইজন্য এই পুস্তকে ইহাকে বেদান্তধর্ম বলা হইয়াছে এবং এই বেদান্তধর্মই ভারতের প্রকৃত ধর্ম। পৃথিবীর সার্বজনীন ধর্ম হইবার যোগ্যতা বহুল পরিমাণে এই বেদান্ত ধর্মেরই আছে।

ভারতের যোগিগণ ও সন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ বেদান্ত ধর্মের অনুগামী। শঙ্করাচার্য, রামানুজচার্য, নিম্বাকাচার্য এবং তাঁহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক অনেক আচার্য বেদান্তধর্মের অনুগামী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য একেশ্বরের উপাসক ছিলেন। গীতার কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে) পূজা করিবার কথা বলেন নাই। গীতার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বা একেশ্বরের উপাসনার কথা বলিয়াছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে "ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাঁরি ভিতর দিয়া "ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভকেই" মানুষের ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্যরূপে তিনি সকলের সম্মুখে সর্ব সময় ধরিয়া রাখিয়াছেন।

সুব্রতকুমার দিগুা

সূচীপত্র

গীতার শিক্ষা ও ভারতের আধ্যাত্মিকতা

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। গীতা ও বেদ।

(ক) গীতা।—সংস্কৃত গৈ ধাতুর অর্থ গান করা। গৈ ধাতুর পর ক্ত প্রত্যয় করিলে গীত শব্দের উৎপত্তি হয়। গীত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ গীতা। গীতা শব্দের অর্থ যাহা গান করা হইয়াছে বা গানের মত করিয়া বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহাকে উপনিষদ বা বেদান্ত বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায় উপনিষদ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পূর্বে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য গীত উপনিষদ না বলিয়া, গীতা উপনিষদ বলিতে হয়। গীতা উপনিষদের অর্থ যে উপনিষদ বা অধ্যাত্মতত্ত্বকে গানের মত করিয়া বলা হইয়াছে। যে পুস্তককে আমরা সংক্ষেপে গীতা বলি, তাহার পূর্ণ নাম ভগবদ্গীতোপনিষদ। ভগবতা (ভগবানের দ্বারা অর্থাৎ অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা) গীতা (গাওয়া হইয়াছে) যা উপনিষদ (যে উপনিষদ), তাহা ভগবদ্গীতোপনিষদ।

দিল্লীর অনতিদূরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পূর্বে আত্মীয়-স্বজনের প্রাণহানিকর এই যুদ্ধ করা উচিত কিনা, সেই সম্বন্ধে পাণ্ডবনেতা অর্জুনের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ কেন করা উচিত, পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর, আত্মা, স্থায়ী সুখশান্তিলাভের উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে অর্জুনের মনে যে নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহারও যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। সুতরাং

যে পুস্তককে আমরা সংক্ষেপে গীতা বলি, অধ্যাত্মতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা তাহাতে থাকায়, তাহাও একখানি উপনিষদ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পুস্তক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা এই উপনিষদ গীত হইয়াছিল, সেই জন্য ইহার পূর্ণ নাম ভগবদ্গীতোপনিষদ। ইহাকেই আমরা সংক্ষেপে গীতা বলি। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও তাহার সামান্য অংশমাত্র।

মহাভারত যখন প্রথম লিখিত হইয়াছিল, তখন ইহার শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ ছিল না। নানা উপাখ্যান প্রভৃতি যোগে বৃহৎ কলেবর ধারণ করিয়া পরে ইহা মহান্ ভারতের মহাকাব্যে পরিণত হইয়াছে এবং মহাভারত নাম সার্থক করিয়াছে। গীতাও সম্ভবতঃ এইভাবে পৌরাণিক ধারণাদিযোগে পল্লবিত ও পরিবর্ধিত হইয়া সুন্দর খণ্ডকাব্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে ঠিক কতটুকু বলিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে প্রচলিত গীতার শ্লোক-সংখ্যা সাতশত; কিন্তু উত্তরভারতে প্রকাশিত কোন কোন গীতায় ৭৪৫টি শ্লোক ছাপা হয়।

(খ) **বেদ**।—সংস্কৃত বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম ও মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাই বেদ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বেদের দুইটি বিভাগ চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রথম বিভাগকে কর্মকাণ্ড ও দ্বিতীয় বিভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

সুদূর অতীতের মানুষ অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও অসহায় ছিল। সে দেখিত যে সূর্যচন্দ্র, ঝড়বৃষ্টি, সমুদ্র প্রভৃতি তাহার নিয়ন্ত্রণের অতীত, অথচ এইগুলির কার্য নিয়মিতভাবে চলে। তাহার ধারণা হইয়াছিল যে এইগুলির এক একজন অদৃশ্য চালক দেবতা আছেন এবং মানুষের ভাগ্যনিয়ামক অদৃশ্য অন্য দেবতাগণও আছেন।

যাগযজ্ঞ ও স্তবস্তুতির দ্বারা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, সে ইহলোকে দীর্ঘজীবন ও বাঞ্ছিত দ্রব্যাদি এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখশান্তি লাভ করিতে পারিবে। এইপ্রকার ধারণা হইতে নানাপ্রকার যাগযজ্ঞ ও দেবতাগণের স্তবস্তুতি প্রভৃতির উদ্ভব হইল এবং এইগুলিরই ব্যবস্থা বেদের কর্মকাণ্ডে স্থানলাভ করিল।

কিন্তু কিছু গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এইপ্রকার ধারণা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা গভীর চিন্তার পর স্থির করিলেন যে সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটিমাত্র অতিসূক্ষ্ম ও বুদ্ধিমান চিৎশক্তি বর্তমান আছেন। তাঁহারা এই বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিমান চিৎশক্তির নাম দিলেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চিরকাল আছেন ও থাকিবেন ; সুতরাং তিনি আদিহীন বা অনাদি ও অন্তহীন বা অনন্ত। কোন কিছু হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই, তিনি আপনা হইতেই চিরকাল বর্তমান আছেন, সুতরাং তিনি স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মের জড়রূপা শক্তি প্রকৃতি লীলা করুক—ব্রহ্মের এইপ্রকার ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় ও বিভিন্ন গুণের প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্মের এইপ্রকার ভাবকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় ও গুণের প্রকাশহীন অবস্থাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়। সমস্ত জীবের আত্মা পরমাত্মা হইতে (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে) উদ্ভূত হয় কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের (অর্থাৎ আমিত্ব বোধের) প্রভেদ-বশতঃ জীবে জীবে বহু পার্থক্য ঘটিয়া যায়।

যাহার আদি আছে, তাহার অন্ত ঘটিবেই। ইহাকে দার্শনিক স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে ; সুতরাং তাহাদের অন্ত ঘটিবেই। ধ্বংসের পর ইহারা আবার সেই সূক্ষ্ম একাকার অবস্থায় চলিয়া যাইবে। ইহাকেই প্রলয় বলা হয়। মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর ন্যায় ঈশ্বরেচ্ছায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আবর্তন চলিতে থাকে—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পুনরায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, পুনরায় সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, পরপর অন্তহীনভাবে চলে।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আলোচনা এবং কীভাবে মানুষ স্থায়ী সুখশান্তি লাভ করিতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা বেদের জ্ঞানকাণ্ডে করা হইয়াছে। বেদের এই জ্ঞান-কাণ্ডকে উপনিষদ বা বেদান্ত বলা হয়। বেদের (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) অন্ত (অর্থাৎ শেষ সীমা) বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তে প্রচারিত ধর্ম ও মুক্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে ছাড়াইয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

(গ) গীতা বেদের, প্রধানতঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অনুগামী।

বেদের কর্মকাণ্ডে যে দ্রব্যময় যজ্ঞের কথা আছে, গীতায় তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার উপকারিতা আছে। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। সুতরাং যজ্ঞ মানুষের মনকে ত্যাগের পথে পরিচালিত করিয়া তাহাকে প্রথমে দেবতাভিমুখী এবং পরে ঈশ্বরাভিমুখী করে।

গীতায় জ্ঞানযজ্ঞকে দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ"—গীতা ৪।৩৩ —হে অর্জুন, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ (৪।৩৩)।

মনকে অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জাগতিক দ্রব্যসমূহ হইতে টানিয়া লইয়া এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরে পুনঃ পুনঃ সমাহিত (অর্থাৎ স্থাপিত ও যুক্ত) করিবার চেষ্টাকেই জ্ঞানযজ্ঞ বলা হয়। এই জ্ঞানযজ্ঞের আবশ্যকতার কথা বেদের জ্ঞানকাণ্ডে ও গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং গীতা বেদের অনুগামী এবং গীতাপাঠ করিলে বেদপাঠের কাজ হয়।

(ঘ) গীতার আদর্শে জীবনগঠনেই গীতাপাঠের সার্থকতা।

কিছুক্ষণ ভক্তির সহিত গীতাপাঠ করিয়া গীতাকে সরাইয়া বা তুলিয়া রাখিলে এবং কামনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া নিজের ইচ্ছামত জীবনযাপন করিতে থাকিলে, গীতাপাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ ও সংযত জীবনযাপন করিয়া গীতার আদর্শে

জীবন গঠনের চেষ্টা করিতে থাকিলে, গীতা পাঠ সার্থক হয়। গীতা সকলকে ধর্ম ও মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়।

(৬) **গীতা ও লৌকিক ধর্ম :—**

বেদের দুইটি বিভাগ অনুসারে হিন্দুধর্মও দুইভাগে বিভক্ত—ইহার একটি বিভাগ লৌকিক হিন্দুধর্ম ও অন্যটি দার্শনিক হিন্দুধর্ম। সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত দেবপূজা প্রভৃতি বেদের কর্মকাণ্ডের অনুগামী এবং ইহা রূপান্তরিত বৈদিক ধর্ম বা লৌকিক হিন্দুধর্ম। *বেদের জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তে ও গীতায় ধর্ম ও মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দার্শনিক হিন্দুধর্ম বা বৈদান্তিক ধর্ম বা বেদান্তধর্ম। লৌকিক হিন্দুধর্মে যাহাদের আস্থা নাই, বেদান্তধর্মই তাহাদের পক্ষে অবলম্বনীয়। কেবল ইহাই মানুষকে প্রকৃত ধর্মের পথে ও মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে।

সাধারণ লোকের পক্ষে দ্রব্যময় যজ্ঞের যেমন উপকারিতা আছে, দেবপূজা প্রভৃতিরও ঐভাবে উপকারিতা আছে—ইহা গীতায় বলা হইয়াছে।

বেদের কর্মকাণ্ডে বহুদেবতার ধারণা থাকিলেও, পরবর্তী যুগে গভীরচিন্তাশীল ঋষিগণ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে এক সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বের পরিচালক। প্রাচীনতম ছান্দোগ্য উপনিষদে চিরস্থায়ী বিশ্বসত্তা যে এক ও অদ্বিতীয়, তাহার ধারণা আমরা দেখিতে পাই।

সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ৬।২।২

—হে সৌম্য, অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপে (অর্থাৎ চিরস্থায়ী সত্তারূপে) বর্তমান ছিল।

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ৬।২।৩

—তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হই ও উৎপন্ন হই'

অতএব এক ও অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মের বহুরূপে আত্মপ্রকাশ

---

* যাঁহারা বৈদান্তিক ধর্ম বা বেদান্ত ধর্মের অনুগামী, তাঁহাদিগকে বৈদান্তিক বা বেদান্তী বলা হয়।

করিবার ইচ্ছা হইতে তাঁহার জড়রূপা শক্তি প্রকৃতির বিকাশ হইল এবং প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া চিৎশক্তির আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইতে বহুপ্রকার জীবের উৎপত্তি হইল। অবশেষে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইল।

গীতায় বলা হইয়াছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৫।৭

—আমারই (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সনাতন (বা চিরস্থায়ী) অংশ জীবলোকে জীবরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে (বিষয়ভোগের জন্য) আকর্ষণ করিয়া থাকে।

(মন—অন্তরিন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—বহিরিন্দ্রিয়। উভয়ে মিলিয়া ছয়টি ইন্দ্রিয়)।

ঈশ্বর ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং এই দুইটির সমবায়ে বিশ্ব। ঈশ্বর অতি সূক্ষ্ম চিন্ময় পুরুষ। বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তাঁহার নিকট হইতে চেতনা লাভ করে; সুতরাং তাঁহাকে বিশ্বজনীন পিতা বলা যাইতে পারে। বিশ্বের সমস্ত প্রাণী প্রকৃতির নিকট হইতে তাহাদের দেহ লাভ করে এবং নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দ্রব্যই তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে ও বিভিন্নভাবে সুখদান করে; সুতরাং প্রকৃতিকে বিশ্বজনীন মাতা বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে। যে প্রাকৃতিক শক্তি সমস্ত প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাকে আমরা লক্ষ্মী বলি। এই লক্ষ্মী বা উৎপাদিকা শক্তির পশ্চাতে ঈশ্বরের প্রেরণা বর্তমান, সুতরাং লক্ষ্মীর পূজা করিলে, পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি সমস্ত প্রাণীর দেহ ও তাহাদের দেহধারণের জন্য আবশ্যক বিভিন্ন দ্রব্যকে বিভিন্ন সময়ের জন্য রক্ষা করে, তাহাকে আমরা দুর্গা বলি। এই দুর্গা বা রক্ষিকা শক্তির পশ্চাতে ঈশ্বরের প্রেরণা বর্তমান; সুতরাং দুর্গার পূজা করিলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই

পূজা করা হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ সাধন করিয়া দেয় ও জ্ঞানলাভের জন্য তাহাকে আগ্রহান্বিত করে, তাহাকে আমরা সরস্বতী বলি। এই সরস্বতী বা জ্ঞানোন্মেষিকা শক্তির পশ্চাতে ঈশ্বরের প্রেরণা বর্তমান ; সুতরাং সরস্বতীর পূজা করিলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়। প্রকৃতি মাতৃরূপে কাজ করেন বলিয়া, প্রাকৃতিক শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে পূজা করি। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরই সর্বদা বর্তমান আছেন। সুতরাং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির কথা চিন্তা না করিয়া, আমরা যদি এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরে আমাদের মনকে নিবিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আরাধনা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়া যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্বকম্॥ ৯।২৩

—হে অর্জুন, যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই (অর্থাৎ ঈশ্বরেরই) পূজা করে। (৯।২৩)

অতএব অন্যান্য দেবতার পূজা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের পূজা হইলেও, ইহা অবিধিপূর্বক পূজা। মনকে এক ঈশ্বরের নিবিষ্ট করিয়া পূজা করিলে, তাহাই বিধিপূর্বক পূজা হয়।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মাতনঃ॥ গীতা ৯।২৬

—যিনি আমাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আত্মোন্নতিসাধনে যত্নকারী সেই ব্যক্তি কতৃক ভক্তির সহিত প্রদত্ত সেই সমস্ত দ্রব্য আমি গ্রহণ করি (অর্থাৎ ঈশ্বর গ্রহণ করেন)। (৯।২৬)

সাধারণ মানুষ দিনরাত স্থূল দ্রব্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকে এবং এই-গুলিই সে সহজে বোঝে। দেবমূর্তি, পূজার নানাপ্রকার স্থূল উপকরণ প্রভৃতি তাহার মনে ভক্তির ভাব জাগাইয়া দেয় ও মনকে একাগ্র

করিতে সাহায্য করে। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইলে, তখন আর এইগুলি আবশ্যক হয় না। অতএব ধর্মসাধনার প্রথমাবস্থায় সাধারণ লোকে লৌকিক ধর্মানুযায়ী স্থূল দ্রব্যাদির সাহায্যে যে বাহ্যিক পূজা করে, তাহার উপকারিতা আছে—ইহাই গীতায় বলা হইয়াছে। লৌকিক ধর্মের শিক্ষা কিন্তু গীতার প্রধান শিক্ষা নহে। বৈদান্তিক ধর্মের শিক্ষাই গীতার প্রধান শিক্ষা। এই শিক্ষা কী তাহা ক্রমশঃ এই পুস্তকে বিবৃত হইবে।

হিন্দুধর্মে অধিকারী ভেদ করা হয়। নিম্নাধিকারিগণ লৌকিক হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া উচ্চাধিকারিগণের জন্য নির্ধারিত বেদান্ত ধর্ম অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতধর্ম ও মুক্তির পথে এবং স্থায়ী সুখশান্তি লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২। শাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণে যুক্তি ও বিচারের আবশ্যকতা।

(ক) ভারতে শাস্ত্রারণ্যের সৃষ্টি।

সংস্কৃত শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ ধাতুর অর্থ শাসন করা। সুতরাং শাস্ত্রের কাজ কি করা উচিত বা বিধি এবং কি করা উচিত নহে বা নিষেধ তাহা বলিয়া দেওয়া। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা চলিয়া আসিতেছে; তাহার ফলে ভারতে চতুর্বেদ, ষড় দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, বহু স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শত শত ধর্মগ্রন্থও লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতে শাস্ত্রের এক ভয়াবহ অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অরণ্যে প্রবেশ করিলে অধিকাংশ লোককে ধর্মাধর্মনির্ণয়ে বিভ্রান্ত হইয়া যাইতে হয়।

গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের সামান্য অংশমাত্র। এই মহাভারতের বনপর্বে কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকো ঋষিযস্য মতং প্রমাণম।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

—তর্ক অপ্রতিষ্ঠ (অর্থাৎ তর্কের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই এবং ইহার দ্বারা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না), বেদসমূহ বিভিন্ন, ঋষি একজন নহেন যাঁহার মতকে ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে (অর্থাৎ বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন মত)। ধর্মের তত্ত্ব গুহার অন্ধকারে নিমজ্জিত (অর্থাৎ ঠিকভাবে বোঝা শক্ত)। মহান্ ব্যক্তিগণ যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ।

(খ) যে কোন শাস্ত্রের সারগ্রহণের আবশ্যকতা।

উত্তরগীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়।

যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহুন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ
সঃ॥ ২।৪০

—চন্দনকাষ্ঠ বহনকারী গদভ যেমন কেবল কাষ্ঠের ভার বই বুঝিতে পারে, চন্দনের মাধুর্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও তাহার সার বুঝিতে পারে না, তাহারা গদর্ভের ন্যায় কেবল শাস্ত্রের বোঝাই বহন করে।

অতএব গীতা বা অন্য যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়নের পর, তাহার সার বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(গ) সত্য নির্ণয়ে ও সারগ্রহণে যুক্তি ও বিচারের আবশ্যকতা।

মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। অতএব ধর্ম সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু পাঠ করি বা শুনি, তাহার ভিতর কোথায় কতটুকু সত্য আছে, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা

করা আবশ্যক; কারণ কেবল সত্যেরই শেষ পর্যন্ত জয় হইবে, মিথ্যার জয় হইবে না।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাঁহার টীকায় একটি প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বচনটি এই

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥

—কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নহে। বিচার যুক্তিহীন হইলে ধর্মহানি ঘটিয়া থাকে।

প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক সুস্থদেহে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং মানসিক সুখশান্তি লাভ করিতে চায়। প্রত্যেক ব্যক্তির এই দুইটি উদ্দেশ্যসাধনে আমাদের যে যে কার্য সহায়ক, তাহাই ধর্মানুমোদিত কার্য। অতএব অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করা ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ এবং ধর্মেব ভিতর লোভ ও স্বার্থ-পরতার স্থান নাই। আত্মসংযম ও যথাসম্ভবত্যাগ ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। হিন্দুধর্মে ঈশ্বরচিন্তাকেও ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে গণ্য করা হয়। ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের এইপ্রকার মানদণ্ড আছে। **ধর্ম কেবল কতকগুলি অন্ধবিশ্বাসের সমষ্টি নহে।** যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিতে হয়। আমাদেব সমস্ত কাজকে সত্যের সহিত ও সর্বজনহিতের সহিত যুক্ত রাখাই যথার্থ যুক্তি। অতএব যে কাজ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনহিতসাধনই যে কাজের লক্ষ্য, কেবল তাহাই যুক্তিযুক্ত কাজ।

গীতায় নানাপ্রকার পৌরাণিক ধারণার সমাবেশ থাকায়, গীতা বিশুদ্ধ দার্শনিক পুস্তক নহে। সুতরাং বর্তমান যুক্তিবাদের যুগে গীতার শিক্ষাগ্রহণেও যুক্তি ও বিচারের আবশ্যকতা আছে। যাহা যুক্তিযুক্ত, কেবল তাহাই গ্রহণীয়। বেদ, বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন পুরাণ প্রভৃতির নানাপ্রকার ধারণা গীতায় একত্রে গ্রথিত হওয়ায়, গীতাকে সারগ্রাহী পুস্তক বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩। চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ চতুষ্টয়।

চতুর্বর্গ সম্বন্ধীয় ধারণা হিন্দুধর্মের একটি প্রাচীন ধারণা। একই প্রকারের কয়েকটি জিনিসের সমষ্টিকে একটি বর্গ বলা হয়। ক, খ, গ, ঘ এর উচ্চারণ অনেকটা একই প্রকারের, সেই জন্য ইহারা ক বর্গের অন্তর্গত; এইভাবে চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ প্রভৃতি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটিকে চতুর্বর্গ বলা হয়। কিন্তু এই চারিটি অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের; কীভাবে ইহাদিগকে একই বর্গের বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল? ইহার উত্তর এই যে ইহাদের প্রত্যেকটি প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পক্ষে সমানভাবে প্রয়োজনীয়। সেইজন্য চতুর্বর্গের অন্য নাম পুরুষার্থ চতুষ্টয়। অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন এবং পুরুষার্থ শব্দের অর্থ পুরুষের প্রয়োজন। চতুষ্টয় শব্দের অর্থ চারিটি। অতএব পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অর্থ নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পক্ষে সমানভাবে প্রয়োজনীয় চারিটি জিনিস। এই চারিটি জিনিস—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারিটি জিনিস সকলের নিকট সমানভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদিগকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া চতুর্বর্গ (অর্থাৎ চারিটি সমানভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসের সমষ্টি) বলা হয়।

(ক) ধর্ম।

প্রথম অত্যাবশ্যক জিনিস ধর্ম। বৈশেষিক দর্শনে ধর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"—যাহা হইতে অভ্যুদয় (অর্থাৎ উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (অর্থাৎ মুক্তি) লাভ হয়, তাহা ধর্ম। অতএব ধর্মের দুইটি লক্ষ্য।

ইহার প্রথম লক্ষ্য—সার্বজনীন উন্নতি। কিছু লোকের উন্নতি হইলে, তাহা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সমাজের সমস্ত লোক অর্থাৎ কোটি কোটি দেহধারী মানুষ যখন স্বচ্ছন্দে দেহধারণের জন্য অন্নবস্ত্রগৃহঔষধপথ্যাদি লাভ করিতে পারিবে, কেবল তখনই

বলা যাইতে পারিবে যে সমাজ ধর্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। লোভী ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এই ধর্মের পথে অন্তরায়। অন্যের কথা চিন্তা না করিয়া তাহারা কেবল নিজেদের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করে। কখন কখন বাহ্যিক পূজা প্রভৃতি করিয়া তাহারা মনে করে যে তাহারা ধর্মপালন করিতেছে, কিন্তু ইহা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। অতএব নিজের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, অন্যের মঙ্গলচিন্তা করাও সেইভাবে আবশ্যক। কিভাবে সকলের অভ্যুদয় বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার চিন্তা করা এবং নিজের বাসনা ও লোভকে সংযত করিয়া অন্য লোকের উন্নতিতে সহায়তা করা ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। গীতায় বলা হইয়াছে

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ গীতা ৬।৩২

—হে অর্জুন, যিনি নিজের উপমা দ্বারা সুখ বা দুঃখকে সকলের মধ্যে সমানভাবে দেখেন, তিনিই পরমযোগী বা ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি। (৬।৩২)

অতএব ধার্মিক ব্যক্তি অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখের ন্যায় মনে করেন এবং কোন উপায় থাকিলে, তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করেন। তিনি অন্যের সুখে সুখী হন।

ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষ্য—নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ। মুক্তি বলিলে, সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট হইতে ও পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি বোঝায়। মুক্ত-পুরুষের জীবন আনন্দময় জীবন। ইহলোকে জীবন্মুক্তি ও পরলোকে পূর্ণমুক্তি—ইহাই মুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তির লক্ষ্য।

(খ) **অর্থ।**

প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে দ্বিতীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্য অর্থ। অর্থ ব্যতীত পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভব নহে। অর্থ শব্দের দ্বারা কেবল যে সরকারী মুদ্রা বা নোট বোঝায় তাহা নহে। এইগুলি কৃত্রিম অর্থ। জীবনধারণের জন্য যে অন্নবস্ত্রগৃহাদি আবশ্যক, সেইগুলিই প্রকৃত অর্থ। অরণ্যবাসী বা গুহাবাসী সন্ন্যাসীকেও জীবনধারণের জন্য ফলমূলজল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার

নিকট এইগুলি প্রকৃত অর্থ। জীবনধারণের জন্য সাধারণ লোকের পক্ষে অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য আবশ্যক হয়। এইগুলিই প্রকৃত অর্থ। সরকারী মুদ্রা বা নোটের বিনিময়েও এইগুলি পাওয়া যায়। সেই জন্য এইগুলিকেও অর্থ বলা হয়।

ধনোৎপাদক বৈশ্যের কর্তব্যের উল্লেখের দ্বারা গীতায় অর্থের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

(গ) **কাম।**

জাগতিক নানাপ্রকার দ্রব্য ও জীব প্রভৃতির সাহায্যে সুখলাভের প্রবল কামনা বা ইচ্ছাকে এক কথায় কাম বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর এইপ্রকার ইচ্ছা কম বা বেশী পরিমাণে থাকে। এইপ্রকার ইচ্ছা বা বাসনার কিছু পরিতৃপ্তি সাধন আবশ্যক। চতুর্বর্গের ভিতর যে কাম শব্দ ব্যবহৃত হইয়ছে ইহা **সঙ্গত কামনাসমূহের সংযত তৃপ্তিসাধন** অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ইহা কিছু পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া, ইহাকে তৃতীয় পুরুষার্থ (অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির তৃতীয় প্রয়োজন) বলা হইয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ—গীতা ৭।১১

—হে অর্জুন, প্রাণিগণের মধ্যে ধর্মের অবিরোধী যে কাম (অর্থাৎ সুখ লাভ কামনা) তাহাও আমি (অর্থাৎ তাহাও ঐশ্বরিক প্রেরণা হইতে আসে) ৭।১১

কিন্তু যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চান, তাঁহাদের নিকট কাম (অর্থাৎ নানাপ্রকার জাগতিক দ্রব্য ও জীবের সাহায্যে সুখলাভ করিবার প্রবল কামনা) যে পরম শত্রু তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩।৩৭

—রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম ও এই ক্রোধ সর্বদা অতৃপ্ত ও মহাপাপময় মূর্তি ; ইহাতে (অর্থাৎ মুক্তিলাভের পথে) ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিও (৩।৩৭)।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। গীতা ৩।৪৩

—হে মহাবাহো (অর্জুন), কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনষ্ট কর। (৩।৪৩)

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের আছে। ইহাদের সাহায্যে আমরা যে কেবল নানাপ্রকার জ্ঞানলাভ করি তাহা নহে। বিভিন্ন প্রকার সুখও আমরা ইহাদের সাহায্যে লাভ করিতে চাই। নানাপ্রকার সুন্দর দ্রব্য আমাদের চক্ষুকে আনন্দ দান করে। গান বাজনা প্রভৃতি আমাদের কর্ণের সুখকর হয়। আতর, ধূপ, ফুল, প্রভৃতির সুগন্ধ নাসিকার সুখোৎপাদন করে। নানা-প্রকার উপাদেয় খাদ্যের সাহায্যে যে অধিকাংশ লোক জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করিতে চায়, তাহা বলাই বাহুল্য। কোমল শয্যা, গরমের সময় শীতল বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি ত্বকের পক্ষে আরামদায়ক হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সুখকে ইন্দ্রিয়সুখ বলা হয়। এইপ্রকার সুখ কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। সংযতভাবে গার্হস্থ্যাশ্রমের শেষ পর্যন্ত কতকটা ইন্দ্রিয়-সুখভোগ মানুষের পক্ষে অহিতকর নহে। ইহার আবশ্যকতা আছে বলিয়াই ইহাকে সকলের পক্ষে তৃতীয় প্রয়োজন বলা হইয়াছে। গীতায় বলা হইয়াছে

রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২।৬৪

—আসক্তি ও দ্বেষ রহিত হইয়া আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিয়া সংযত পুরুষ মনের প্রসন্নতা লাভ করেন। (২।৬৪)

চতুর্বর্গের ভিতর ধর্মকে এইজন্য প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে যে প্রত্যেক বালকবালিকার পক্ষে ধর্মই প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। জগতে বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির জ্ঞান ও শারীর শিক্ষা প্রভৃতি আবশ্যক। কিন্তু ইহাদের সহিত ধর্মশিক্ষা না থাকিলে, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ থাকিয়া যায়। বর্তমান ভারতে এই প্রকার অসম্পূর্ণ ও বিকলাঙ্গ শিক্ষাই ব্যাপকভাবে চলিতেছে। যাহারা শিক্ষার ছাপ লইয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের অনেকের

মধ্যেই শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। ইহার ফলে সমাজে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রসারলাভ করিতেছে ও মানুষের দুঃখকষ্ট বাড়িতেছে।

পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, অর্থ আবশ্যক ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে প্রকৃত ধর্মশিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে অর্থলোভী ও স্বার্থপর হইবে না। তাহার যেমন অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্য সকলেরও সেইভাবে অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা মনে রাখিয়া সে নিজের অর্থকামনাকে সংযত করিবে এবং অন্যান্য সকলে যাহাতে কিছু কিছু অর্থলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। ধর্মানুমোদিতভাবে অর্থোপার্জন করা উচিত—ইহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য চতুর্বর্গের ভিতর অর্থের পূর্বে ধর্মকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

অর্থের পর কামকে (অর্থাৎ সংযতভাবে সঙ্গতকামনাসমূহের তৃপ্তি-সাধনাকে) স্থান দেওয়া হইয়াছে। মানুষ সর্বপ্রথমে ধর্মশিক্ষা করিবে; তাহার পর সে ধর্মানুমোদিতভাবে কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিবে এবং এইভাবে অর্জিত অর্থের সাহায্যে সে শুদ্ধাচারে থাকিয়া তাহার সঙ্গতকামনাসমূহের সংযত তৃপ্তিসাধন করিবে—হিন্দুধর্মের অন্তর্গত চতুর্বর্গসাধনের ভিতর এইপ্রকার শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে।

(ঘ) **মোক্ষ**।

মোক্ষ বা মুক্তিই মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য এবং ইহাই তাহার জীবনের উচ্চতম অবস্থা। অধিকাংশ লোকই নানাপ্রকার পার্থিব দ্রব্য ও জীবে আসক্ত হইয়া বদ্ধাবস্থায় জীবনধারণ করে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অন্নবস্ত্র প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে। শরীররক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত সর্বপ্রকার দ্রব্য প্রভৃতি কোন ব্যক্তি যখন বর্জন করিতে শিক্ষা করে, সর্বপ্রকার পার্থিব দ্রব্য ও জীবদেহের প্রতি অনাসক্ত হয় ও ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করে, তখন সে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে বলা যাইতে পারে। আত্মার ভিতরই স্থির ও নির্মল আনন্দের ভাব রহিয়াছে। মানুষ যখন অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল জাগতিক দ্রব্য প্রভৃতির উপর

তাহার সুখের জন্য নির্ভর না করিয়া, তাহার মনকে আত্মসংস্থ করিতে অভ্যাস করে, তখন তাহার নিজের ভিতর হইতেই আনন্দের স্ফুরণ হয়। গীতায় এইপ্রকার আনন্দলাভের জন্য চেষ্টা করিবার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ গীতা ৫।২১

—বাহ্য ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার আত্মার ভিতর হইতে যে সুখলাভ করেন, ব্রহ্মে মনকে সমাহিত করিতে পারিলে, তাঁহার সেই সুখ অক্ষয় অর্থাৎ চিরস্থায়ী হয়। (৫।২১)।

চতুর্বর্গের ভিতর মোক্ষ বা মুক্তিকে চতুর্থ স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে মানুষ প্রথমে ধর্মশিক্ষা করিবে, তাহার পর ধর্মানুমোদিতভাবে সে কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিবে এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থের সাহায্যে তাহার মনের ভিতর যে বিভিন্নপ্রকার সুখলাভের কামনাসমূহ রহিয়াছে, তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের সংযত তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিবে। কিন্তু এইভাবে চলিয়াও সে দেখিবে যে অস্থায়ী জাগতিক দ্রব্য ও পদলাভ প্রভৃতির সাহায্যে স্থায়ী সুখশান্তি লাভ করা যায় না। তখন সে যদি তাহার মনকে আত্মসংস্থ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ করিতে পারে, কেবল তাহা হইলেই সে স্থির ও নির্মল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। এই পথই স্থায়ীভাবে সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তির পথ। ইহাই মানুষের চতুর্থ ও পরম পুরুষার্থ বা প্রয়োজন।

গীতা প্রথমতঃ ধর্মশাস্ত্র এবং দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ ইহা মোক্ষশাস্ত্র। কীভাবে মানুষ মুক্তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে, তাহার কথাই গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ, প্রভৃতি শব্দ মানুষের মুক্ত অবস্থা বুঝাইবার জন্য গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪। চতুর্বর্ণ।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩

—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি (৪।১৩)। সমস্ত মানুষকে তাহাদের গুণ ও কর্ম অনুসারে চারি বর্ণ বা শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়—ইহাই বর্ণভেদের মূল কথা। হিন্দু সমাজে আংশিকভাবে প্রচলিত জাতিভেদ ও গীতায় উল্লিখিত বর্ণভেদ একই জিনিস নহে। জাতিভেদ জন্মগত ও বংশানুক্রমিক। কিন্তু বর্ণভেদ এইরূপ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ তাহার গুণ ও কর্ম দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের ইহাই যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি।

সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি গুণবিশিষ্ট।

গীতাতেও মানুষের এই তিনটি গুণের কথা বলা হইয়াছে।

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভিগুণৈঃ॥

গীতা ১৮।৪০

—পৃথিবীতে, অথবা স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যেও এমন কোন প্রাণী নাই, যিনি প্রকৃতিজাত এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত (১৮।৪০)।

গীতায় আরও বলা হইয়াছে, "হে অর্জুন, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি গুণ অক্ষয় আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে। ইহাদের মধ্যে নির্মলত্বহেতু প্রকাশস্বভাব ও উপদ্রবহীন সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া দেহীকে আবদ্ধ করে। রজোগুণ বিষয়ানুরাগ-স্বরূপ এবং বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়ানুসক্তি ইহা হইতে জন্মে। ইহা দেহীকে কর্মে আসক্ত করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জন্মে এবং সমস্ত জীবের মোহের উৎপাদক। ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ সুখের

দিকে, রজোগুণ কর্মের দিকে, তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদের (অর্থাৎ ভ্রমের) দিকে চালিত করে (গীতা ১৪।৫-৯)।

অতএব সত্ত্বগুণের আধিক্য হইতে শান্তভাব, জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা, ও তজ্জনিত আনন্দ জন্মে।

রজোগুণের আধিক্য হইতে বিষয়ানুরাগ ও কর্মশীলতা জন্মে।

তমোগুণের আধিক্য হইতে অজ্ঞতা ও আলস্য জন্মে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ গীতা ১৮।৪১

—হে অর্জুন, স্বভাবজাত গুণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসকল বিভাগপ্রাপ্ত হয় (১৮।৪১)।

প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি গুণ কমবেশী পরিমাণে থাকে। যাহার ভিতর যে গুণের আধিক্য থাকে, সাধারণতঃ তদনুসারে সে কর্ম করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির এই গুণ ও কর্ম দেখিয়া, সে কোন্ বর্ণ বা শ্রেণীর লোক তাহা নির্ণয় করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভিতর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নিম্নলিখিতভাবে থাকে বলা হয়।

	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র
সর্বাপেক্ষা অধিক	সত্ত্ব	রজঃ	রজঃ	তম
তাহা অপেক্ষা কম	রজঃ	সত্ত্ব	তমঃ	রজঃ
আরও কম	তমঃ	তমঃ	সত্ত্ব	সত্ত্ব

(ক) ধর্মশিক্ষক ব্রাহ্মণ।

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞান-বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ গীতা ১৮।৪২

—শম্, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। (গীতা ১৮।৪২)।

(১) শম—মন প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম ও শান্তভাব।

(২) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন ও নিয়ন্ত্রণ (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা

ত্বক্—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—এই দশটি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ) (বাক্—জিহ্বা, মুখ প্রভৃতি কথা বলিবার যন্ত্র : পাণি—দুইটি হাত ; পাদ —দুইটি পা, পায়ু—মলদ্বার : উপস্থ—জননেন্দ্রিয়)।

(৩) তপ—ভোগবিলাস ত্যাগপূর্বক উপাসনা।

(৪) শৌচ—মনের পবিত্রতা বা অন্তঃশৌচ এবং দেহবস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা বা বাহ্যশৌচ।

(৫) ক্ষান্তি—ক্ষমা, অন্যায়কারীর প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন।

(৬) আর্জব—সরলতা (কুটিলতার অভাব)

(৭) জ্ঞান—শাস্ত্র, আচার্য প্রভৃতির নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞান।

(৮) বিজ্ঞান—সাধনার সাহায্যে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান (আত্মজ্ঞান প্রভৃতি)।

(৯) আস্তিক্য—অস্তি (আছে) অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ও পরলোক আছে —এই প্রকার বিশ্বাস।

এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ : সুতরাং কাহারও (অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন মানুষের) এই প্রকার গুণ ও কর্ম দেখিলে বুঝিতে হইবে তিনি ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুদ্ধ, সংযত ও আড়ম্বরহীন সরল জীবন যাপন করেন। তিনি নিজে ধর্মজীবন যাপন করেন বলিয়া, কেবল তিনিই ধর্মশিক্ষক হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সেই জন্য তাঁহাকে সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুসারে যদি অধিকাংশ লোক ধর্মজীবন যাপনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরা সমাজে যে দুঃখকষ্ট দেখিতে পাই, তাহার অনেকটা লাঘব হইতে পারে।

(খ) **দুষ্টশাসক ক্ষত্রিয়।**

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ গীতা ১৮।৪৩

—বীরত্ব, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, প্রভুভাব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। (১৮।৪৩)

(১) শৌর্য—পরাক্রম বা বীরত্ব—ইহার জন্য বিশেষ দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

(২) তেজ—মানসিক শক্তি ও সাহসের প্রকাশ।

(৩) ধৃতি—ধৈর্য, উপযুক্ত সময়ে কার্য করিবার জন্য অপেক্ষা।

(৪) দাক্ষ্য—দক্ষতা, কর্মপটুতা।

(৫) যুদ্ধে অপলায়ন—মৃত্যু নিশ্চিত হইলেও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করা।

(৬) দান—অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অর্থ বা আবশ্যক দ্রব্য দেওয়া (ক্ষত্রিয় রাজা সকলের ধনের রক্ষক; সুতরাং ধনবণ্টনে ও ধনদানে তাঁহার অধিকার আছে)।

(৭) ঈশ্বরভাব—নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা আয়ত্তে রাখিবার শক্তি; শৌর্য, তেজ প্রভৃতি থাকিলে ইহা সম্ভব হয়।

এইগুলি ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ; সুতরাং পৃথিবীর কোন ব্যক্তির এইপ্রকার গুণ ও কর্ম দেখিলে বুঝিতে হইবে, তিনি ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়ের ভিতর রজোগুণের আধিক্য থাকায়, ক্ষত্রিয় কর্মশীল ও কর্মতৎপর। তিনি সাহসী ও তেজস্বী। ব্রাহ্মণ যে ধর্মশিক্ষা দেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া, যাহারা সমাজবিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত হয়, বা প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করে, ক্ষত্রিয় তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য। দুষ্টকে দমন করিয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয় সর্বদা সচেষ্ট থাকেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সর্বদা নিজের জীবন দান করিতেও প্রস্তুত থাকেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের বর্ণধর্ম বা শ্রেণীগত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(গ) ধনোৎপাদক বৈশ্য।

কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্। গীতা, ১৮।৪৪

—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম (১৮।৪৪)।

(১) কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। ইহাই পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে বাঁচাইয়া রাখে। অতএব কৃষকগণই যে কোন জাতির এবং সমগ্র মানবজাতির জীবনরক্ষক। তাহারা যাহাতে সুস্থভাবে জীবনধারণ করিতে পারে সেই দিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। নিজেদের জীবনধারণের জন্য যে খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, তাহা রাখিয়া অন্য সকলের জীবনরক্ষার জন্য অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ন্যায্যমূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া কৃষকগণের কর্তব্য।

(২) গোধন মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধন। গাভীর দুগ্ধ আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পানীয় ও খাদ্য। বলদ কৃষিকার্যে ও দ্রব্যবহনে সাহায্য করিয়া আমাদের পরম উপকার করে। সেই জন্য গোরক্ষাও বৈশ্যের কার্য।

(৩) বৈশ্যগণ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বণ্টনের ব্যবস্থা করে। যাহারা ন্যায্য মূল্যে এবং যথাসম্ভব স্বল্পলাভে ইহা করে, তাহারা সৎ বৈশ্য।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য শত শত প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে। এইগুলিও মানুষের ধন। যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এইপ্রকার ধনোৎপাদনে রত, তাহারাও বৈশ্য। অতএব কৃষক, শ্রমিক ও বণিক এই তিন শ্রেণীর বৈশ্য সমগ্র জাতির জীবনরক্ষা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানাপ্রকার ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থা করে বলিয়া, তাহাদের মঙ্গলের দিকে আমাদের সকলের লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(ঘ) সর্বসেবক শূদ্র।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। গীতা ১৮।৪৪

—পরিচর্যামূলক কার্য শূদ্রের স্বভাবজাত কার্য (১৮।৪৪)।

শূদ্রের ভিতর তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তাহার দেহ ও মনে অধিকতর জড়তা লক্ষিত হয়। কিন্তু শূদ্রগণ অন্যান্য বর্ণ বা

শ্রেণীর লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া ও তাঁহাদের কার্যে সাহায্য করিয়া নিজেদের জীবিকার্জন করিতে পারে।

সমাজরক্ষার জন্য বিভিন্ন বর্ণ বা শ্রেণীর যে বিভিন্ন প্রকার কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অত্যাবশ্যক। নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী বর্ণধর্ম পালন করিয়া (অর্থাৎ বর্ণের কর্তব্য করিয়া) মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে—ইহা গীতায় বলা হইয়াছে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ গীতা ১৮।৪৬

—যাঁহা হইতে (অর্থাৎ যে ঈশ্বর হইতে) প্রাণিগণের কর্মপ্রচেষ্টা ভোগপ্রবৃত্তি জন্মে, এবং যিনি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, নিজ নিজ কার্যের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে (১৮।৪৬)।

সমাজের মঙ্গলের জন্য সৎভাবে বিভিন্ন বর্ণের জন্য নির্ধারিত কার্য করিয়া, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিবার কথা এবং তাহাকে ঈশ্বরের পূজারূপে মনে কবিবার কথা গীতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে।

(বর্ণ শব্দের একটি সাধারণ অর্থ রং। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হইয়াছে "আজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং—লাল, সাদা ও কাল রং যুক্ত এক অনাদি প্রকৃতিকে—অর্থাৎ প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত সত্ত্বগুণ যেন সাদা রং যুক্ত, রজোগুণ যেন লালরংযুক্ত এবং তমোগুণ যেন কালরংযুক্ত এইভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ভিতর সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকায়, তাঁহার স্বভাবের বর্ণ নির্মল শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের ভিতর রজোগুণের আধিক্য থাকায়, তাঁহার স্বভাবের বর্ণ লোহিত বর্ণ, বৈশ্যের ভিতর তমোগুণ মিশ্রিত রজোগুণ থাকায়, তাঁহার স্বভাবের বর্ণ ঈষৎ লোহিত বর্ণ এবং শূদ্রের ভিতর তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তাঁহার স্বভাবের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ—এই প্রকার কল্পনা হইতে সম্ভবতঃ বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বর্ণের লোক, কোন্ ব্যক্তি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোক, কোন্ ব্যক্তি বৈশ্যবর্ণের লোক এবং কোন্ ব্যক্তি শূদ্রবর্ণের লোক, তাহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই

তিনটি গুণ কাহার ভিতর কিভাবে কার্য করিতেছে তাহা দেখিয়া স্থির করিতে হয়। অতএব বর্ণভেদ স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত কিছুই নহে। পৃথিবীর প্রত্যেক বালক-বালিকার এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বর্ণ এইভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে।)

জাতিভেদ ও বর্ণভেদে পার্থক্য।

গীতায় যে বর্ণভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহার ও বর্তমান সময়ে প্রচলিত জাতিভেদের ভিতর যে গভীর পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজে দুইটি কারণে বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথম কারণ—স্বভাব চরিত্র অনুসারে মানুষে মানুষে ভেদ বা বিভিন্নতা। এইপ্রকার ভেদ পূর্বেও ছিল এবং এখনো আছে। ইহাকে গীতায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্য অনুসারে মানুষে মানুষে ভেদ বলা হইয়াছে। কিছু লোকে ধীর স্থির ও শান্ত স্বভাবের হয়। তাহারা কোন গোলমাল বা মারামারির দিকে যাইতে চায় না। তাহারা সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতী। তাহারা সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে চায় এবং তাহা হইতে সুখলাভ করে। ইহাদিগকে সাত্ত্বিক স্বভাবের লোক বলা হয়। কিছু লোক আছে যাহাদের জ্ঞানলাভের দিকে বেশী ঝোঁক নাই, কিন্তু তাহারা কর্মতৎপর ও সাহসী হয়। গোলমাল মারামারি প্রভৃতির দিকে তাহারা অগ্রসর হইয়া যায় এবং সেখানে প্রাধান্য লাভের চেষ্টাও করে। ইহারা রাজসিক স্বভাবের লোক। আর একশ্রেণীর লোক আছে যাহাদের জ্ঞানলাভের দিকে বা কর্মের দিকে—কোন দিকে প্রবণতা দেখা যায় না। তাহাদের মনের ও দেহের ভিতর আপেক্ষিক জড়তা থাকায় তাহাদিগকে তামসিক স্বভাবের লোক বলা হয়। বর্ণভেদের দ্বিতীয় কারণ—সমাজে বিভিন্নপ্রকার কার্যের আবশ্যকতা। দেবদেবীগণ আছেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের

পূজা করা আবশ্যক—এই ধারণা যখন কিছু লোকের মনে স্থানলাভ করিল, তখন যাঁহারা সাত্ত্বিক স্বভাবের লোক ছিলেন ও শুদ্ধাচারে থাকিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা যজনযাজনের কার্য গ্রহণ করিলেন। এই কার্য তাঁহাদের সাত্ত্বিক স্বভাবের উপযোগী ছিল এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইলেন। কিন্তু কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক মনুষ্যসমাজে ছিল, আছে ও থাকিবে। তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য কোন কোন বুদ্ধিমান, সাহসী ও কৌশলী রাজসিক স্বভাবের লোক অন্য কিছু কিছু রাজসিক স্বভাবের লোকের মধ্যে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং অধীনস্থ সৈন্যসামন্তগণের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলে রাজসিক স্বভাবের লোক এবং ইঁহারা যে কার্য গ্রহণ করিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বভাবের উপযোগী ছিল। ইঁহারা সকলে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হইলেন। অন্যান্য সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিবার শক্তিকে গীতায় ক্ষত্রিয়ের ঈশ্বরভাব বলা হইয়াছে। রাজসিক স্বভাব ও তামসিক স্বভাবের মধ্যবর্তী স্বভাবের কিছু লোক ছিল, আছে ও থাকিবে। তাহারা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা ধনোৎপাদন ও ধনবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল এবং বৈশ্য নামে পরিচিত হইল। যাহারা বিশেষ তামসিক ভাবাপন্ন লোক ছিল, তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল। এইভাবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত গীতায় এই বর্ণভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

কিন্তু গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে যে বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি ভারতীয় সমাজে হইয়াছিল, তাহা নানা কারণে কালক্রমে বিকৃত হইয়া হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার রূপ ধারণ করিয়াছে। এখন বর্ণভেদ ও জাতিভেদের ভিতর যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ ঘটিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

(১) বর্ণভেদ গুণ ও কর্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু

জাতিভেদ এইরূপ নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ তাহার গুণ ও কর্ম দেখিয়া স্থির করিতে হয়। কোন ক্ষত্রিয়স্বভাবের লোক সৈনিক বা সেনাপতির কার্য করিতেছেন, অথবা আরক্ষা বাহিনীর কোন কর্মীর কার্য করিতেছেন। এখানে গুণ ও কর্মের মিলন ঘটিয়াছে। গুণ ও কর্মের এইপ্রকার মিলনে মানুষ সুখী হয় এবং সমাজ উপকৃত হয়। কিন্তু কোন দেশের কোটি কোটি লোকের প্রত্যেকের পক্ষে এইপ্রকার মিলনসাধন সম্ভব হয় না। তখন একটি লোক গুণ হিসাবে একবর্ণের এবং জীবিকার্জনের জন্য অবলম্বিত কর্ম হিসাবে অন্য বর্ণের হইতে পারে। একজন ব্রাহ্মণবর্ণের লোক ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত সাধনাদি করেন, কিন্তু যাজনিক কার্য বা ধর্ম শিক্ষকের কার্য না করিয়া তিনি দুই তিনটি লোকের সাহায্যে সৎভাবে একটি দোকান পরিচালনা করেন। এই স্থলে তিনি গুণ হিসাবে ব্রাহ্মণ হইলেও জীবিকার্জনের জন্য কর্ম হিসাবে তিনি বৈশ্য। তাঁহার এইপ্রকার কার্য অসঙ্গত নহে এবং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বলিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

কিন্তু জাতিভেদের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই। ইহা বংশানুক্রমিক। শত শত বা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে কোন ব্যক্তির পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র ছিলেন। ইহা সেই বংশে জাত সমস্ত ব্যক্তির জাতি চিরকালের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মণের স্বভাববিশিষ্ট এবং তদনুযায়ী কার্যও করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কিন্তু ঐ বংশসমূহের সমস্ত লোক ঐরূপ হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিশিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষত্রিয়ের কার্য করিয়াছে বা করিতেছে। কেহ কেহ বৈশ্যের স্বভাববিশিষ্ট হইয়া বৈশ্যের কার্য করিয়াছে বা করিতেছে। কেহ কেহ তামসিকভাবাপন্ন হইবা শূদ্রের কার্য করিয়াছে বা করিতেছে। কেহ কেহ মিথ্যাবাদী, চোর, প্রতারক, মদ্যপায়ী ও লম্পট হইয়াছে। কেহ কেহ আবার নরঘাতক দস্যুও হইয়াছে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা অনুসারে তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ।

এইপ্রকার জাতিভেদের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নাই এবং ইহার কোন সার্থকতাও নাই।

(২) বর্ণভেদে বর্ণের পরিবর্তন চলে। কোন বৈশ্যবর্ণের লোক কোন সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া সাধনার দ্বারা ব্রাহ্মণবর্ণের লোকে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা অনুসারে কোন বৈশ্য-বংশে জাত সমস্ত লোককে বৈশ্যরূপে পরিগণিত হইতেই হইবে। জাতিভেদ প্রথায় জাতির পরিবর্তন চলে না।

(৩) বর্ণভেদের ভিতর অসত্যের ও মিথ্যা গর্বের স্থান নাই। কিন্তু জাতিভেদের ভিতর অসত্য ও মিথ্যাগর্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কে কোন্ বর্ণের লোক তাহা স্থির করিবার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড আমরা গীতায় দেখিতে পাইতেছি। জঘন্য স্বভাব-চরিত্রের জন্য ব্রাহ্মণ বংশজাত কোন লোক যদি শূদ্র অপেক্ষাও অনেক হীন ও নীচ স্তরে নামিয়া যায় কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ও সেই জন্য গর্বপ্রকাশ করে. গীতার মানদণ্ড অনুসারে সে সত্যাশ্রয়ী নহে এবং তাহার মিথ্যা গর্ব তাহাকে সমস্ত বুদ্ধিমান লোকের নিকট হাস্যাস্পদ করে। কিন্তু বর্ণভেদ গুণ ও কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা প্রত্যেক লোকের যথার্থ পরিচয় দেয়।

উল্লিখিত কারণে ও অন্যান্য কারণে জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী লোকের নিকট আর গ্রহণীয় হইতেছে না এবং ভারতের হিন্দুসমাজ হইতে ইহার ক্রমাগত বিলুপ্তি অসম্ভব নহে। কিন্তু গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণভেদ যুক্তির উপর ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সনাতন প্রথাভাবে ইহা বর্তমান থাকিবে। তাহা হইলেও জাতির ছাপ যে ভাবে হিন্দুগণের উপর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ঐভাবে বর্ণের ছাপ তাহাদের উপর দেওয়া সব সময় সম্ভব হইবে না। কোন লোক কী কাজ করে, তাহা আমরা সহজে তাহার নিকট হইতে বা অন্য কাহারও নিকট হইতে জানিতে পারি। কিন্তু তাহার স্বভাবজাত দোষ ও গুণাবলীর কথা অবগত হওয়া ঐরূপ সহজ নহে, অথচ কেবল তাহার দোষগুণের সাহায্যে তাহার প্রকৃত বর্ণ

নির্ণীত হইতে পারে। গৃহে ও কর্মস্থানে তাহার দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়া, বিভিন্ন লোকের সহিত তাহার ব্যবহার দেখিয়া ও অন্যান্যভাবে তাহার দোষগুণের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য গুণানুসারে বর্ণনির্ণয় সময়সাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া যাহারা বাহির হয়, তাহাদেরও বর্ণনির্ণয় করিতে অল্প বা বেশী সময় লাগে। কারণ তাহাদের ভিতর নানা প্রকার দোষগুণযুক্ত বিভিন্ন স্বভাবের লোক থাকে।

মানুষে মানুষে কোথায় বৈষম্য থাকে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাহাদের ভিতর আবার সাম্যও আছে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে এবং এই অনুসারে আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য করিতে হইবে। ঈশ্বর ও প্রকৃতির সমবায়ে যেমন বিশ্ব গঠিত: জীবাত্মা ও তাহার উপাধির সমবায়ে ঐভাবে প্রত্যেক মানুষ অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক গঠিত। প্রত্যেক মানুষের একটি পৃথক জীবাত্মা আছে। এই জীবাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া তাহার একটি পৃথক স্থূলদেহ ও ইহার সহিত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পৃথক মন, বুদ্ধি অহংকার (অর্থাৎ আমিত্ববোধ) আছে। এইগুলির সমষ্টিকে জীবাত্মার উপাধি বলা হয়। জীবাত্মার এই উপাধিকে গীতার ১৫।১৬ শ্লোকে ক্ষর (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল) পুরুষ বলা হইয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণ মানুষের দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির ভিতর দিয়া কার্য করে। অতএব বর্ণভেদ বলিলে নর-নারীগণের উপাধিসমূহের ভেদ বা পার্থক্য বুঝিতে হইবে। মানুষের দেহ মন প্রভৃতির ভিতর দিয়া যে সত্ত্বরজস্তমোগুণ কার্য করে, ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা তাহার ভিতর পরিবর্তন সাধন করা যাইতে পারে। এইপ্রকার ক্রমাগত আন্তরিক চেষ্টাকে সাধনা বলা হয়। কোন শূদ্র সাধনার দ্বারা রজস্তমোগুণের হ্রাস সাধন করিয়া নিজের ভিতর সত্ত্ব গুণের আধিক্য ঘটাইতে পারে এবং এইভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণবর্ণের লোকে পরিণত করিতে পারে। আবার কোন ব্রাহ্মণবর্ণের

লোক যদি নিজেকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া অসৎ-সঙ্গে পড়ে ও কুকার্যে রত হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতর তমোগুণের বৃদ্ধি ঘটিবে এবং সে শূদ্রে পরিণত হইবে। অতএব গীতায় যে বর্ণভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন মানুষের উপাধিগত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংক্রান্ত দোষগুণের ভেদ। কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টার ফলে অথবা চেষ্টার অভাবে ইহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

উল্লিখিতভাবে মানুষে মানুষে প্রভেদ ঘটিলেও, তাহাদের ভিতর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সাম্য আছে তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

(১) আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাম্য :—

কোটি কোটি নরনারীর কোটি কোটি জীবাত্মার মধ্যে কোন বর্ণভেদ নাই। গীতার ১৫।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সমস্ত জীবাত্মাই ঈশ্বরের সনাতন (অর্থাৎ চিরস্থায়ী) অংশ। সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক মানুষের ভিতর ঈশ্বরের সনাতন অংশ বর্তমান আছে এবং তাহার নিজের জীবাত্মা যেরূপ, অন্য সমস্ত মানুষের জীবাত্মাও সেইরূপ, অতএব কোন মানুষকে অবজ্ঞা করা উচিত হইবে না। যে মানুষ আপাততঃ অধঃপতিত হইয়াছে, তাহারও উত্থান সম্ভব, এবং সম্ভব হইলে তাহার উন্নয়নের চেষ্টা করাই সঙ্গত কার্য হইবে। কিন্তু এইরূপ না করিয়া তাহাকে কেবল ঘৃণা করিয়া কি লাভ? চিকিৎসক ও পরিষেবিকা রোগীকে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা রোগীর মলমূত্রের যথাযথ ব্যবস্থা করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। মন্দকে ভাল করিবার শিক্ষা তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

(২) সাধনার ক্ষেত্রে সাম্য :—

ধর্মের পথে ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার সকলের সমান অধিকার আছে। গীতায় বলা হইয়াছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ গীতা ৯।৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমংপ্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ গীতা ৯।৩৩

—হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র এবং যাহারা পাপগর্ভজাত, তাহারাও আমাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) আশ্রয় করিলে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণ যে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিবেন, তাহা কি আর বলিতে হইবে? সুখহীন ও অস্থায়ী জগতে যখন আসিয়াছ, তখন আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) উপাসনা কর। (গীতা-৯।৩২—৩৩)

ঈশ্বরের উপাসনায় প্রত্যেক বালকবালিকার, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার আছে। এখানে কোন প্রকার ভেদ বা বিভিন্নতা নাই। বেশ্যাপুত্র প্রভৃতিকে লোকে পাপগর্ভজাত মনে করে। কিন্তু তাহারাও সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে এবং ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিতে পারে।

(৩) দেহধারণের ক্ষেত্রে সাম্য :—

প্রত্যেক মানুষ স্থূল দেহধারী জীব এবং সে সুস্থদেহে যতদিন সম্ভব এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। ইহাতে কাহারও কোন-বিঘ্ন উৎপাদন করা উচিত নহে। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা যাহাতে প্রত্যেকের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

(৪) মানসিক সুখ শান্তির ক্ষেত্রে সাম্য :—

প্রত্যেক মানুষ মানসিক সুখশান্তি লাভ করিতে চায়। ইহাতেও ধর্মসঙ্গতভাবে পারস্পরিক সাহায্য আবশ্যক।

(৫) জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সাম্য :—

(প্রকৃত বা কৃত্রিম) অর্থ ব্যতীত দেহধারণ ও মানসিক সুখ শান্তি সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখা সরকারের ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের কর্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৫। চতুরাশ্রম।

হিন্দুধর্মকে অনেক সময় বর্ণাশ্রমধর্ম বলা হয়। বর্ণ + আশ্রম = বর্ণাশ্রম। সুতরাং বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম—উভয়ের সমাবেশে বর্ণাশ্রমধর্ম। গীতায় বর্ণভেদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে কিন্তু আশ্রম সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে কিছুই বলা হয় নাই। আশ্রম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আবশ্যক। হিন্দুধর্মের শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য এই পুস্তকে আশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। আশ্রমধর্ম পালন ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ।

স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে যেমন বর্ণভেদ, বয়সের পার্থক্য ও তদনুযায়ী কর্তব্যের পার্থক্য অনুসারে সেইভাবে আশ্রমভেদ। মানুষের সমস্ত জীবনকে চারিভাবে বিভক্ত করা হয় এবং জীবনের বিভিন্ন বয়সে করণীয় কার্য অনুসারে চারিটি বিভিন্ন আশ্রম আছে বলা হয়। চারিটি আশ্রমের নাম যথাক্রমে—(১) ব্রহ্মচর্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ ও (৪) সন্ন্যাস। দুইটি আশ্রমের নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া এই পুস্তকে যথাক্রমে—(১) বিদ্যাশ্রম, (২) গার্হস্থ্যাশ্রম, (৩) সাধনাশ্রম ও (৪) সন্ন্যাসাশ্রম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রম শব্দ হইতে আশ্রম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বয়সের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে শ্রম বা পরিশ্রম করা উচিত—তাহা বুঝাইবার জন্য আশ্রম শব্দ ব্যবহৃত হয়।

গীতার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত আশ্রমের উপযোগী নহে। যথা ব্রাহ্মীস্থিতি, ব্রহ্মনির্বাণ বা মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রধানতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের উপযোগী। বর্ণধর্মপালন সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রধানতঃ গার্হস্থ্য আশ্রমের উপযোগী। বিদ্যাশ্রমের উপযোগী শিক্ষাও গীতায় আছে। সেইজন্য আশ্রমভেদে গীতার শিক্ষানুযায়ী জীবন গঠনের চেষ্টা করিলে, তাহাই সমাজের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে।

কিভাবে ইহা করা যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পুস্তকের পরবর্তী চারিটি অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(ক) **বিদ্যাশ্রম।**

জন্ম হইতে বিদ্যাশ্রম আরম্ভ হয় এবং ২০।২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহা চলিতে পারে। জন্মের পর শিশু চোখ মেলিয়া দেখে এবং ক্রমশঃ মাতাপিতা ও অন্য আত্মীয়স্বজন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ নানা প্রকার জিনিস সম্বন্ধে তাহার কিছু কিছু জ্ঞান জন্মে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানলাভের জন্য নানা প্রকার কৌতূহলের উদ্রেক হয়। জ্ঞানলাভের এই ইচ্ছাকে কোন প্রকার বাধা বা চাপা না দিয়া সমস্ত প্রশ্নের যথাসম্ভব সদুত্তর দেওয়া এবং ইহার দ্বারা তাহার জ্ঞানের পরিধিকে ক্রমশঃ বিস্তৃত করা পিতা-মাতা প্রভৃতির কর্তব্য।

জীবনের প্রথম আশ্রমকে পূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হইত। ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ বেদ। অবিবাহিত অবস্থায় গুরুগৃহে থাকিয়া বেদ-পাঠে মনোনিবেশ করাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু এখন এইপ্রকার ব্যবস্থা নাই এবং বর্তমান যুগে ইহার উপযোগিতাও নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে এক বিরাট জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। এই জীবনসংগ্রামে ভারতীয় জাতির পক্ষে সসম্মানে বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক বলিয়া, সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর বালকবালিকাকে এখন বিদ্যালয়ে গিয়া নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান সময়ে প্রথম আশ্রমের নাম বিদ্যাশ্রম হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। অবিবাহিত অবস্থায় পিতামাতার নিকট থাকিয়া, অথবা প্রয়োজন হইলে ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিদ্যালয়ে বিবিধ বিদ্যা অর্জন করিবার চেষ্টা করিলে এবং সর্বপ্রকার অসৎ কার্য ও চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় বা অন্য সুবিধা-জনক সময়ে কিছুক্ষণ ভক্তির সহিত নিবিষ্টমনে ঈশ্বরচিন্তা করিলে, তাহাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের তুল্য হইবে।

অল্পবয়সে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ অসুবিধাজনক হইতে পারে। হিন্দুধর্মে প্রতীকের সাহায্যে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যাশ্রমী বালকবালিকা কোন দেবতা বা মহাপুরুষের ছবি তাহার পাঠ-কক্ষে রাখিতে পারে, ইহা তাহার মনে ভক্তির ভাব জাগাইয়া দিবে এবং তাহার মনকে একাগ্র করিতে সাহায্য করিবে। প্রতীক শব্দের অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। বুদ্ধের মূর্তি বা ছবি বুদ্ধ নহেন। ইহা বুদ্ধের প্রতীক বা চিহ্নমাত্র। ইহা বুদ্ধের ত্যাগের কথা ও তাঁহার মহান্ নৈতিক উপদেশসমূহ অনুসারে জীবনগঠনের আবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান যুগের মহীয়ান্ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি (বা ছবি) এইভাবে ধর্মসাধনার পথে, ত্যাগের পথে ও জনসেবার পথে অগ্রসর হবার জন্য প্রেরণা দান করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীগণ প্রতি রবিবার মাতৃভাষায় গীতার অনুবাদ পাঠ করিতে পারে। তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের তুল্য হইবে।

(খ) **গার্হস্থ্যাশ্রম।**

গৃহস্থ শব্দ হইতে গার্হস্থ বা গার্হস্থ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গৃহস্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ যিনি গৃহে থাকেন। বিবাহিত জীবন গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশিষ্ট অঙ্গ. সুতরাং কোন পুরুষ অবিবাহিত থাকিলে, তাহাকে প্রকৃতভাবে গৃহস্থ বলা যায় না।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় যে গুরুগৃহে শিষ্যের শিক্ষা সমাপ্তির পর এবং তাহার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের ঠিক পূর্বে গুরু তাহাকে নিম্নলিখিতভাবে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, "সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মাপ্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ"—অর্থাৎ সত্য বলিও। ধর্মাচরণ করিও। বেদপাঠে অমনোযোগী হইও না। সন্তোষজনক দক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া আচার্যকে দিও। সন্তানসূত্র ছেদন করিও না (অর্থাৎ বিবাহ করিয়া পুত্রকন্যালাভের চেষ্টা করিও)।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। অবিবাহিত অবস্থা ইহার ব্যতিক্রম মাত্র। সুতরাং বিবাহিত অবস্থা গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশিষ্ট অঙ্গ।

বিদ্যাশ্রমে অন্যান্য বিদ্যার সহিত ধর্মশিক্ষা করিতে হয় এবং সংযমশিক্ষা এই ধর্মশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং সন্তানোৎপাদনেও সংযম আবশ্যক। পৃথিবীতে জনসংখ্যার আধিক্য ঘটায়, অত্যধিক পুত্রকন্যা পিতামাতার, তাহাদের নিজেদের ও সমাজের দুঃখকষ্টের কারণ হয়।

পূর্বে যে চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থচতুষ্টয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধর্মকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাশ্রমেই এই ধর্মশিক্ষা বিশেষভাবে করিতে হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্মানুমোদিতভাবে অর্থোপার্জন করিতে হয় এবং এই প্রকারে অর্জিত অর্থের সাহায্যে সংযতভাবে কামনাসমূহের তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিতে হয়। অতএব প্রথম আশ্রম (অর্থাৎ বিদ্যাশ্রম) প্রথম পুরুষার্থ সাধনের (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট ধর্মশিক্ষার) উপযুক্ত সময় এবং গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষার্থসাধনের (অর্থাৎ ধর্মানুমোদিতভাবে অর্থোপাজনের এবং কামনাসমূহের সংযত তৃপ্তিসাধনের) উপযুক্ত সময়।

প্রাচীনকালে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্যাশ্রম চলিতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে সাধারণতঃ ৬০।৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্যাশ্রম চলে। ইহা এইভাবে চলিতে পারে। (প্রাচীন মতে প্রথম ২৫ বৎসর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, দ্বিতীয় ২৫ বৎসর গার্হস্থ্যাশ্রম, তৃতীয় ২৫ বৎসর বানপ্রস্থাশ্রম এবং তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রম)।

(গ) **সাধনাশ্রম :—**

পূর্বে এই আশ্রমকে বানপ্রস্থাশ্রম বলা হইত। ৫০ বৎসর বা ততোধিক বয়স হইবার পর সংসার ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিবার ও সেখানে কুটির নির্মাণ করিয়া নির্জনে তপস্যা ও ধর্মসাধনা করিবার

বিধি ছিল। বনে প্রস্থান করিতে হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল বানপ্রস্থাশ্রম। পূর্বকালেও ইহার খুব বেশী প্রচলন ছিল না এবং বর্তমান সময়ে ইহা অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনরূপেই উপযোগী নহে। সুতরাং বর্তমান সময়ে 'বানপ্রস্থাশ্রম' এই নামটির কোন সার্থকতা নাই।

৬০।৬৫ বৎসর বয়সের পর পুত্র কন্যা প্রভৃতির উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া যে কোন ব্যক্তি যতদূর সম্ভব নির্লিপ্তভাবে গৃহে থাকিয়াও সাধনা করিতে পারেন। গৃহে বিশেষ অসুবিধা ঘটিলে কোন আশ্রমে গিয়াও একমনে ধ্যানধারণা প্রভৃতি করা যাইতে পারে। কিছু কিছু এইপ্রকার আশ্রমের প্রতিষ্ঠাও বাঞ্ছনীয়। সর্ব প্রকার বিলাসিতা ত্যাগ ও যতদূর সম্ভব অল্পব্যয়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা ইহাই হইবে সাধনাশ্রমীর তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন। আশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য অল্পলাভে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা অন্যভাবে অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সাধনাশ্রমিগণ নিষ্কাম জনহিতকর কার্যে কিছু সময় নিয়োজিত করিতে পারেন।

(ঘ) **সন্ন্যাসাশ্রম ঃ—**

সংস্কৃত অস্ ধাতুর অর্থ নিক্ষেপ করা বা ছুঁড়িয়া ফেলা। সম্+নি+অস্+অ=সন্ন্যাস। সমস্ত জাগতিক দ্রব্যকে সম্যক্‌রূপে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়াই অর্থাৎ সর্বত্যাগই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার। যখন কোন ব্যক্তির মনে কোন পার্থিব দ্রব্যের প্রতি বা কাহারও প্রতি কোনপ্রকার আসক্তি থাকে না এবং নিজের শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য কেবল যতটুকু আহার্য প্রভৃতি আবশ্যক, ততটুকুই তিনি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে। সন্ন্যাসী আত্মসংস্থ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি। এইপ্রকার মানসিক অবস্থা হইতেই তিনি স্থির ও নির্মল আনন্দলাভ করেন। সর্বত্যাগী হওয়ায়, সন্ন্যাসীকে নিজের গৃহও ত্যাগ করিতে হয়। তিনি কোন আশ্রমে বা মঠে বাস করিতে পারেন।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ গীতা ১৮।৪৯

—সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, মনোজয়ী ও কামনাহীন ব্যক্তি সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিলাভ করেন (অর্থাৎ দেহধারণের জন্য সামান্য কার্য ব্যতীত তাঁহার আর কোন করণীয় থাকে না)—১৮।৪৯

লভন্তেব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ গীতা ৫।২৫

—যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, সংশয়সমূহ দূরীভূত হইয়াছে, চিত্ত সংযত হইয়াছে ও যাঁহারা সমস্তজীবের কল্যাণকামী এইপ্রকার ঋষিগণ (ব্রহ্মভাবে স্থিতিরূপ) ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ৫।২৫

ব্রহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণের দ্বারা সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ও পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্থির, নির্মল ও শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হওয়াই প্রকৃত সন্ন্যাসীর লক্ষ্য।

ভারতের আদর্শ অনুসারে সর্বত্যাগী প্রকৃত সন্ন্যাসীই ভারতের আদর্শ পুরুষ। তিনি সর্বভূতাত্মা ভূতাত্মা (গীতা ৫।৭) অর্থাৎ সমস্ত জীবের আত্মাকে নিজের আত্মার ন্যায় মনে করেন। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ (গীতা ১২।১৩)—অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রতি তাঁহার কোন প্রকার দ্বেষভাব থাকে না, তিনি সকলের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব ও সদয়ভাব পোষণ করেন (১২।১৩)।

সন্ন্যাসাশ্রম সাধনাশ্রমেরই পরিণত অবস্থা। চতুর্বগের ভিতর বলা হইয়াছে যে মানুষের চতুর্থ প্রয়োজন মোক্ষ বা মুক্তি। সাধনাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম উভয় আশ্রমেরই লক্ষ্য ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। ইহাই ইহলোক ও পরলোকে স্থায়ী সুখশান্তি লাভের পথ।

অধিকাংশ লোকের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রমের কঠোরতা পালন সম্ভব নহে। কিন্তু সাধনাশ্রমের সাধনাদি প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব ও করণীয়। স্ত্রীলোকগণ অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিয়া সাধনাশ্রমের সাধনাদি করিতে পারেন। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা নারীগণের জন্যও সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সাধনাশ্রমে থাকিয়াও মুক্তিলাভেচ্ছু পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের পক্ষে ইহলোকে জীবন্মুক্তি ও পরলোকে পূর্ণমুক্তি লাভ করা সম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যাশ্রমে গীতার শিক্ষা

বিদ্যাযোগ

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা।

সংস্কৃত পরা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ; সুতরাং পরাবিদ্যা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিদ্যাকেই সাধারণতঃ পরাবিদ্যা বলা হয় এবং সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বই পরাবিদ্যার অন্তর্গত। ইহলোকে ও পরলোকে মানুষ সুখশান্তি লাভ করিতে চায়। ইহা লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আবশ্যক। সেই জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা হয়। মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্মদেহধারী আত্মা থাকে, পরাবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা সে পরলোকেও সুখী হইতে পারে।

জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। পরাবিদ্যা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই কার্যকরী; কিন্তু অপরাবিদ্যা সাধারণতঃ ইহলোকে অর্থাৎ স্থূলদেহধারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে এই পৃথিবীতে কার্যকরী। পরাবিদ্যা উভয়লোকে কার্যকরী বলিয়া এবং মানুষ যে স্থায়ী সুখ শান্তি লাভ করিতে চায়, তাহা লাভ করিতে হইলে ইহা আবশ্যক বলিয়া ইহাকে অপরাবিদ্যা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী স্থূলদেহ ধারণ করিয়া বংশানুক্রমে এই পৃথিবীতে বাস করুক ও পৃথিবীর নানাপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য সংযতভাবে ত্যাগের সহিত ভোগ করুক ইহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা—এই প্রকার অনুমানই সুসঙ্গত অনুমান।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ গীতা ১৮।৪৬

—যাঁহা হইতে (অর্থাৎ যে ঈশ্বর হইতে) প্রাণিগণের কর্মপ্রচেষ্টা ও ভোগপ্রবৃত্তি জন্মে, যিনি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন নিজ নিজ কার্যের দ্বারা, তাঁহার অর্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

—ঈশোপনিষৎ—১

—এই জগতে পরিবর্তনশীল যাহা কিছু আছে, তাহাকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে (অর্থাৎ তাহার ভিতরে ও বাহিরে ঈশ্বর সর্বদা বর্তমান আছেন ইহা মনে রাখিবে)। এই পরিবর্তনশীল দ্রব্য-সমূহকে ত্যাগের দ্বারা (অর্থাৎ অনাসক্তভাবে ও অন্যের জন্য কিছু কিছু ত্যাগ করিয়া) ভোগ করিবে। কাহারও ধনে লোভ করিও না (অর্থাৎ নিজের বা অন্য কাহারও ধনের প্রতি তোমার মনে কখনও যেন কোনপ্রকার লোভ না জন্মে)।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্মলিপ্যতে নরে॥

—ঈশোপনিষৎ—২

—এই জগতে কর্মসমূহ (অর্থাৎ অনাসক্তভাবে সৎকর্মসমূহ) করিয়া মানুষ শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপ করিলে কর্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না (অর্থাৎ কর্ম তোমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না)। ইহা ব্যতীত অন্য পথ নাই।

১। অপরাবিদ্যা (বা জাগতিক বিদ্যা)।

মানুষ এই পৃথিবীতে সুস্থ দেহে ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কোটি কোটি মানুষের এই একই প্রকার ইচ্ছা। গীতা হইতে যে একটি শ্লোক ও ঈশোপনিষৎ হইতে যে দুইটি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে মানুষের এইপ্রকার ইচ্ছা অসঙ্গত ইচ্ছা নহে এবং ইহা ঈশ্বরেরও ইচ্ছা এইরূপ বলা যাইতে পারে।

অন্ন বস্ত্র গৃহ ঔষধপথ্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য এবং যান-বাহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি মানুষের আবশ্যক হয়। ইহার জন্য তাহাকে নানাপ্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। জাতীয় সরকার ও অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তি জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চতর বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নানা-প্রকার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী বিদ্যালয় ও নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষালয়ও আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোনরূপেই অবহেলার বিষয় নহে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাট জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে স্থানলাভ করিতে হইলে, ভারতীয় জাতিকে সর্বপ্রকার আধুনিক বিদ্যায় বিশেষতঃ বিজ্ঞানে অগ্রণী হইতে হইবে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিদ্যাশ্রমীকে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষায় গভীর মনোনিবেশ ও তদুদ্দেশ্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে হইবে। জ্ঞানই মানুষকে শক্তিশালী করে। সুতরাং ভারতীয় জাতিকে শক্তিশালী হইতে হইলে ভারতীয় বিদ্যাশ্রমিগণকে বিভিন্ন বিদ্যায় যতদূর সম্ভব গভীর জ্ঞানলাভ করিতে হইবে এবং মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন তথ্য ও যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করিতে হইবে।

(ক) সাধারণ শিক্ষা (বা বুদ্ধিগত শিক্ষা) :—

সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বালক-বালিকাগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হয় এবং তাহার পর তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা (অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা) ভারতের প্রত্যেক বালক-বালিকার পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বত্র ইহার যথাযথ ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয় নাই।

নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পর যাহারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী তাহারা ক্রমশঃ উচ্চতর বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করিতে পারে। কিন্তু যাহারা বিশেষ মেধাবী নহে, তাহারা কারিগরী

বিদ্যালয়, শিল্প-শিক্ষালয় প্রভৃতিতে শিক্ষালাভ করিয়া নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বা নানাপ্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সাধারণ পুস্তকাগার হইতে বিভিন্ন প্রকার পুস্তক লইয়া জ্ঞানলাভের আনন্দও লাভ করিতে পারে।

কোন ছাত্র বা ছাত্রী সাধারণ শিক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না বলিয়া তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল এইরূপ মনে করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবাসিগণের সম্মুখে বিরাট কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কোন্ বিদ্যাশ্রমীর কোন্ দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা আছে তাহা অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণকে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তদনুসারে তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। যে বিদ্যাশ্রমী সাধারণ শিক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না, সে অন্য কোন কর্মক্ষেত্রে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারে। সকলকে কর্মে নিযুক্ত করার ব্যাপারে জাতীয় সরকারের এবং সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণেরও দায়িত্ব আছে।

সাধারণ শিক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। ইহার সহিত গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়িতে হয়। ইংরাজী আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং ইংরাজী জানিলে পৃথিবীর যে কোন দেশের লোকের সহিত যোগাযোগ করা যায়। সেইজন্য সাধারণ শিক্ষায় ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া ইহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতে হিন্দী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটি সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক বলিয়া সাধারণ শিক্ষায় হিন্দীভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলা, হিন্দী প্রভৃতির অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে উৎপন্ন এবং ভারতের প্রাচীন উচ্চ ভাবধারা সংস্কৃতভাষায় লিখিত পুস্তক-সমূহের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেইজন্য সাধারণ শিক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষারূপে সংস্কৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) শারীর শিক্ষা ঃ—

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী স্থূলদেহধারী মানুষ। কিভাবে এই স্থূল দেহকে সুস্থ ও সবল, দৃঢ় ও কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘদিন রাখিতে পারা যায় তাহা শিক্ষা করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

শরীরকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় রাখিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্য অত্যাবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে কিভাবে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রভৃতি আছে। বিদ্যাশ্রমিগণ এইপ্রকার পুস্তকের সাহায্যে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে ও তদনুযায়ী চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।*

গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন শ্রেণীর লোকের তিন প্রকার আহারের কথা বলা হইয়াছে।

আয়ুঃ সত্ত্বলারোগ্য সুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥

—গীতা—১৭।৮

—যে প্রকার আহার মানুষের আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, নীরোগভাব, সুখ ও প্রীতি বর্ধন করে এবং যাহা সরস, স্নিগ্ধ, দেহের সারাংশ বর্ধক ও হৃদয়ানন্দকর, তাহা সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।—১৭।৮

কট্বম্ললবণত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ গীতা—১৭।৯

—অতিশয় তিক্ত, টক, লবণাক্ত, গরম, ঝাল, স্নিগ্ধতাহীন, প্রদাহকারী, দুঃখকষ্টরোগোৎপাদক আহার রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়—১৭।৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ গীতা—১৭।১০

—যে খাদ্য বহুপূর্বে রন্ধন করায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, যাহা নীরস,

* ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের হাওড়া জেলা শাখাসমূহ কর্তৃক প্রচারিত 'জনস্বাস্থ্য'-নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে তাহারা কিছু তথ্য পাইতে পারে।

দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষণীয়, তাহা তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।—১৭।১০

উল্লিখিত তিন প্রকার আহারের মধ্যে সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার যে উত্তম আহার তাহা বলাই বাহুল্য।

উত্তম খাদ্যও অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করা উচিত নহে। আহারের পর শরীরের অস্বস্তির ভাব না আসে, এইভাবে পরিমিত আহার করিয়া মিতাহারী হওয়ার চেষ্টা করাই সকলের উচিত।

যোগীদের (অর্থাৎ যাঁহারা ধ্যানধারণা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মনের সংযোগ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের) সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ গীতা—৬।১৬

—হে অর্জুন, অতিরিক্ত ভোজনকারীর কিংবা একান্ত অনাহারীর, অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ কিংবা অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তির যোগসিদ্ধ হয় না।—৬।১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ গীতা—৬।১৭

—যিনি নিয়মিত ভোজন করেন, নিয়মিত ভ্রমণ করেন, বিভিন্ন প্রকার কার্যের জন্য নিয়মিত চেষ্টা করেন, যাহার নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই নিয়মিতভাবে হয়, তাঁহার যোগ দুঃখনাশক হয়।—৬।১৭

যোগীদের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, সাধারণ লোকের সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টা হইতে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুম শরীরের সুস্থতার জন্য আবশ্যক হয়।

শরীরকে সবল ও দৃঢ় করিতে হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়মিত পরিচালনা আবশ্যক। বিদ্যাশ্রমিগণ যে খেলাধূলা করে, তাহার সাহায্যে ইহা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। সাধারণ ব্যায়াম বা যোগব্যায়াম বা ব্রতচারী নৃত্যের দ্বারা ইহা হইতে পারে। যাহারা দীর্ঘপথ হাঁটিয়া বিদ্যালয়ে আসে ও ঐ ভাবে বাড়ি ফিরিয়া যায়,

ইহা দ্বারাই তাঁহাদের অঙ্গচালনা হয়। নিয়মিত সন্তরণ অঙ্গচালনার একটি ভাল উপায়। পল্লীঅঞ্চলে অনেকের গৃহসংলগ্ন কিছু পতিত জমি থাকে। এই স্থানে তরিতরকারি উৎপাদনের চেষ্টা করিলে দৈহিক পরিশ্রম হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টাটকা তরিতরকারিও পাওয়া যাইবে। এই প্রকার ধানোৎপাদক দৈহিক শ্রমের দিকে লক্ষ্য দেওয়া বিদ্যাশ্রমিগণের কর্তব্য। যোগব্যায়ামের দ্বারা নানা-প্রকার রোগ নিবারণ করা যায়; সেই জন্য এইপ্রকার ব্যায়ামের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে আবশ্যক।

শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র কিভাবে কার্য করে এবং তাহাদিগকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় রাখিতে হইলে কি করা উচিত, তাহার শিক্ষাও শারীর শিক্ষার অঙ্গ। প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীর পক্ষে এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করা বিশেষ আবশ্যক। ইহা বালক-বালিকাগণের শারীর শিক্ষাকে কতকটা পূর্ণতা প্রদান করিবে।

(গ) বৃত্তিশিক্ষা ঃ—

অর্থ ব্যতীত পৃথিবীতে জীবনধারণ যে সম্ভব নহে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাহারও বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহাকে নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়। এই অবস্থায় এবং ইহার পরও কয়েক বৎসর জীবনধারণের জন্য প্রত্যেককে তাহার পিতামাতা বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু কেহ প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর সে ভবিষ্যতে কিভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে, তাহার চিন্তা করাও আবশ্যক। এই বিষয়ে অনেক সময় অভিভাবককে চিন্তা করিতে হয়, কিন্তু বিদ্যাশ্রমীও যে এই বিষয়ে চিন্তা করিবে না তাহা নহে। বিদ্যাশ্রমীর কোন্ দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া শিক্ষকগণও কিছু কিছু পরামর্শ দিতে পারেন।

জীবিকা অর্জনের শত শত পথ রহিয়াছে। যাহারা বিশেষ মেধাবী, তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া তাহাদের উপযোগী বিভিন্ন কার্যে যোগদান করিতে পারে। নানাপ্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার

মাধ্যমে অনেক সময় লোক নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে কিছু কিছু লোক জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। প্রশাসনিক কার্যেও ঐভাবে লোক নিযুক্ত করা হয়।

যে সমস্ত বিদ্যাশ্রমী ক্ষত্রিয়ের স্বভাববিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, সাহসী ও কর্মতৎপর, তাহারা আরক্ষাবাহিনী (অর্থাৎ পুলিশবাহিনী), বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনী, সেনা-বাহিনী প্রভৃতিতে যোগদান করিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করিতে পারে।

যাহারা ব্রাহ্মণের স্বভাববিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, শান্ত ও সৎ তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শিক্ষকের কার্য করিতে পারে। কারণ কোন অসৎ ব্যক্তি শিক্ষক হইবার যোগ্য নহে। ব্রাহ্মণের ন্যায় শিক্ষককে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে হয় এবং সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতে হয়।

চিকিৎসক, এন্‌জিনিয়ার (যন্ত্রশিল্পী বা বাস্তুশিল্পী), ব্যবহার-জীবী (আইনজ্ঞ ব্যক্তি) প্রভৃতি হইবার জন্য নির্ধারিত বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়।

যাহারা বিশেষ মেধাবী নহে অথবা অন্য কোন কারণে সাধারণ শিক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, তাহাদেরও কোনরূপ হতাশ হওয়া উচিত নহে; কারণ তাহাদের সম্মুখেও বি[illegible]ট কর্মক্ষেত্র রহিয়াছে। নানাপ্রকার হাতের কাজ শিখিয়া, কলকারখানায় কাজ করিয়া, বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অথবা কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কার্য করিয়া অনেক লোক অর্থোপার্জন করিতে পারে। নিজেদের জমি থাকিলে কৃষিকার্যের সাহায্যে শস্য ও ফল প্রভৃতি উৎপাদনের এবং জলাশয় থাকিলে মাছের চাষের দ্বারা অর্থাগম হইতে পারে। গরু মহিষ প্রভৃতি পশুপালন, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি প[illegible]পালন এবং দুগ্ধ ও ডিম্বাদি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থলাভ হইতে পারে। এই বিষয়েও কিছু কিছু শিক্ষা আবশ্যক। দেশের পরিবহণব্যবস্থার ভিতরও কিছু কিছু নূতন লোকের কর্মের সংস্থান হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে করণিকের কার্য

করিবার জন্যও লোক আবশ্যক হয়। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতে পারদর্শী হইতে পারিলেও, অর্থাগম হইতে পারে।

প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীর স্বভাবচরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি ও তাহার কি প্রকার সুযোগসুবিধা আছে, তাহা ভালভাবে জানিয়া তাহার বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা ও জীবিকা অর্জনের পথ নির্ণয় করিতে হয়।

সাধারণ বিদ্যালাভের পর প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীর যাহাতে কর্মের সংস্থান হয় ও তাহার যোগ্যতা অনুসারে সে অন্ততঃ কিছু অর্থোপার্জন করিতে পারে, তাহার জন্য জাতীয় সরকারের ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণের সমবেত প্রচেষ্টা আবশ্যক।

বৈশেষিক দর্শনে ধর্মের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সার্বজনীন অভ্যুদয় বা উন্নতি ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। সুতরাং প্রত্যেকের উন্নতিতে যথাসম্ভব সাহায্য করিলে তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ধর্মকার্য হইবে।

২। অপরাবিদ্যার সহিত পরাবিদ্যা বা ধর্মশিক্ষার আবশ্যকতা।

জাগতিক সর্বপ্রকার বিদ্যায় যতদূর সম্ভব অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে এত বিস্তৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে কোন একজন লোকের পক্ষে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে যিনি প্রত্যেক বিষয়ের কিছু কিছু জানেন এবং কয়েকটি বিষয়ের সবকিছু জানেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু কোন ব্যক্তির এইপ্রকার জ্ঞান থাকিলেও, তিনি যদি ধর্ম ও মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ণ শিক্ষিত বলা চলে না। উল্লিখিত প্রকারের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাহার শিক্ষা বিকলাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে

বলিতে হইবে এবং এইপ্রকার শিক্ষাই এখন সাধারণতঃ চলিতেছে। নীচে (ক) হইতে (ঙ) পর্যন্ত যে বিদ্যার কথা বলা হইতেছে তাহাকে পরাবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা বলা যাইতে পারে। বিদ্যাশ্রমের পর ইহাদের দৃঢ়তা সাধন আবশ্যক হইবে।

(ক) আত্মসংযম :—

সংযম শিক্ষা ধর্মশিক্ষার প্রথম অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য অঙ্গ। আত্মসংযমই ধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি। সেইজন্য গীতায় পুনঃ পুনঃ আত্মসংযমের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মানুষের আছে। ইহাদের সাহায্যে সে যে কেবল জ্ঞানলাভ করে তাহা নহে ; ইহাদের সাহায্যে সে বিভিন্ন প্রকার সুখও লাভ করে। এইপ্রকার সুখের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যাত্রা, সবাক চলচ্চিত্র ও থিআটার একসঙ্গে চক্ষু ও কর্ণের সুখদায়ক হয়। সেইজন্য এত লোক ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি কোন বিদ্যাশ্রমী বিদ্যাশিক্ষায় অবহেলা করিয়া অথবা অন্য কোন কর্তব্য পালন না করিয়া, অথবা কাহারও পয়সা চুরি করিয়া যখন তখন বায়্যাস্কোপ প্রভৃতি দেখিতে যায়, সে যে অসঙ্গত কার্য করে ইহা বলাই বাহুল্য। আত্মসংযমের স্বভাবশতঃই সে এইরূপ কার্য করে।

শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যে প্রকার খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়া চিকিৎসক কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন, সে যদি কেবল তাহার জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য সেই প্রকার খাদ্য যখন তখন আহার করে, তাহা হইলে সে রোগাক্রান্ত হইয়া নিজের ও অন্যের কষ্টের কারণ হইতে পারে। ঐ ব্যক্তির সংযমের অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী। প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীকে খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে সংযত হইতে হইবে।

মানুষের ভিতর সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি—এই দুই প্রকার প্রবৃত্তির উদয় হয়। কোন বালক রাস্তা দিয়া যাইবার সময় রাস্তার পার্শ্ববর্তী কোন জমিতে সুন্দর শসা হইয়াছে দেখিয়া, সে ঐ জমিতে প্রবেশ

করিল ও শসা তুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিল ও কয়েকটি শসা তাহার পকেটে লইল। পরে জমির মালিক হয়ত আসিয়া পড়িল এবং ঐ বালককে তিরস্কার করিল বা প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালক তাহার কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার এই লাঞ্ছনা ঘটিল।

কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ উৎকোচ গ্রহণ করে বা ঘুষ নেয়। কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে না পারিয়া কিছু লোকে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি শত শত অন্যায় কার্যে লিপ্ত হয়।

সেইজন্য বাল্যকাল হইতে সংযমশিক্ষা আবশ্যক।

কোন লোকের জীবনে যখন দুর্ভোগ ঘটে, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা অন্য লোককে তাহার জন্য অনেক সময় দায়ী মনে করে। কিন্তু তাহার নিজের ভিতর যে কয়েকটি শত্রু রহিয়াছে, একথা সে সাধারণতঃ চিন্তা করে না। সেইজন্য আমাদের ধর্মশাস্ত্র আমাদিগকে ছয়টি অন্তঃশত্রুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাছাড়া ধর্মপথে চলিতে গেলে যে এই অন্তঃশত্রুগুলিকে দমন করিয়া রাখা দরকার, তাহার কথা বলে। গীতাতেও এই শত্রুগুলিকে দমন করিয়া রাখার কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মদ, (৬) মাৎসর্য—এই ছয়টি অন্তঃশত্রুকে সাধারণতঃ ষড়রিপু বলা হয়। এই ছয়টি অন্তঃশত্রুর মধ্যে প্রথম তিনটি অত্যন্ত প্রবল এবং পৃথিবীতে যত কিছু অন্যায় কার্য লোকে করে, প্রথম তিনটি অন্তঃশত্রুর দ্বারা চালিত হইয়াই তাহারা সাধারণতঃ এইরূপ করে।

১। **কাম ঃ**—পার্থিব দ্রব্য প্রভৃতির সাহায্যে সুখী হইবার প্রবল কামনাকে এক কথায় কাম বলা হয়। মানুষের ভিতর এই কাম বা কামনার অন্ত নেই। সে অর্থ চায়, সুন্দর পোশাক, ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, নিজের গাড়ি, উচ্চ পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভৃতি অনেক কিছু চায়; তাহার কামনার কোন অন্ত নাই। সে যতই অর্থবান

হউক না কেন সে আরও অর্থ চায়। কাম বা প্রবল কামনাকে গীতায় আগুনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আগুনে যতই দাহ্য পদার্থ দেওয়া যাক না কেন, কিছুতেই যেমন তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, সেইরূপ মানুষের কামনারও কিছুতে পরিতৃপ্তি হয় না।

আবৃতং জ্ঞানমেতন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ গীতা-৩।৩৯

—হে অর্জুন, জ্ঞানী ব্যক্তির নিত্যশত্রু কামরূপী এই দুষ্পূরণীয় (অর্থাৎ সর্বদা অপরিতৃপ্ত) অগ্নির দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে।—গীতা-৩।৩৯

সেইজন্য কামনার সংযম অত্যাবশ্যক।

২। **ক্রোধ**ঃ—মানুষের মনোগত কাম বা কামনা বাধাপ্রাপ্ত হইলে, ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হইয়া মানুষ নানা-প্রকার অন্যায় কাজ করে, এমন কি যে নরহত্যাকে মহাপাপ বলা হয় সেই নরহত্যাও সে কখন কখন করে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ গীতা-৩।৩৭

—রজোগুণ হইতে জাত এই কাম ও এই ক্রোধ সর্বদা অতৃপ্ত ও মহাপাপমূর্তি ; নিজের শ্রেয়োলাভের পথে ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিও। গীতা-৩।৩৭

অক্রোধেন ক্রোধং জিনেৎ—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে।—ইহা বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা।

৩। **লোভ**ঃ—যাহা আছে বা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন অসঙ্গতভাবে আরও পাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মে, তখন তাহাকে লোভ বলা হয়। লোভের বশবর্তী হইয়া মানুষ শত শত প্রকার অন্যায় কার্য করে। সেই জন্য লোভকে দমন করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ গীতা-১৬।২১

—কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা নরকের তিনটি দ্বারস্বরূপ ও এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিও। গীতা—১৬।২১

৪। **মোহ ঃ**—মনের মধ্যে কামনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির প্রাবল্য ঘটিলে কি করা উচিত বা কি উচিত নহে, সেই জ্ঞান লোকে হারাইয়া ফেলে। কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয়ে এইপ্রকার চিত্তবিভ্রমকে মোহ বলা হয়। যথার্থ ও শুভ পথ নির্ণয়ে বাধাস্বরূপ হয় বলিয়া, মোহ মানুষের শত্রু।

৫। **মদ ঃ**—নিজের শক্তি সম্বন্ধে ভিত্তিহীন উচ্চ ধারণা থাকিলে মনের মধ্যে যে অহেতুক গর্ব আসে, তাহাই মদ। মদান্ধ হইয়া মানুষ অনেক সময় যে অন্যায় কাজ করে, তাহার দ্বারা সে নিজেরই অমঙ্গল সাধন করে; সেই জন্য মদ মানুষের শত্রু।

৬। **মাৎসর্য ঃ**—অন্য কেহ ভাল বা বড় হইয়াছে বা হইতেছে ইহা কিছু লোকের ভাল লাগে না। এইপ্রকার পরশ্রীকাতরতাকে মাৎসর্য বলা হয়। মাৎসর্য মানুষকে অন্যের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত করে এবং ইহার দ্বারা সে নিজেকে নিম্নস্তরে নামাইয়া লইয়া যায়। এই কারণে মাৎসর্যও মানুষের শত্রু। অন্যের যে কোনপ্রকার সুসঙ্গত উন্নতিতে সুখবোধ করাই উচিত।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে যে ইন্দ্রিয় সুখলাভ করা যায় তাহার জন্য অধিকাংশ লোকের মনে যে প্রবল কামনা জন্মে সেই প্রবল কামনাই নানাভাবে অনেক সময় তাহাদের দুঃখকষ্টের কারণ হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া রাখিবার কথা গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ গীতা—২।৬০

—যত্নবান বিবেকী পুরুষের মনকেও পীড়নকারী ইন্দ্রিয়গণ জোর-পূর্বক হরণ করিয়া বিষয়ের সহিত যুক্ত করে। গীতা—২।৬০

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ গীতা—২।৬১

—সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, মনকে আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া ও ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশীভূত হইয়াছে, তাহার প্রজ্ঞা (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (অর্থাৎ স্থিরতালাভ করিয়াছে)। গীতা—২।৬১ ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে। পরে যাহাতে কাহারও কোনরূপ দুঃখকষ্ট না ঘটে, সেইজন্য সম্পূর্ণ সংযত-ভাবে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কথা বলা হইতেছে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা—২।৬৪

—অনুরাগ ও দ্বেষ হইতে মুক্ত ও নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়া সংযত পুরুষ মনের প্রসন্নতা লাভ করেন। গীতা—২।৬৪

(খ) সমদর্শন :—

সমদর্শী হইবার শিক্ষা গীতার অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা—৫।১৮

—বিদ্বান্ ও বিনয়ী ব্রাহ্মণের প্রতি, গরু, হাতি, কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন।

সংস্কৃত শ্ব শব্দের অর্থ কুকুর, পূর্বে হিন্দুসমাজে এক শ্রেণীর লোক ছিল, যাহারা কুকুরের মাংস পাক করিয়া (অর্থাৎ রান্না করিয়া) খাইত। সংস্কৃতে ইহাদের শ্বপাক বলা হইত। ইহাদের অন্য নাম চণ্ডাল। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ যেমন হিন্দুসমাজে উচ্চতমস্তরের মানুষ, শুচিজ্ঞানহীন কুকুরমাংসভোজী চণ্ডাল সেইরূপ হিন্দুসমাজে নিম্নতম স্তরের মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইত। গীতায় উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিতগণ (অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা) ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমানভাবে দেখেন। সুতরাং আমাদের সকলেরই ঐভাবে দেখা উচিত। কিন্তু ইহা কি সম্ভব ?

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কেহ কেহ নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্মজ্ঞানাত্তু ব্রাহ্মণঃ॥

—শূদ্রভাবেই বালক জন্মগ্রহণ করে; (উপনয়ন রূপ) সংস্কার হইলে তাহাকে দ্বিজ বলা হয়। বেদপাঠের পর তাহাকে বিপ্র বলা হয় এবং যখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন যে ব্রাহ্মণ হয়।

উপনয়ন শব্দের অর্থ (বেদপাঠ ও ধর্মশিক্ষার জন্য আচার্যের নিকট বালককে) লইয়া যাওয়া (এবং ইহার জন্য নির্ধারিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন)। ইহার দ্বারা বালকের যেন ধর্মজগতে (দ্বিতীয়বার) জন্ম হয়। সুতরাং সে তখন দ্বিজ (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার জন্মপ্রাপ্ত) হয়। বেদ পাঠের পর তাহার নাম হয় বিপ্র। কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ হইতে যখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই সে ব্রাহ্মণ হয়। (উপ শব্দের অর্থ নিকটে; নয়ন শব্দের অর্থ লইয়া যাওয়া। সুতরাং উপনয়নের অর্থ ধর্মজ্ঞানের জন্য আচার্যের নিকট লইয়া যাওয়া। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ্ ধাতু ক্বিপ=উপনিষদ। উপ শব্দের অর্থ নিকটে, নি শব্দের অর্থ নিশ্চিতভাবে; সদ্ ধাতুর অর্থ লইয়া যাওয়া; সুতরাং যে পুস্তক মানুষের মনকে নিশ্চিতভাবে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়, তাহাই উপনিষদ্। উপনিষদে বিশ্বের পরম পুরুষকে ব্রহ্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে)।

গীতার পূর্ণনাম ভগবদ্গীতোপনিষদ্; সুতরাং গীতার বাংলা অনুবাদ পাঠ করিলেও উপনিষদ পাঠ করা হয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কেহ যদি মনোযোগ ও ভক্তির সহিত গীতার বঙ্গানুবাদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে সেও উপনিষদের বাণী শ্রবণ করিতেছে, ইহা বলিতে হইবে।

গীতার ১৮।৭০ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ১৮।৭০

—অর্থাৎ যিনি আমাদের দুই জনের (অর্থাৎ কৃষ্ণ ও অর্জুনের) মধ্যে আলোচিত ধর্ম্যসংবাদ (অর্থাৎ গীতায় আলোচিত ধর্মতত্ত্ব) পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) পূজা করিবেন—ইহাই আমার মত। অতএব ঈশ্বরভক্তি ও মনোযোগের সহিত গীতা পাঠ করিলে তাহা জ্ঞানযজ্ঞ হইয়া দাঁড়ায়। গীতার অনুবাদ পাঠই বর্তমান যুগে সার্বজনীন স্বাধ্যায় হইবে।

গীতোপনিষদে তিন প্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ গীতা—১৫।১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা—১৫।১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ গীতা—১৫।১৮

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর—এই দুই প্রকার পুরুষ আছেন। স্থূলদেহধারী সমস্ত জীব ক্ষর পুরুষ, কিন্তু যিনি ইহাদের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন, তিনি অক্ষর পুরুষ। এই দুইটি হইতে পৃথক আর একজন উত্তম পুরুষও আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি (স্বর্গ, মর্ত্য প্রভৃতি) ত্রিলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া অব্যয় ঈশ্বররূপে সকলের ভরণপোষণ করিতেছেন। যেহেতু আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) ক্ষর পুরুষ হইতে ঊর্ধ্বে এবং অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম, সেইজন্য আমাকে লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে। ১৫।১৬-১৮

প্রত্যেক মানুষের পৃথক দেহ, পৃথক ইন্দ্রিয়সমূহ, পৃথক মন, পৃথক অহংকার (অর্থাৎ আমিত্ববোধ), পৃথক বুদ্ধি আছে। এইগুলির সমাবেশকে ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুরুষ বলা হয়। ক্ষর পুরুষ চেষ্টা দ্বারা নিজের দেহ, মন ও বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে পারে। কোন স্থানে কুক্কুরমাংসভোজী কিছু চণ্ডাল ছিল। একটি ভাল লোকের পরামর্শে তাহারা ঐ প্রকার মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিল এবং তাঁহার সাহায্যে তাহাদের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি

হইল ও তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষারও ব্যবস্থা হইল। ইহার ফলে তাহাদের কেহ কেহ বেশ শুদ্ধাচারী ও ঈশ্বরভক্তিসম্পন্ন হইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে এই ঈশ্বরভক্তগণ দ্বিজগণের ন্যায় উন্নত স্বভাবসম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রকার লোককে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ"—চণ্ডালও যদি শুদ্ধাচারী ও ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হয়, সেও দ্বিজগণের বা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। ইহা হইতে গীতায় কেন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমানভাবে দেখিতে বলা হইয়াছে তাহা বোঝা যাইবে।

ইহা ব্যতীত আরও কারণ আছে। প্রত্যেক ক্ষর পুরুষের ভিতর একটি অক্ষর (অর্থাৎ পরিবর্তনহীন) পুরুষও আছেন। এই অক্ষর পুরুষকে আমরা জীবাত্মা বলি। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভিতর একই প্রকার জীবাত্মা অক্ষর পুরুষরূপে বর্তমান এবং বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের অংশরূপে এই জীবাত্মাগণ বিভিন্ন স্থূলদেহের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" গীতা—১৫।৭ আমারই (ঈশ্বরেরই) সনাতন (অর্থাৎ অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী) অংশ জীবলোকে জীবরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভিতর একই ঈশ্বরের সনাতন অংশ বর্তমান।

ভালভাবে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে গেলে বিশ্বের চরম সত্ত্বা সম্বন্ধে ও তাহা হইতে জড় জগতের ও জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই জন্য এই স্থানে এই সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে।

পৃথিবীতে আমরা মাটি, জল, বায়ু প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থূল জড়-দ্রব্য ও আগুনের এবং সূর্যের উত্তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জড়শক্তি দেখিতে পাই। পৃথিবী যে অনন্তকাল ধরিয়া আছে ও থাকিবে তাহা নহে। এমন এক সময় ছিল যখন পৃথিবী ছিল না। এই স্থানে তিনটি দার্শনিক স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) যাহার আদি আছে অর্থাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অন্ত অর্থাৎ বিনাশ ঘটিবেই। (মানুষের স্থূলদেহের জন্ম বা উৎপত্তি

হইয়াছে, সুতরাং ইহার বিনাশ অনিবার্য। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কোন মানুষের নাই)।

(২) কিছু না (অর্থাৎ শূন্য) হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কেবল কিছু হইতে নামরূপের পরিবর্তনের দ্বারা অন্য কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে। (মাতা যে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার শরীরকে রক্ষা করে। ঐশ্বরিক প্রেরণায় ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় মাতার দেহ হইতে আহৃত রক্তাদির সাহায্যে মাতৃগর্ভে শিশুর দেহ গঠিত হয় এবং জন্মের পর খাদ্য ও পানীয়ের সাহায্যে তাহার দেহ বর্ধিত হয়। অতএব খাদ্য পানীয়, বায়ু, সূর্যালোক ও উত্তাপ প্রভৃতি পরিবর্তিত হইয়া মানুষের দেহের রূপ ধারণ করে।

(৩) কোন কিছুকে কিছু নাতে (অর্থাৎ শূন্যে) পরিণত করা যায় না। ইহা কোন না কোন আকারে থাকিবেই। (মানুষের মৃত্যুর পর তাহার দেহ ক্রমশঃ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ কিছু অংশ মাটির সহিত মিশিয়া যায়, কিছু অংশ জলীয় বাষ্পরূপে জলের সহিত মিশিয়া যায় ইত্যাদি)।

যেহেতু পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, কোটি কোটি বৎসর পরে ইহার ধ্বংস ঘটিবেই, কিন্তু ইহা কিছু নাতে অর্থাৎ শূন্যে পরিণত হইবে না। উৎপত্তির পূর্বে ইহা ঈশ্বরের জড় শক্তিরূপে সূক্ষ্মাকারে অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ধ্বংসের পর ইহা আবার সেই সূক্ষ্ম অবস্থায় চলিয়া যাইবে। ইহাকেই প্রলয় বলা হয়।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ গীতা—৯।৭

—হে অর্জুন, প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণী অপ্রাণী আমার (সূক্ষ্ম) প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) তাহাদের সৃষ্টি করি। গীতা—৯।৭

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ গীতা ৯।১০

—হে অর্জুন, আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের), অধ্যক্ষতায় (অর্থাৎ পরি-

চালনায়) প্রকৃতি প্রাণী ও অপ্রাণীযুক্ত সমস্ত জগতের সৃষ্টি করে, এইজন্য সমস্ত জগতের ভিতর নানারূপ পরিবর্তন চলিতে থাকে।

গীতা ৯।১০

প্রলয়কালে প্রকৃতি সূক্ষ্ম ও একাকার অবস্থায় চলিয়া যায়; পরে ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহার প্রেরণায় প্রকৃতি নানা প্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল অচেতন পদার্থের ও বিভিন্ন প্রকার অচেতন শক্তির সৃষ্টি করে। পরে পৃথিবী প্রাণিগণের প্রাণধারণের উপযোগী হইলে, নানাপ্রকার সচেতন প্রাণীর ও অবশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের আবির্ভাব হয়।

কোন কোন জড়বাদী বলে অচেতন পদার্থ ও শক্তি হইতে ক্রমবিকাশের ফলে চেতনাশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু চেতনা-শক্তি অচেতন শক্তি হইতে এতদূর পৃথক যে বেদান্তিগণ তাহাদের ঐ মতকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত মনে করেন। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥ গীতা ১৩।১৯

—প্রকৃতি ও পুরুষ (অর্থাৎ উত্তম পুরুষ পরমেশ্বর) এই দুইটির উভয়কে অনাদি (অর্থাৎ আদিহীন বা জন্মহীন) বলিয়া জানিও; সর্বপ্রকার গুণের বিকাশ ও সর্বপ্রকার বিকার (অর্থাৎ পরিবর্তন) প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় জানিও। গীতা ১৩।১৯

অতএব ঐশ্বরিক চেতনাশক্তি বিশ্বে অনাদিকাল হইতে বর্তমান আছে ও অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ফলে চিৎশক্তির উৎপত্তি হইয়াছে—জড়বাদিগণের এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। চিৎশক্তি ও অচিৎশক্তি (অর্থাৎ জড়শক্তি) দুইটিই সমান-ভাবে সত্য এবং তাহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তাহারা মূলতঃ একই শক্তির দুইভাবে বিকাশপ্রাপ্ত অংশ। এই একশক্তিকে অথবা এক মূল চিন্ময় পুরুষ ব্রহ্ম বা মহান্ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্বে উপনিষদের ঋষিগণ

বলিয়াছিলেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তিনি (অর্থাৎ ব্রহ্ম) এক ও অদ্বিতীয়।

এই ব্রহ্ম কোথায় এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ?

ময়াততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিণা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ॥ গীতা ৯।৪

—অপ্রকাশিত ও অদৃশ্য মূর্তিতে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) রহিয়াছি। প্রাণী অপ্রাণী সকলেই আমার ভিতর রহিয়াছে কিন্তু আমি (ঈশ্বর) তাহাদের মধ্যে আবদ্ধ নহি।

গীতা ৯।৪

(সংস্কৃত ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া বা উৎপন্ন হওয়া। ভূ ধাতু+ক্ত =ভূত। প্রাণী ও অপ্রাণী যাহা কিছু জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের সমস্তকে বুঝাইবার জন্য ভূত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সেইজন্য ইহাদিগকে পঞ্চভূত বলা হয়। গীতার ১৩।৫ শ্লোকে ইহাদিগকে মহাভূত বলা হইয়াছে।)

সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ॥ গীতা ১৩।১৪

—ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় নাই, (অথচ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তাঁহার চিৎশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে বলিয়া) তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহের গুণ ও কার্য প্রকাশিত হইতেছে। তিনি অসক্ত (অর্থাৎ কোন কিছুতে লিপ্ত নহেন), নির্গুণ (প্রকৃতির ভিতর যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে এইগুলি তাঁহাতে নাই), অথচ গুণভোক্তা (প্রকৃতির সমস্ত গুণের কার্য তিনি বুঝিতে পারেন; তিনি সর্বভৃৎ (প্রাণিগণের জীবন-ধারণ ও সুখভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাঁহার প্রেরণায় প্রকৃতি তাহা উৎপন্ন করিতেছে—এইভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীর ভরণপোষণ করিতেছেন।)

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ গীতা ১৩।১৫

—তিনি সমস্ত প্রাণী অপ্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে আছেন; তিনি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে ভালভাবে বোঝা যায় না, তিনি দূরে আছেন, আবার নিকটেও আছেন।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ গীতা ১৩।১৬

—সমস্ত প্রাণীর ভিতর একভাবে থাকিলেও, তিনি যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিতর বিভক্ত হইয়া আছেন এইরূপ মনে হয়। তিনি সমস্ত প্রাণীর পালনকর্তা, সংহারকর্তা আবার সৃষ্টিকর্তা।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ গীতা ১২।১৭

—সূর্যনক্ষত্রাদির যে জ্যোতি, তাহা তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে, তিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত, তাঁহার জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করা উচিত, এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তিনি সকলের হৃদয়ে (জীবাত্মারূপে) বিষ্ঠিত অর্থাৎ বিশেষভাবে স্থিত বা অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন।

গীতার ৯।৪ এবং ১৩।১৪—১৭ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ঈশ্বর সূক্ষ্ম চিৎশক্তিমাত্র বলিয়া আমাদের কোন ইন্দ্রিয় তাঁহাকে ধরিতে পারে না, কিন্তু তিনি সমস্ত বিশ্বে, সমস্ত প্রাণী অপ্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে বর্তমান আছেন এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। কেবল জড় প্রকৃতি হইতে অগণিত সচেতন প্রাণীর উৎপত্তি এবং আমাদের ভরণ-পোষণের ও সুখভোগের ব্যবস্থা সম্ভব নহে। সর্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই কার্য করে।

ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে কি ভাবে জড়জগতের উৎপত্তি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতভাবে মনে রাখা যাইতে পারে।

(১) প্রলয়কালে—সূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তি (ব্রহ্ম) + সূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপী একাকার জড়শক্তি (প্রকৃতি)

(২) সৃষ্টির প্রথমাবস্থায়—সূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তি (ঈশ্বর)+ ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতির একাংশের বিভিন্ন সূক্ষ্মরূপ ও একাংশের বিভিন্ন স্থূলরূপ ধারণ।

(৩) সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থায়—সূক্ষ্মবিশ্বব্যাপীচিৎশক্তি (ঈশ্বর)+ ঈশ্বরের একাংশের জীবাত্মাভাবে (বা অক্ষর পুরুষভাবে) প্রকাশ + প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপসমূহ হইতে বহুজীবদেহ + বহুইন্দ্রিয় + বহুমন + বহু আমিত্ববোধ + বহুবুদ্ধি (অর্থাৎ বহুক্ষর পুরুষের) আবির্ভাব।

ব্রহ্ম সৃষ্টিকার্যে প্রেরণাদানকারী হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়। অসীম শক্তিশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন মহান্ ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

উপদ্রষ্টাহনুমন্তা চ ভর্ত্তাভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ গীতা ১৩।২২

—মহেশ্বর (অর্থাৎ মহান্ ঈশ্বর) উপদ্রষ্টা (নিকটে থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছেন), অনুমন্তা (প্রকৃতির কার্যের অনুমোদনকারী), ভর্তা (প্রকৃতির কার্যের ভিতর দিয়া সমস্ত জীবনের ভরণকারী), ভোক্তা (ক্ষরপুরুষ যে সুখদুঃখ ভোগ করে তাহা তিনি জানিতে পারেন বলিয়া পরোক্ষভাবে ভোক্তা) তাঁহাকে পরমাত্মাও বলা হয়। তিনি সমস্ত জীবদেহে (জীবাত্মাভাবে) পরপুরুষ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ)।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ সঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥ গীতা ১৩।২১

—পুরুষ (অর্থাৎ ক্ষরপুরুষ) প্রকৃতির ভিতর থাকিয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ (অর্থাৎ সুখদুঃখ প্রভৃতি) ভোগ করে। প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণের সহিত যুক্ত থাকায় গুণের প্রভেদ অনুসারে তাহার উত্তম বা অধম লোকের গৃহে জন্ম হয়।

পুরুষের যে ত্রিবিধ রূপ আছে তাহার কথাও আমাদের মনে রাখা অত্যাবশ্যক। উপরে উদ্ধৃত গীতার ১৫।১৬-১৮ শ্লোকে ইহা বলা হইয়াছে।

(১) বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম চিৎশক্তিরূপে বিরাজমান ঈশ্বর বা মহেশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম বলা হয়।

(২) ঈশ্বরের সনাতন (অর্থাৎ অবিনশ্বর) একাংশ প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া প্রকাশমান হইলে, তখন তাহাকে জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ বলা হয়।

(৩) প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশ হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের সহিত যুক্ত মন, অহঙ্কার (আমিত্ববোধ) ও বুদ্ধিকে ক্ষরপুরুষ বলা হয়। ক্ষর পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া ইহার পশ্চাতে অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা থাকেন।

পরমপুরুষ ঈশ্বর যেমন দ্রষ্টা, ভোক্তা নহেন, প্রত্যেক স্থূলদেহের সহিত যুক্ত অক্ষর পুরুষও সেইভাবে দ্রষ্টা, ভোক্তা নহেন। দেহ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি ভোক্তা।

দ্বা সুপর্ণা সযুক্তা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৬

দ্বা (দুইটি) সুপর্ণা (সুন্দর-পক্ষযুক্ত) সযুক্তা (পরস্পরের সহিত সর্বদা সংলগ্ন) (ও) সখায়া (বন্ধুত্বভাবাপন্ন) (পক্ষী) সমানং বৃক্ষং (একই বৃক্ষকে অর্থাৎ একই দেহকে) পরিষস্বজাতে (আশ্রয় করিয়া আছে। তয়োরন্যঃ (এই দুইটির মধ্যে একটি অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ) স্বাদু পিপ্পলং (মিষ্টফল) অত্তি (ভক্ষণ করে), অন্যঃ (অন্যটি অর্থাৎ জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ) অনশ্নন্ (আহার না করিয়া) অভিচাকশীতি (কেবল দর্শন করে)।

উপরের শ্লোকে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে ক্ষরপুরুষই ভোক্তা এবং অক্ষর (অর্থাৎ পরিবর্তনহীন) পুরুষ, যাঁহাকে আমরা জীবাত্মা বলি এবং যিনি সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সনাতন বা অবিনশ্বর অংশ, তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সর্বদা দ্রষ্টাভাবে থাকেন। এই জীবাত্মা সমস্ত মানুষের ভিতর সমানভাবে বর্তমান।

প্রকাশের তারতম্য অনুসারে মানুষের জীবাত্মা ও পশুর আত্মার ভিতর পার্থক্য থাকিতে পারে ও আছে। কিন্তু সমস্ত মানুষের জীবাত্মা একইভাবে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া সমস্ত মানুষকে সমানভাবে দেখা আমাদের ধর্ম্ম্য কর্তব্য।

কিন্তু বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন দেহ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, বিভিন্ন মন, বিভিন্ন অহঙ্কার বা আমিত্ববোধ এবং বিভিন্ন বুদ্ধি থাকায়, মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য হইয়া রহিয়াছে। এইগুলির সমাবেশকে গীঁতায় ক্ষরপুরুষ বলা হইয়াছে। ক্ষরপুরুষ তাহার ভালমন্দ কাজ অনুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে এবং ইহাকেই কর্মফল বলা হয়। প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে মানুষের কর্মফল ফলে।

ক্ষর পুরুষ ভাবেও মানুষে মানুষে যে সাম্য আছে, তাহার কথা চতুর্বর্ণের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সাম্যের কথাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

সমদর্শন প্রসঙ্গে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ভেদ নাই। সুতরাং সমস্ত মানুষকে নিজের অনুরূপ মনে করিয়া এবং তাহাদের সকলকে সমানভাবে দেখিয়া সকলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম্য কর্তব্য। মানুষের মান ও মান বোধ আছে, সুতরাং কাহাকেও অপমান করা অথবা অন্য কোনভাবে কাহাকেও অযথা কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নহে।

গীতার ৫।১৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের প্রতি যেমন সমদর্শী হইবার কথা বলা হইয়াছে, গরু হাতি ও কুকুরের প্রতি ও ঐভাবে সমদর্শী হইবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে পশুগণও ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের আত্মা লাভ করিয়াছে এবং তাহারাও সুখে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাহাদের এই ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করা আমাদের উচিত এবং তাহাদিগকেও অযথা কষ্ট দেওয়া আমাদের উচিত নহে। অহিংসা ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির সমাবেশকে ক্ষর (বা

পরিবর্তনশীল) পুরুষ বলা হয়। ইহাকে অক্ষর (বা পরিবর্তনহীন) পুরুষের (অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশস্বরূপ জীবাত্মার) উপাধি বা আধারও বলা যাইতে পারে। অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা পশ্চাতে থাকায় ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ দেহমন প্রভৃতি সচেতন ও সক্রিয় হয় কিন্তু সমস্ত মানুষের জীবাত্মা ঈশ্বরের অবিনশ্বর অংশরূপে একই প্রকারের হইলেও, পৃথক পৃথক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, আমিত্ববোধ ও বুদ্ধি থাকায় মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য হইয়া যায়।

বিভিন্ন উপাধিযোগে একই ঐশ্বরিক শক্তি কিভাবে বিভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে, তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির উদাহরণের দ্বারা সহজবোধ্য হইতে পারে। কোন স্থানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হইতেছে এবং বিভিন্ন তারের সাহায্যে দূরে বিভিন্ন বাল্‌বের ভিতর ইহা পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে।

বাল্‌বগুলি কিন্তু বিভিন্নপ্রকার আলোকশক্তিবিশিষ্ট এবং বিভিন্ন রং যুক্ত। তাহার ফলে দেখা যাইবে যে একই বৈদ্যুতিক শক্তি সর্বত্র প্রেরিত হইলেও, বিভিন্ন বাল্‌ব হইতে বিভিন্ন শক্তির ও বিভিন্ন রংএর আলোক বাহির হইতেছে। বাল্‌বগুলি একই বৈদ্যুতিক শক্তির উপাধি বা আধার কিন্তু এই উপাধিসমূহ বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায়, ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত একই বৈদ্যুতিক শক্তি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। এইভাবে সমস্ত মানুষের ভিতর একই প্রকার ঐশ্বরিক শক্তি থাকিলেও, তাহাদের বিভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি হওয়ায়, তাহাদের ভিতর অনেক পার্থক্য ঘটিয়া গিয়াছে। সাধনার দ্বারা মন ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া যে কোন মানুষ আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে এবং ইহলোকে ও পরলোকে স্থির ও নির্মল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। সমদর্শন অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে ও অন্যান্য জীবকে সমানভাবে দেখিবার চেষ্টা করা সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ গীতা ৫।৭

—যোগে প্রতিষ্ঠিত, বিশুদ্ধচিত্ত, মনোজয়ী ও ইন্দ্রিয়জয়ী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীর আত্মাকে নিজের আত্মার ন্যায় মনে করিয়া ও তদনুসারে কার্য করিয়া, সেই কার্যের দ্বারা (পৃথিবীতে) আবদ্ধ হন না।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা ৬।২৯

—সর্বজীবে সমদর্শী যোগযুক্ত ব্যক্তি নিজের আত্মা সর্বপ্রাণীর আত্মায় বর্তমান এবং সর্বপ্রাণীর আত্মা নিজের আত্মায় বর্তমান এইভাবে দেখেন।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়িপশ্যতি॥
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ গীতা ৬।৩০

—যিনি সর্বত্র (অর্থাৎ সকল প্রাণী ও অপ্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে) আমাকে (অথাৎ ঈশ্বরকে) দেখেন এবং আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) ভিতর সকল প্রাণী ও অপ্রাণীকে দেখেন, আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) তাঁহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) নিকট অদৃশ্য হন না। (অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত তাঁহার বিশেষ সংযোগ স্থাপিত হয়)।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ গীতা ৬।৩১

—সর্বপ্রাণীর ভিতর (বহু আত্মাভাবে) অবস্থিত ঈশ্বর (বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও) তিনি এক এই ধারণা লইয়া যে যোগী তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি ঈশ্বরে স্থিতিলাভ করেন।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥ গীতা ৬।৩২

—যে যোগী নিজের উপমা দ্বারা সকলের সুখদুঃখকে সমানভাবে দেখেন, তিনি পরম যোগী।

অর্থাৎ যোগী যেমন নিজের দুঃখকষ্টকে পরিহার করিতে চান, এইভাবে অন্য সকলেও নিজেদের দুঃখকষ্টকে পরিহার করিতে চায়।

সেই জন্য যোগী কাহারও দুঃখকষ্টের কারণ হন না। তিনি অন্যের সুখে সুখী হন।

সমং সর্বেষুভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ গীতা ১৩।২৭

—সমস্ত প্রাণী অপ্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বর্তমান এবং বিনাশশীল জাগতিক দ্রব্যসমূহের মধ্যেও অবিনশ্বরভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ গীতা ১২।৪

—যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া এবং সর্বত্র (অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে) সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সমস্ত প্রাণীর হিতকামী হন, তাঁহারা আমাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) লাভ করেন।

অতএব সমস্ত প্রাণীকে, বিশেষতঃ সমস্ত মানুষকে সমানভাবে দেখিয়া এবং নিজেদের কামনা, ক্রোধ, লোভ ও ইন্দ্রিয়সুখস্পৃহাকে সংযত করিয়া সমস্ত প্রাণীর, বিশেষতঃ সমস্ত মানুষের হিতৈষী হওয়া এবং যথাসম্ভব হিতসাধন করা ধর্মের অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

সকলকে কেবল সমানভাবে দেখিলে কর্তব্যের শেষ হইবে না। সমদর্শন অনুসারে সকলের মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু কাজও নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

(গ) প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা

গীতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে তাহার কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরকে চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ঈশ্বর নাই এইরূপ চিন্তা করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূল দ্বিবিধ রূপ আছে। আলোক প্রকৃতির একটি সূক্ষ্ম রূপ হইলেও ইহাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, কিন্তু বায়ু আলোক অপেক্ষা স্থূল হইলেও ইহাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না। সুগন্ধ পুষ্প, আতর, মৃত ও গলিত জীবদেহ হইতে যে সূক্ষ্ম

কণা বাহির হয়, চোখ তাহা দেখিতে পায় না, কিন্তু নাক তাহা ধরিতে পারে। যে বৈদ্যুতিক শক্তি আমাদের পাখা, ট্রাম, ট্রেন ও নানাপ্রকার যন্ত্র চালায়, তাহাকে আমরা চোখে দেখিতে পাই না, যখন ইহা আলোকের রূপ ধারণ করে তখনই আমরা ইহাকে দেখিতে পাই। যে শক্তিতরঙ্গ আমাদের রেডিওকে ঝঙ্কৃত করে, আমাদের কোন ইন্দ্রিয় তাহাকে ধরিতে পারে না, কিন্তু ইহা এমন ব্যাপক রূপ ধারণ করে যে চতুর্দিকে সহস্র সহস্র রেডিওকে ইহা একই সঙ্গে শব্দময় করিয়া তোলে। এই শক্তিতরঙ্গকে কেহ কোনরূপে বুঝিতে না পারিলেও, ইহা তাহার কাজের দ্বারা সুনিশ্চতভাবে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

মানুষ নিজের সৃষ্টি নিজে করে নাই। অন্ধও জড় প্রকৃতি বুদ্ধিমান মানুষের ও সুশৃঙ্খল বিশ্বের স্রষ্টা হইতে পারে না। বুদ্ধিযুক্ত ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারাই ইহা সম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের মন আছে। কিন্তু অন্যের মনকে দেখিতে পাওয়া দূরে থাক, আমরা আমাদের নিজেদের মনকেও নিজে দেখিতে পাই না। কিন্তু মনকে দেখিতে না পাওয়া গেলেও, মন দেহের সাহায্যে দিনের পর দিন শত শত প্রকার কার্য করিয়া চলিয়াছে। ঐশ্বরিক চিৎশক্তি মানুষের মন অপেক্ষাও অনেক বেশী সূক্ষ্ম এবং সেই জন্য ইহা অদৃশ্য। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া ইহা প্রাণী ও অপ্রাণী সকলের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐশী শক্তি প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতির প্রেরয়িতা রূপে কার্য করায়, প্রকৃতি মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রাণধারণ ও সুখভোগের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা উৎপন্ন করিতেছে। ঐশী শক্তির প্রেরণায় প্রকৃতি তাহার ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহ লইয়া নানাপ্রকার জীবদেহ সৃষ্টি করিয়াছে। বৃক্ষলতাদির ভিতর আমরা ঐশ্বরিক চিৎশক্তির ক্ষীণতর প্রকাশ দেখিতে পাই। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ-সমন্বিতাঃ" (বৃক্ষলতাদির) অনুভবশক্তি ও সুখদুঃখ বোধ আছে। কীটপতঙ্গাদির ভিতর ঐশ্বরিক চিৎশক্তির অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল

প্রকাশ এবং পশুপক্ষীর ভিতর ইহার উজ্জ্বলতর প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পৃথিবীতে কেবল মানুষের ভিতরই ঐশ্বরিক চিৎশক্তি উজ্জ্বলতম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মস্তিষ্ক, স্নায়ুপুঞ্জ ও হৃৎপিণ্ডাদি নানাযন্ত্রসমন্বিত মানুষ দেহের ও তাহার ভিতর অবস্থিত অদৃশ্য সচেতন মনের সৃষ্টি মানুষ নিজে করে নাই। জড় পদার্থ ও জড়শক্তিবিশিষ্ট অন্ধ ও অচেতন প্রকৃতি দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। কেবল ঐশ্বরিক চিৎশক্তির প্রেরণায় ও অধ্যক্ষতায় (অর্থাৎ পরিচালনায়) প্রকৃতি দ্বারা ইহা সম্ভব। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ৯।১০— আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) প্রেরণায় ও পরিচালনায় প্রকৃতি সমস্ত চরাচর (অর্থাৎ প্রাণী অপ্রাণীর) সৃষ্টি করে। সমস্ত মানুষের পরিবর্তনশীল মনসমূহের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের পরিবর্তনহীন জীবাত্মাসমূহ ঈশ্বরের বিনাশহীন অংশরূপ বর্তমান আছে এবং ঈশ্বর নিজে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তিরূপে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী অপ্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে বর্তমান আছেন। ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দও বলা হয়। সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বর সৎ অর্থাৎ চিরকাল আছেন ও থাকিবেন, তিনি চিৎ অর্থাৎ বিশ্বের মূল চেতনাশক্তি এবং তিনি আনন্দ অর্থাৎ তাঁহার চিৎশক্তির সহিত স্থির, নির্মল ও মৃদু আনন্দের ভাব সর্বদা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ছাত্রছাত্রীগণ প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় বা অন্যকোন সুবিধাজনক সময়ে কিছুক্ষণ (অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট) ঈশ্বর চিন্তা করিবে। তাহারা প্রথমে বৃক্ষলতাদির ভিতর ঐশ্বরিক চিৎশক্তির ক্ষীণতম প্রকাশের কথা চিন্তা করিতে পারে। তাহার পর তাহারা কীট-পতঙ্গাদির ভিতর ঐ চিৎশক্তির অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল প্রকাশের কথা এবং পশুপক্ষীর ভিতর ইহার উজ্জ্বলতর প্রকাশের কথা চিন্তা করিতে পারে। পরে তাহারা পৃথিবীর উপরিস্থিত অগণিত মানুষের অগণিত মনের ভিতর দিয়া ঐশ্বরিক চিৎশক্তির যে উজ্জ্বলতম প্রকাশ হইয়াছে এবং সমস্ত মনের পশ্চাতে ও তাহাদের

সহিত যুক্ত হইয়া যে পরিবর্তনহীন জীবাত্মাসমূহ ঈশ্বরের অবিনশ্বর অংশরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, তাহাদের কথা চিন্তা করিবে। অবশেষে তাহারা অসীম আকাশ ও বিশ্বের কথা চিন্তা করিয়া যে সূক্ষ্ম চিৎশক্তি সমস্ত প্রাণী অপ্রাণী এবং সূর্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ও ঈশ্বরভাবে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাঁহার কথা চিন্তা করিবে। মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দুরীভূত করিয়া তাহারা প্রথমে মনকে আত্মসংস্থ (অর্থাৎ নিজ আত্মায় স্থিত) করিবে এবং পরে ইহাকে বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরে সমাহিত (অর্থাৎ স্থাপিত ও যুক্ত) করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে।

অনেকের মন সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। উপরে যে ভাবে প্রাত্যহিক ঈশ্বর চিন্তা করিবার কথা বলা হইল, তাহার দ্বারা বিদ্যাশ্রমিগণ ক্রমশঃ তাহাদের মনকে একাগ্র করিতে পারিবে এবং এই একাগ্র মন তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথে এবং জীবনের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হইবে। ভক্তির সহিত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের কথা চিন্তা করিয়া তাহারা ক্রমশঃ মনে নির্মল আনন্দও লাভ করিতে পারিবে।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে উপনিষদের ঋষি নিম্নলিখিতভাবে পরম-দেবতা ঈশ্বরকে তাঁহার নমস্কার জানাইয়াছিলেন। ছাত্রছাত্রীগণও ঐভাবে তাঁহাকে তাহাদের নমস্কার জানাইতে পারে।

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১৭

—যে (পরম) দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, এবং যিনি সমগ্র বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, যিনি ধান গম প্রভৃতি ছোট গাছ ও বিভিন্ন বড় গাছের ভিতর বিরাজমান, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করি।

(ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান :—

নিষ্কাম কর্মশিক্ষা গীতার অন্যতম প্রধান শিক্ষা। কিন্তু বিদ্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা সব সময়

সম্ভব না হইলেও, অন্ততঃ আংশিকভাবে ইহা করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব।

বেদের কর্মকাণ্ড সকাম যজ্ঞ প্রভৃতির সমর্থক। কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ড অনুসারে গীতা সকলকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিবার কথা বলে। জাগতিক দ্রব্য প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন প্রকার সকাম কর্ম মুক্তির পথে অন্তরায়। সেইজন্য বাল্যকাল হইতে বিভিন্নভাবে নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা করা ও কিছু কিছু নিষ্কাম কর্ম করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ফললাভের জন্য প্রবল কামনাকে মন হইতে দূরীভূত করিতে হইবে।

গীতায় বলা হইয়াছে—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—গীতা ২।৪৭

—তোমার কর্ম করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ইহার ফলে কখনও তোমার অধিকার নাই (কারণ ফল সব সময় তোমার আয়ত্তের মধ্যে নহে)—গীতা—২।৪৭

প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য থাকে ও থাকিতে পারে ; কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসারে ফল লাভের জন্য যদি প্রবল কামনা মনোমধ্যে থাকে এবং ঐ প্রবল কামনা অনুসারে ফললাভ না হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আশাভঙ্গজনিত গভীর দুঃখ মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় এবং যথাযথ উপায় অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া পুনরায় চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। যদি কোন বিদ্যাশ্রমী কোন পরীক্ষায় অথবা অন্য কোন কার্যে অকৃতকার্য হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে পুনরায় যথাযথ উপায় অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হওয়াই উচিত ; অযথা দুঃখে অভিভূত হইলে, কোন লাভ হয় না। যদি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তাহার সুচিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার প্রাণরক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে ধৈর্যের সহিত এই দুর্ঘটনাকে গ্রহণ করিয়া

লওয়াই ভাল। কেহ শোকে অভিভূত হইলে, তাহার দ্বারা কাহারও কোন লাভ হয় না।

সেই জন্য গীতায় সর্বপ্রকার কর্তব্য কার্য ভালভাবে করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু 'সঙ্গং ত্যক্ত্বা' (ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া) এবং 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা' (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান মনোভাব লইয়া) ইহা করিতে হইবে (গীতা ২।৪৮)। প্রবল কামনাকেই কাম বলা হয়, সুতরাং কোন কাজ করিবার সময় তাহার ফল লাভ করিবার জন্য প্রবল কামনা মনোমধ্যে না থাকিলে, সেই কাজ আংশিকভাবে নিষ্কাম হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কাজ করিতে হইবে। যদি কোন কাজ কোন ব্যক্তির পক্ষে লাভজনক বা হিতকর হয়, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর হয়, তাহা হইলে সেই কাজ যে করণীয় নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য সমস্ত মানুষের আত্মা কোন লোকের নিজের আত্মারই অনুরূপ। সে যেমন নিজের অনিষ্ট চায় না, অন্য কোন লোকও সেইভাবে তাহার নিজের অনিষ্ট চায় না। সেইজন্য কোন কাজ করিবার সময় অন্যান্য লোকের পক্ষে যাহাতে ইহা অনিষ্টকর না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা করিতে হয়।

যখন কোন লোক নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন কাজ না করিয়া, অন্যের বা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সেই কাজ করে, তখন সাধারণতঃ সেই কাজকে আমরা নিষ্কাম কর্ম বলি; কারণ ইহাতে তাহার নিজের জন্য কোন ফল কামনা নাই। এইপ্রকার নিষ্কাম কর্মী যে সমাজে যত বেশী, সেই সমাজ তত উন্নত। নিষ্কাম কর্ম মানুষের হৃদয়কে বিশুদ্ধ, উন্নত ও বিশাল করিয়া তোলে। সেইজন্য কেবল নিজের ও নিজের নিকট আত্মীয়স্বজনের কথা চিন্তা না করিয়া, সমাজের অন্যান্য লোকের মঙ্গলের কথাও চিন্তা করা এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু কিছু ত্যাগ বা দান করা কর্তব্য। কেবল

অর্থদানই দান নহে। সময়, শক্তি ও শ্রমদানও দান। বিত্তাশ্রমিগণ এই প্রকার দান নিশ্চয়ই করিতে পারে।

বিত্তাশ্রমিগণ স্থানীয় পথনির্মাণ ও সংস্কারে এবং ইহাকে কর্দমাদি-মুক্ত করিয়া রাখিবার কার্যে, শিক্ষাবিস্তারের কার্যে, দরিদ্রের গৃহ-নির্মাণে, রোগীর সেবাশুশ্রূষার কার্যে, চতুর্দিকে পরিচ্ছন্নতা বিধানে, সঙ্গীত ও শিক্ষামূলক নাটকাদির সাহায্যে জনসাধারণের যুগপৎ চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতি কার্যে সহায়তা করিতে পারে।

হিতকর কার্যের দ্বারা অন্যান্য লোককে সুখী করিতে পারিলে, উচ্চতর নির্মল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে গীতার অন্য একটি শিক্ষাও মনে রাখিতে হইবে—বিভিন্ন প্রকার ভাল ও প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্ত্তাহমমিতি মন্যতে ॥—গীতা ৩।২৭

—প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা সর্বপ্রকার কার্য কৃত হয়; অহঙ্কারের দ্বারা যাহার মন মোহগ্রস্ত হইয়াছে, সেই কেবল "আমি কর্তা" এইরূপ মনে করে।—গীতা ৩।২৭

—প্রকৃতপক্ষে আমি নামে কিছুই নাই। প্রাকৃতিক শক্তির একটি অতিক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশের ভিতর দিয়া ঐশ্বরিক শক্তির একটা অতি ক্ষীণ অংশ প্রকাশমান হইলে, সে তখন নিজেকে আমি বলে। সুতরাং মানুষ যে কাজ করিয়াছে বা করিতেছে মনে করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রাকৃতিক শক্তিরই কাজ, সুতরাং তাহার ইহাতে অহঙ্কার বা গর্বের কিছুই নাই।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥—গীতা ৯।২৭

—হে অর্জুন, তুমি যাহা করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যাহা দ্বারা

হোম করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপস্যা করিবে তাহা আমাতে (অর্থাৎ ঈশ্বরে) অর্পণ করিও।—গীতা ৯।২৭

ঐ সমস্ত কাজ ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা কৃত হয়, সুতরাং ইহাতে কোন মানুষের অহঙ্কারের কিছুই নাই। অতএব নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য আমরা যাহা কিছু করিনা কেন, কাজটি শেষ হইবার পর তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করা আমাদের কর্তব্য।

(ঙ) দৈবীসম্পদলাভের চেষ্টা :—

বিদ্যাশ্রমত্যাগের পর বিদ্যাশ্রমিগণকে পার্থিব সম্পদলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে ; কারণ স্থূল দেহ লইয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, পার্থিব সম্পদ অত্যাবশ্যক কিন্তু পার্থিব সম্পদ সীমাবদ্ধ জিনিস। ইহার জন্য জাতিতে জাতিতে ও মানুষে মানুষে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। যাঁহারা দেবভাবাপন্ন মানুষ ও সমদর্শী, তাঁহারা সকলকে লোভ ও স্বার্থপরতা পরিহার করিতে বলেন, এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে যাহাতে পার্থিব সম্পদের কতকটা সুবণ্টন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন।

দৈবীসম্পদ কিন্তু কোন সীমাবদ্ধ জিনিস নহে। যত অধিক মানুষ পৃথিবীতে যত অধিক দৈবীসম্পদ লাভ করিতে পারিবে পৃথিবী ততই সুন্দর ও সুখকর হইয়া উঠিবে। মৃত্যুর পর কেহ পার্থিব সম্পদ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না ; দৈবী সম্পদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং পরলোকে তাহাকে সুখশান্তির অধিকারী করিবে। "দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়" (গীতা ১৬।৫)—দৈবী সম্পদ মুক্তি-লাভের পথে সাহায্য করে।—(গীতা ১৬।৫)।

নিম্নলিখিত ২৬টি গুণকে গীতায় দৈবী সম্পদ বলা হইয়াছে।

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥—গীতা ১৬।১-৩

—হে অর্জুন, যাহারা দৈবীসম্পদলাভের যোগ্যতা লইয়া জন্মে, তাহাদের মধ্যে এই গুণগুলি প্রকাশ পায়—(১) ভয়হীনতা, (২) মনের শুদ্ধভাব, (৩) জ্ঞানে ও ঈশ্বর ধারণায় স্থিতি, (৪) দান, (৫) ইন্দ্রিয়দমন, (৬) যজ্ঞ, (৭) বেদ পাঠ, (৮) তপস্যা, (৯) সরলতা, (১০) অহিংসা, (১১) সত্য, (১২) অক্রোধ, (১৩) ত্যাগ, (১৪) শান্তি, (১৫) কাহারও অসাক্ষাতে তাহার দোষ কথনে বিমুখতা, (১৬) প্রাণি-গণের প্রতি দয়া, (১৭) লোভশূন্যতা (১৮) মৃদুতা, (১৯) অসৎ কার্য-করণে লজ্জা, (২০) অচাঞ্চল্য, (১১) তেজ, (২২) ক্ষমা, (২৩) ধৈর্য, (২৪) শুচিতা, (২৫) শত্রুতার অভাব, (২৬) নিজেকে অতি মাননীয় মনে না করা।

(১) অভয় :—যে কোনরূপ অন্যায় কার্য করে না, সে পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করে না। সুতরাং অন্যায় না করিয়া কর্তব্যপালন করিলে নির্ভীক হওয়া যায়।

(২) সত্ত্বসংশুদ্ধি :—কোন প্রকার অসৎ কার্য বা চিন্তা না করিলে, মনের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়।

(৩) জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি :—জ্ঞানে ও ঈশ্বর ধারণায় মনের অবস্থিতি।

(৪) দান :—অর্থদান ও দ্রব্যদান ব্যতীত সময়, শক্তি ও শ্রম-দানও দান, জ্ঞানদানও দান। সৎকার্যে প্রেরণাদানকেও দান বলা যাইতে পারে।

(৫) দম :—বহিরিন্দ্রিয়সমূহের দমন বা সংযম।

(৬) যজ্ঞ :—গীতায় বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে এবং ৪।৩৩এ বলা হইয়াছে "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ"—দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। ১৮।৭০এ বলা হইয়াছে যে গীতাপাঠ করিলেও জ্ঞানযজ্ঞ করা হয়। মাতৃভাষায় গীতার অনুবাদ পাঠ করিলেও গীতা পাঠ করা হইবে। উপরে যে প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও জ্ঞানযজ্ঞ।

(৭) স্বাধ্যায় :—বেদপাঠ। বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে উপনিষৎ বলা

হয়। ১২খানি প্রামাণ্য উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ অপেক্ষাকৃত বড়। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকী—এই দশখানি উপনিষদ অপেক্ষাকৃত ছোট। বঙ্গানুবাদ সহ এইগুলি এক বা দুই খণ্ডে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলেও উপনিষদ পাঠ হইবে। গীতায় উপনিষদ্‌সমূহের ভাবধারা গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতাপাঠ করিলেও উপনিষদ পাঠের কাজ হয়। স্বাধ্যায়ের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত মনের যোগস্থাপন। সেইজন্য গীতাপাঠও স্বাধ্যায়।

(৮) তপ :—কঠোর সংযমের সহিত ঈশ্বরারাধনা।

(৯) আর্জব :—সরলতা ; কুটিলতার অভাব।

(১০) অহিংসা :—কোন প্রাণীকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট না দেওয়া এবং অন্যের অনিষ্ট চিন্তা হইতেও বিরত থাকা।

(১১) সত্য :—প্রকৃত ঘটনা স্বীকার ও গ্রহণ করা ও তদনুসারে কথা বলা।

(১২) অক্রোধ :—ক্রোধের কারণ ঘটিলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া।

(১৩) ত্যাগ :—স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়সুখভোগেচ্ছা প্রভৃতি যতদূর সম্ভব ছাড়িয়া দেওয়া।

(১৪) শান্তি :—মানসিক ক্লেশের উপশম।

(১৫) অপৈশুন :—কাহারও অসাক্ষাতে তাহার দোষ কথনে অনিচ্ছা।

(১৬) ভূতেষুদয়া :—প্রাণিগণের প্রতি সদয়ভাব।

(১৭) অলোলুপ্‌ত্বং :—লোভহীনতা, অল্পে সন্তুষ্টি।

(১৮) মার্দব :—মৃদুতা, কঠোরভাব ও রূঢ় ভাষা ত্যাগ।

(১৯) হ্রী :—অসৎ কার্য করিতে লজ্জাবোধ।

(২০) অচাপল :—অচাঞ্চল্য, স্থির ভাব।

(২১) তেজ :—মানসিক শক্তি ও সাহসের প্রকাশ।

(২২) ক্ষমা :—অনিষ্টকারীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন।

(২৩) ধৃতি :—ধৈর্য, যথাসময়ে কার্যের জন্য অপেক্ষা।

(২৩) শৌচ :—দেহবস্ত্র বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা—বাহ্য শৌচ।
এবং মনের পবিত্রতা— অন্তঃশৌচ।

(২৫) অদ্রোহ :—কাহারও প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ না করা।

(২৬) নাতিমানিতা :—নিজেকে অতি মাননীয় মনে না করা।

বিদ্যাশ্রমিগণকে উল্লিখিত গুণগুলি অর্জনের জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে।

দৈবীসম্পদের বিপরীত কতকগুলি আসুরিক দোষও আছে। এইগুলি যাহাতে না আসে, তাহার জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। গীতায় বলা হইয়াছে :—

"আসুরিক ভাবাপন্ন লোকসমূহের মধ্যে দম্ভ, দর্প, অভিমান ক্রোধ, ব্যবহারে ও কথায় রূঢ়ভাব, কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে শৌচবোধ, আচারবোধ, ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তাহারা জগৎকে মিথ্যা ও প্রতিষ্ঠাহীন এবং জগতে ঈশ্বর নাই এই প্রকার মনে করে। তাহারা অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্মা হইয়া জগতের অনিষ্ট সাধনই করে। দুষ্পূরণীয় কামনাসমূহকে আশ্রয় করিয়া, দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া এবং অসৎ সংকল্পসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কামনা-সমূহের পরিতৃপ্তিকে পরম পুরুষার্থ মনে করিয়া শত শত আশার জালে আবদ্ধ হইয়া, কামক্রোধপরায়ণ হইয়া, বিষয়াদিভোগের জন্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। "আজ আমি ইহা লাভ করিয়াছি, আমার বাঞ্ছিত অন্য এই দ্রব্য পাইব, আমার ইহা আছে, পুনরায় এই ধনও আমার হইবে, আমি এই শত্রুকে বিনষ্ট করিয়াছি, অন্য সকল শত্রুকেও বিনষ্ট করিব, আমি সকলের শাসনকর্তা, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী, আমি ধনবান ও কুলীন, আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব ও আনন্দ করিব" এইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা বিমোহিত হইয়া নানাপ্রকার কামনার দ্বারা বিভ্রান্ত এবং নানা-প্রকার বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া তাহারা অশুচি নরকে পতিত

হয় (অর্থাৎ পরে নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করে)। নিজেই পূজ্য বলিয়া অভিমানকারী, অবিনীত, ধনজনিত মানের গর্বযুক্ত হইয়া তাহারা কখন কখন অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করে। অহঙ্কার, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া নিজের ও অন্যের দেহে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষভাব লইয়া তাহারা সজ্জনদিগের নিন্দা করে। অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের গৃহে এই ক্রূর ও অমঙ্গলকারী নরাধমগণের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। ঐশ্বরিকভাব লাঁভের জন্য চেষ্টা না করায় তাহাদের ক্রমশঃ আরও অধোগতি হয়।"

—গীতা ১৩।৪-২০ (ভাবানুবাদ)

দৈবীসম্পদ লাভের জন্য প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীকে যেমন কঠোর চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে উল্লিখিত প্রকার কোনরূপ আসুরিক ভাব তাহার মধ্যে না আসে তাহার জন্যও তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

"দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।"—গীতা ১৬।৫

দৈবীসম্পদ মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হইতে মানুষকে সাহায্য করে কিন্তু আসুরিক ভাবগুলি তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

—গীতা ১৬।৫

আসুরিক ভাবগুলি ক্রমশঃ মানুষের অধোগতি ঘটায় এবং ইহলোকে ও পরলোকে তাহার ও অন্যের দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কারণ হয়। সেইজন্য এইগুলি বর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

উপরে যে (ক) আত্মসংযম, (খ) সমদর্শন, (গ) প্রাত্যহিক ঈশ্বর-চিন্তা, (ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান, এবং (ঙ) দৈবীসম্পদ লাভের চেষ্টার কথা বলা হইল, ইহা প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সমানভাবে মনে রাখিতে হইবে। ইহাকে প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীর পক্ষে অত্যাবশ্যক **পঞ্চাঙ্গ সাধনা** বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

গার্হস্থ্যাশ্রমে গীতার শিক্ষা

কর্মযোগ

১। অপরাবিদ্যার (বা জাগতিক বিদ্যার) প্রয়োগ।

বিদ্যাশ্রমে জাগতিক বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা উভয় প্রকার বিদ্যাশিক্ষা সমানভাবে আবশ্যক ইহা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই পৃথিবী বিরাট কর্মক্ষেত্র। বিদ্যাশ্রমে নানাপ্রকার জাগতিক বিদ্যাশিক্ষার পর বিদ্যাশ্রমিগণকে পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং বিভিন্ন প্রকার কার্যের দ্বারা জীবিকা অর্জনের ও সমাজ রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে।

পশুপক্ষী প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকার কাজ করে। (১) তাহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করে, (২) তাহারা নিদ্রা যায়, (৩) পৃথিবীতে আপনার ন্যায় প্রাণী রাখিয়া যাইবার জন্য তাহারা প্রাকৃতিক প্রেরণায় সন্তানোৎপাদন করে, (৪) তাহারা নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে।

মানুষও উল্লিখিত চারিপ্রকারের কার্য করে কিন্তু বুদ্ধিমান জীব হিসাবে মানুষকে আরও শত শত প্রকার কার্য করিতে হয়। জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টা তাহার একটি বিরাট প্রচেষ্টা। শুধু পৃথিবীকে নহে, সমগ্র বিশ্বকে সে তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চায়; ইহার দ্বারা তাহার যে কেবল কৌতূহলের আংশিক নিবৃত্তি হয় তাহা নহে, ইহার দ্বারা সে গভীর আনন্দও লাভ করে। ইহা হইতেই ভারতে দর্শনের ও পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির সমাবেশে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পূর্ণতা লাভ করে।

বিদ্যাশ্রমে কখনও কাহারও বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হয় না। এখানে কেবল শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করা হয়। পরে ক্রমশঃ নানাপ্রকার

পুস্তক পাঠ করিয়া ও বিভিন্নভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জ্ঞানের গভীরতা ও পরিধি বাড়াইতে হয়। গার্হস্থাশ্রমেই ইহা করিতে হয়।

এত বিভিন্নভাবে মানুষকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করিতে হয় যে বিদ্যাশ্রমে সমস্ত শিখিয়া আসা সম্ভব হয় না। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে আসিয়া যে কার্যের দ্বারা সে জীবিকা অর্জন করিবে, সেই সম্বন্ধে আরও জ্ঞান ও দক্ষতালাভ তাহার পক্ষে আবশ্যক হয়।

গীতায় জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ এই দুই প্রকার যোগের কথা প্রধানতঃ বলা হইয়াছে।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

—গীতা ৩।৩

—সাংখ্যমতাবলম্বিগণ জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং যোগিগণ কর্মযোগের দ্বারা অগ্রসর হন—এই সংসারে দুই প্রকার নিষ্ঠার (অর্থাৎ মুক্তির পথে স্থিতির) কথা আমা কর্তৃক পূর্বে উক্ত হইয়াছে। —গীতা ৩।৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥—গীতা ৩।৪

—পুরুষ কর্ম না করিলেই যে কর্মরহিতাবস্থা লাভ হয়, তাহা নহে, কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না।—গীতা ৩।৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ —গীতা ৩।৫

—কেহ কখনও একমুহূর্তও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত গুণসমূহ দ্বারা চালিত হইয়া সকলে অবশভাবে কর্ম করে।—গীতা ৩।৫

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥—গীতা ৩।৬

—কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের কথা চিন্তা করিতে থাকে, সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিকে কপটাচারী বলা হয়।—গীতা ৩।৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ সবিশিষ্যতে ॥—গীতা ৩।৭

—যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া অনাসক্তভাবে কর্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কর্মযোগ আরম্ভ করেন, তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।—গীতা ৩।৭

নিয়তং কুরু কর্মত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্মণঃ ॥—গীতা ৩।৮

—নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ নিজের ও সমাজের পক্ষে হিতকর) কর্ম তুমি কর। কর্মত্যাগ করিলে শরীররক্ষাও হইবে না।
—গীতা ৩।৮

অতএব বিদ্যাশ্রমের পর কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করা সাধারণতঃ উচিত নহে। জাগতিক কোন দ্রব্য প্রভৃতিতে অত্যধিক আসক্ত না হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া নিজের ও অপরের পক্ষে হিতকর কার্য করাই সকলের কর্তব্য। ঈশ্বরে মনকে স্থাপিত ও যুক্ত করিয়া এইভাবে কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলা হয়। গার্হস্থাশ্রমে কর্মযোগই যথোচিত পন্থা, তৃতীয় আশ্রমে অর্থাৎ সাধনাশ্রমে ক্রমশঃ কর্মত্যাগের অবস্থা আসিবে এবং তখন জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগ যতদূর সম্ভব ভালভাবে অবলম্বনীয় হইবে।

বিদ্যাশ্রমে যে পরাবিদ্যাশিক্ষার কথা এই পুস্তকে বলা হইয়াছে, তাহারই ভিতর কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের প্রাথমিক অবস্থা রহিয়াছে। গার্হস্থাশ্রমে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এই দুই প্রকার যোগশিক্ষার পরীক্ষা ও ক্রমাগত দৃঢ়তাসাধনের কার্য চলিতে থাকিবে।

একই শ্রেণীর পশু বা পক্ষীর ভিতর স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন মানুষের ভিতর স্বভাবের অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত মানুষের চেহারা অনেকটা একই প্রকারের হইলেও, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন স্বভাবের ভিতর বহু ব্যবধান থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবজাত গুণ ও দোষ দেখিয়া তাহার বর্ণ বা শ্রেণী নির্ণয় করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥—গীতা ১৮।৪১

—হে অর্জুন, স্বভাবজাত গুণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মসকল বিভাগ প্রাপ্ত হয়।—গীতা ১৮।৪১

ভারতের হিন্দুসমাজে আমরা যে জাতিভেদ প্রথা দেখিতে পাই, তাহা গুণকর্মানুসারে বর্ণভেদরূপে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে কিছু কিছু কারণে তাহা বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া জন্মগত ও বংশানুক্রমিক জাতিভেদে পরিণত হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ক্রমশঃ যুক্তিবাদী হইতেছে এবং অন্ধবিশ্বাসও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। জাতিভেদের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি না থাকায় যুক্তিবাদী হিন্দুগণের নিকট জাতিভেদ প্রথা আর গ্রহণীয় হইতেছে না এবং ভবিষ্যতে ইহার বিলুপ্তি অসম্ভব নহে।

কিন্তু স্বভাবজাত গুণকর্মানুসারে বর্ণভেদ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা হিন্দুধর্মের অঙ্গরূপে বর্তমান থাকিবে। কেবল ইহার রূপের কিছু পরিবর্তন হওয়াই সম্ভব; কে কোন বর্ণের লোক, তাহা কিছু লোক সাধারণভাবে জানিলেও, সমস্ত লোকের উপর বর্ণের ছাপ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না।

গুণকর্মানুসারে বর্ণভেদ প্রতি দেশে আছে বলা যাইতে পারে। প্রতি দেশে ধর্ম ও সুনীতির বা কেবল সুনীতির সমর্থক একশ্রেণীর লোক আছে। তাহারা নিজেরা ধার্মিক ও সুনীতিপরায়ণ বা কেবল সুনীতিপরায়ণ এবং তাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য দেশের সকলকে সুপথে রাখিবার চেষ্টা করে। তাহারা ঐ দেশের ব্রাহ্মণবর্ণের বা শ্রেণীর লোক।

দুষ্ট প্রকৃতির লোকসমূহকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য এবং বহিঃশত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য একশ্রেণীর শক্তিমান, সাহসী এবং কর্মতৎপর লোকও প্রতি দেশে আছে। তাহারা পুলিশ বিভাগে ও সামরিক বিভাগে কার্য করে। তাহারা ঐ দেশের ক্ষত্রিয়বর্ণের বা শ্রেণীর লোক।

কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকও প্রতি দেশে আছে। কৃষকগণ বিভিন্ন প্রকার শস্যফলাদি উৎপন্ন করিয়া সমগ্র জাতির জীবন রক্ষা করে। তাহারা গোপালন প্রভৃতি কার্যও করে। শ্রমিকগণ শতশত প্রকার কার্যের দ্বারা নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদন, গৃহনির্মাণ, পথনির্মাণ যানবাহনাদি নির্মাণ প্রভৃতি করিয়া সমস্ত জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে। ব্যবসায়িগণ কৃষিজাত ও শ্রমজাত দ্রব্যাদি যাহাতে বিভিন্ন স্থানের লোকে পায়, তাহার ব্যবস্থা করে। কৃষক, শ্রমিক ও বণিকশ্রেণীর সমস্ত লোক বৈশ্যবর্ণের লোক।

যাহারা অপেক্ষাকৃত অলস ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের লোকের কার্য করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে শূদ্রবর্ণের লোক বলা যাইতে পারে। তাহারা ঐ তিনবর্ণের লোকের সহিত সহযোগিতা করিয়া ও প্রয়োজনীয় কার্য করিয়া জীবিকার্জন করিতে পারে।

অতএব "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমা কর্তৃক (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা) চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে (গীতা ৪।১৩) এই কথার যৌক্তিকতা ও যাথার্থ্য আছে।

মানুষের ভিতর নানাপ্রকার গুণ ও নানাপ্রকার দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি গুণ ও দোষের উল্লেখ করা হইল।

গুণ	দোষ	গুণ	দোষ
সৎ	অসৎ	মিতভাষী	বাচাল
পরিশ্রমী	অলস	নির্লোভ	লোভী
বুদ্ধিমান	অল্পবুদ্ধি	স্বার্থত্যাগী	স্বার্থপর
কর্মদক্ষ	দক্ষতাহীন	দানশীল	কৃপণ
অধ্যবসায়ী	অধ্যবসায়হীন	নিরহংকার	
স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন	বিস্মরণশীল	ক্ষমাশীল	প্রতিহিংসাপরায়ণ
শক্তিমান	দুর্বল	সংযমী	অসংযমী
সাহসী	ভীরু	ক্রোধহীন	ক্রোধী

গুণ	দোষ	গুণ	দোষ
কর্মতৎপর	কর্মবিমুখ	দ্বেষহীন	বিদ্বেষী
বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন	বিচারবুদ্ধিহীন	ঈর্ষ্যাহীন	ঈর্ষ্যাপরায়ণ
পরিচ্ছন্ন	অপরিচ্ছন্ন	উপকারী	অনিষ্টকারী
শান্ত	উগ্র	দয়ালু	নির্দয়
সরল	কুটিল	সত্যবাদী	মিথ্যাবাদী

মানুষের দোষগুণের বিচার অপরিহার্য। কোন কাজের জন্য কোন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে, আমরা তাহার দোষগুণের বিচার করি। আমরা সাধারণতঃ সৎ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ লোককেই কাজে নিযুক্ত করিতে চাই। বিদ্বেষী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও অনিষ্টকারী লোক হইতে আমরা সাধারণতঃ সাবধানে থাকিবার চেষ্টা করি। অন্য লোকের নিকট হইতে না জানিয়া আমরা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী লোকের কথা বিশ্বাস করি না। সংযমী, নির্লোভ ও স্বার্থত্যাগী লোককে আমরা শ্রদ্ধা করি ও বিশ্বাস করি। এইভাবে বিভিন্ন লোকের স্বভাবজাত গুণ ও দোষ দেখিয়া আমরা তাহাদের সহিত বিভিন্নভাবে ব্যবহার করি।

কোন লোককে পাচক নিযুক্ত করিতে হইলে সে রন্ধনকার্যে পটু কিনা, সে পরিছন্ন কিনা, সে সংক্রামক রোগযুক্ত কিনা, সে নির্লোভ কিনা তাহা আমরা জানিতে চাই।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে, ঐ প্রকার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিবার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা তাহার আছে কিনা, তাহাই সাধারণতঃ দেখা হয়। কিন্তু স্বভাবজাত দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিছু জানা হয় না বা জানা যায় না। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে ইহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন শিক্ষক পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণ ও যত্নশীল না হইলে, তাহার দ্বারা শিক্ষাদান কার্য যে ভালভাবে হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। কোন শিক্ষক ভদ্র আচরণ যুক্ত না হইয়া ক্রোধী ও

অভদ্র হইলে, তাহাকে ভাল শিক্ষক বলা যায় না। কোন শিক্ষক স্বার্থপর, বা মিথ্যাবাদী বা অনিষ্টকারী হইলে সে কাহারও শ্রদ্ধার্হ হয় না। যে শিক্ষক নিজে সংযমী নহে বা নিষ্কাম কর্ম কখনও করে নাই বা যাহার নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্তি নাই, তাহার দ্বারা সংযম শিক্ষা দেওয়ার কাজ বা নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা দেওয়ার কাজ ভালভাবে হওয়া সম্ভব নহে। অথচ বিদ্যাশ্রমিগণের চরিত্র গঠনের জন্য এই দুইটি বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক। সততা সম্বন্ধে দৃঢ়তা বা অর্থলোভ সংবরণ করিবার শক্তি যদি কোন শিক্ষকের না থাকে, বিদ্যালয়ের অর্থব্যবস্থা তাহার হাতে থাকিলে, বিদ্যালয়ের কিছু অর্থ আত্মসাৎ করা বা করিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। এই প্রকার শিক্ষক বিদ্যালয়ের কলঙ্কস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা চতুর্দিকে যে দুর্নীতি দেখিতে পাই, বিদ্যালয়সমূহে নানা-প্রকার জাগতিক বিদ্যায় শিক্ষাদান ব্যতীত সুনীতিপরায়ণ শিক্ষক-গণের সাহায্যে সুনীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া সুনীতিপরায়ণ বিদ্যাশ্রমীর দল গড়িয়া তুলিতে পারিলে, ক্রমশঃ ঐ দুর্নীতির হ্রাস হইতে পারে।

(১) গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্মশিক্ষক ব্রাহ্মণের কার্য ঃ—

কি প্রকার স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম হইলে কোন লোককে ব্রাহ্মণ-বর্ণের লোক বলা যাইতে পারে, তাহা গীতায় পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে এবং এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।

শান্ত, শুদ্ধ ও সংযত স্বভাবের লোক না হইলে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, তাহাকে ভোগবিলাসত্যাগী, ক্ষমাশীল ও সরল হইতে হয় এবং ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়া তদনুসারে জীবন যাপনের চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রকার লোকই যে ধর্ম শিক্ষক হইবার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয়সমূহে যে শিক্ষাদান করা হয়, তাহার উন্নতিসাধন করিতে হইলে, শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-

বর্ণের লোকের যতদূর সম্ভব সংখ্যাধিক্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের যথার্থ মঙ্গলসাধনের জন্য গীতায় যে উদার উচ্চশিক্ষাসমূহ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে শিরোধার্য করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণের শিক্ষকগণ যদি সমবেতভাবে বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যার্থিগণের মধ্যে ঐ শিক্ষাবিস্তারের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ক্রমশ জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে।

সমাজের মধ্যে বা জনসাধারণের মধ্যে গীতার উপযোগী শিক্ষাসমূহ প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণের লোকেরা সকলকে ধর্মপথে আনিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ধর্ম প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য দিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত সহজে করা যাইতে পারে।

সরকারের শিক্ষাবিভাগে বা অন্য কোন কোন বিভাগে বা যেখানেই সৎলোক আবশ্যক হইবে, সেখানে ব্রাহ্মণবর্ণের লোকেরা কাজ করিতে পারেন।

প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যের কার্যও করিতে পারেন।

জাগতিক বিভিন্ন বিদ্যার সাহায্যে জীবিকার্জন ব্যতীত ব্রাহ্মণবর্ণের লোকসমূহকে বিদ্যালয়সমূহে ও সমাজে ধর্মশিক্ষকের কার্য করিতে হইবে। গীতায় হিন্দুধর্মের যে উচ্চতর রূপ দেখান হইয়াছে, তাহাকে আমরা বৈদান্তিক ধর্ম বলিতে পারি। এই ধর্ম অনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করিলে অনেকের চরিত্রের ভিতর আমূল পরিবর্তন আসিবে এবং হিন্দুধর্মের যে একটি অত্যুজ্জ্বল রূপ আছে তাহা বিকশিত হইয়া উঠিবে। হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণবর্ণের লোকসমূহকে মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্মের এই উজ্জ্বল রূপটিকে পরিস্ফুট করা এবং তাহার দ্বারা মানুষের দুঃখকষ্টের অন্ততঃ কতকটা হ্রাসসাধনের চেষ্টা করা তাহাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

(২) গার্হস্থ্যাশ্রমে দুষ্টশাসক ক্ষত্রিয়ের কার্য :—

কি প্রকার স্বভাবজাত গুণ ও কর্ম হইলে, কোন লোককে ক্ষত্রিয়বর্ণের লোক বলা যাইতে পারে, তাহাও গীতায় পরিষ্কারভাবে

বলা হইয়াছে এবং এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবর্ণের লোকসমূহ সমবেতভাবে সকলকে সুপথে রাখিবার চেষ্টা করিলেও. কিছু লোক কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বিপথগামী হয়। যাহারা ক্ষত্রিয়বর্ণের লোক, তাহাদের দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও সাহস, নির্ভীক ভাব এবং কর্মপটুতা থাকায়, তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকজনকে আয়ত্তে আনিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। অভাবগ্রস্ত হইয়া লোকে কখন কখন কুকার্য করে বলিয়া, ক্ষত্রিয় দুঃস্থলোকের কিছু অভাবমোচনের জন্য দানের ব্যবস্থাও করে।

ক্ষত্রিয়বর্ণের লোকেরা আরক্ষা বাহিনীতে (অর্থাৎ পুলিশ বাহিনীতে), প্রশাসনিক কার্যে. সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী প্রভৃতিতে যোগদান করিতে পারে।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়বর্ণের বর্ণগত কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং মৃত্যু নিশ্চিত হইলেও প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে না।

দিল্লীর অনতিদূরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রে যে মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, গীতায় সেই যুদ্ধের কথাই আছে। কেহ কেহ ইহাকে রূপক মনে করিলেও, ইহাকে রূপক ভাবিবার কোন কারণ নাই।

যে রাজ্য লইয়া দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহার অর্ধাংশে পাণ্ডবগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল। কিন্তু দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে ইহা ছাড়িয়া দিতে সম্মত ছিলেন না। বিবাদ মীমাংসার জন্য চেষ্টা করা হইল এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট হইতে পঞ্চপাণ্ডবের জন্য রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিবার পর যখন ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও ক্রূর প্রকৃতি দুর্যোধন তাহাও দিতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—'একটা ছুঁচের অগ্রভাগ পৃথিবীর উপরিভাগের

যতটুকু অংশ আবৃত করিতে পারে, ততটুকু অংশও আমি যুদ্ধ ব্যতীত ছাড়িব না'—তখন যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

গীতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ধর্ম্যযুদ্ধ বলা হইয়াছে এবং এই যুদ্ধ না করিলে পাপ হইবে ইহাও বলা হইয়াছে।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥—গীতা ২।৩৩

—(হে অর্জুন), যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে নিজের কীর্তি ও বর্ণানুযায়ী কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া পাপপ্রাপ্ত হইবে।—গীতা ২।৩৩

পাপনামক কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তু নাই। যে কাজ মানুষের দুঃখকষ্ট উৎপাদন করে বা বাড়াইয়া তোলে, তাহাই পাপ। অন্যায়-কারিগণকে যদি অবাধে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে সমাজের দুঃখকষ্ট বাড়িবেই। সেই জন্য অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ধর্মসঙ্গত কাজ এবং প্রতিরোধ না করা পাপ।

কৌরবপক্ষের অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পাণ্ডবগণকে করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য উভয়পক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হই র উপক্রম হইয়াছে, এমন সঙ্কটসময়ে আত্মীয়স্বজনের প্রাণহানিকর এই মহাযুদ্ধ করা উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে অর্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতাবশত অর্জুন যে সাময়িকভাবে কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাই অর্জুনের মোহ। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, স্থায়ী সুখ শান্তি লাভের উপায় প্রভৃতিসম্বন্ধে অর্জুন কৃষ্ণকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিলে, কৃষ্ণ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন, কিন্তু অর্জুনের যে যুদ্ধ করা উচিত, তাহার কথাও মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে কৃষ্ণ ভুলিলেন না।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥—গীতা ২।৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥—গীতা ২।৩৮

—হে অর্জুন, যদি যুদ্ধে নিহত হও, মৃত্যুর পর পরলোকে সুখকর মানসিক অবস্থা লাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও, রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। অতএব যুদ্ধের জন্য স্থিরসংকল্প করিয়া উত্থিত হও। ২।৩৭

সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া, যুদ্ধে নিযুক্ত হও; এইরূপ করিলে পাপ হইবে না (কারণ ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্তব্য করিলে কখনও পাপ হয় না)—২।৩৮

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥—গীতা ৩।৩০

—মনকে আত্মায় সমাহিত করিয়া ও ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ করিয়া ফলকামনাশূন্য, মমতাহীন ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর।

—গীতা ৩।৩০

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসং শয়ং ॥—গীতা ৮।৭

—অতএব সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিলে ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। —গীতা ৮।৭

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥—গীতা ১১।৩৩

—অতএব তুমি উত্থিত হও, যশোলাভ কর, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। পূর্ব হইতেই ইহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ অন্যায়ের সমর্থনে যুদ্ধের জন্য ইহাদের মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে); হে অর্জুন, তুমি ইহাদের মৃত্যুর নিমিত্ত মাত্র (অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে কারণস্বরূপ) হও। —গীতা ১১।৩৩

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাং স্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ
যুদ্ধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥—গীতা ১১।৩৪

—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ ঈশ্বর কর্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ অন্যায়ের সমর্থনে যুদ্ধের জন্য তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত হইয়া রহিয়াছে), তুমি তাহাদিগকে বধ কর; ব্যথিত হইও না। যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর। —গীতা ১১।৩৪

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥—গীতা ১৮।৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥—গীতা ১৮।৬০

—অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া 'যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যে মনে করিতেছ, সেই সংকল্প মিথ্যা হইবে, তোমার প্রকৃতি (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়স্বভাব) তোমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। —গীতা ১৮।৫৯

মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, নিজের স্বভাবজাত কর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া তুমি অবশভাবে তাহা করি ব। ১৮।৬০

অবশেষে অর্জুন বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥—গীতা ১৮।৭৩

—হে কৃষ্ণ, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে, কর্তব্য সম্বন্ধে আমার স্মৃতি (বা জ্ঞান) ফিরিয়া আসিয়াছে, আমি আত্মস্থ (স্থির ভাবাপন্ন) হইয়াছি। তোমার কথা অনুসারেই কাজ করিব।—গীতা ১৮।৭৩

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্যযুদ্ধ বলিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে এই যুদ্ধে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

যাহা জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বাড়াইয়া তোলে, তাহাই সাধারণতঃ

পাপ। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিলে, অন্যায়কারীর সংখ্যা এবং অন্যায় কার্যের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে লোকের দুঃখকষ্টও বাড়িতে থাকে, সেইজন্য অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা পাপ।

নরহত্যাকে আমরা সাধারণতঃ মহাপাপ বলি এবং ইহাকে মহাপাপ মনে করিয়া প্রত্যেক মানুষের ইহা হইতে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইহা পাপ নহে।

কোন সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের গৃহে একদল সশস্ত্র দস্যু প্রবেশ করিল। তাহারা গৃহের লোকজনকে প্রহার করিয়া ও বাঁধিয়া এবং অর্থ ও অলঙ্কার প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্য স্থানীয় প্রতিরোধক দল দস্যুগণকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দস্যুগণ প্রতিরোধক দলের দুই তিনজনকে সাংঘাতিকভাবে আহত করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধক দল দুই একটি দস্যুকে মারিয়া ফেলিল। আত্মরক্ষার জন্য এই প্রকার নরহত্যা পাপ নহে। অন্যায়ের প্রতিরোধ অন্যায় করিবার কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকজনকে সংযত করিয়া রাখে। ইহা সমাজের পক্ষে হিতকর, সুতরাং ইহাকে পাপের বিপরীত অর্থাৎ-পুণ্যকার্য বলা যাইতে পারে।

শাসকবর্গ অন্যায়কারিগণকে ধরিয়া বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং কাহারও গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে, সে কারাদণ্ডে বা অন্য প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে রাজবংশের গৃহযুদ্ধের অবস্থা ঘটিয়াছিল। দুর্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবগণের প্রতি বহুবৎসর ধরিয়া অনেক অন্যায় করিলেও তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহারা ক্ষমতার গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণ করিবার কোন উপায় থাকিল না।

দেশের কোন সুবৃহৎ দলভুক্ত বা বৈদেশিক অন্যায়কারিগণকে শাস্তি দেওয়ার কোন উপায় না থাকিলে এবং যুক্তিযুক্ত মীমাংসার

দ্বারা তাহাদিগকে অন্যায় হইতে কোনরূপে নিবৃত্ত করা সম্ভব না হইলে, তখন অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধই একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার যুদ্ধ নিশ্চয়ই করা উচিত এবং এই প্রকার যুদ্ধকে ধর্ম্ম্যযুদ্ধ বলা হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই প্রকারের যুদ্ধ ছিল, সেই জন্য গীতায় ইহাকে ধর্ম্ম্যযুদ্ধ বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণ নিজে অর্জুনকে এই যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

অন্যায়কারিগণ জানে যে যুদ্ধ ঘটিলে তাহাদের পক্ষের সহস্র সহস্র লোক নিহত হইতে পারে এবং যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ও লাঞ্ছনাও ঘটিতে পারে। এই প্রকার চিন্তা কখন কখন তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের গর্বোন্মত্ত নেতাগণ তাহাদিগকে মিথ্যা প্ররোচনা ও আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ প্রবৃত্ত করে এবং নিযুক্ত করিয়া রাখে। পরে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে।

অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্য যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও জানে যে এই কার্যের জন্য তাহাদের পক্ষেরও সহস্র সহস্র লোকের জীবনদান আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহাদের এই যুদ্ধ এই চিন্তা তাহাদের মনোবলকে দৃঢ় করিয়া রাখে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্যই নিহত হয়, তাহারা পরলোকে গিয়া চিন্তা করে যে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে জীবনদান করিয়া আসিয়াছে। এই চিন্তা পরলোকে তাহাদের মনের সুখকর অবস্থাকে রক্ষা করে। সেই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং"—ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধে যদি নিহত হও, তুমি স্বর্গলাভ করিবে অর্থাৎ পরলোকেও তোমার মনের সুখকর অবস্থা বজায় থাকিবে।

অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকিলে, তখন যুদ্ধ করাই যে একান্ত কর্তব্য এবং যুদ্ধ না করিলে যে তখন পাপ হইবে (অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি লোকের

দুঃখ কষ্ট বাড়িবে), তাহা স্বাধীন ভারতকে আত্মরক্ষার জন্য কিভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত হইতে সহজে বোঝা যাইবে।

চীনদেশ স্বাধীন ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু চীন যখন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আকস্মিকভাবে ভারত আক্রমণ করিল, এই আক্রমণের জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া প্রথমে ভারত কিছু অসুবিধায় পড়িল। পরে সামরিক শক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধি করিয়া সে চীনের অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার দ্বারা ভারতের জাতীয় সরকার তাহার যথাযথ কর্তব্য পালন করিয়াছে।

ভারত পাকিস্তানের দ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন বারেই পাকিস্তান জয়ী হইতে পারে নাই। পাকিস্তানের অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার জন্য ভারতের জোয়ানগণ শত শত পাকিস্তানীকে হত্যা করিয়াছে এবং শত শত ভারতীয় জোয়ানও নিজেদের জীবন দান করিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই ধর্মসঙ্গত কার্য হইয়াছে।

যদি কখনও কোন বৈদেশিক শত্রু যুদ্ধে ভারতকে পরাজিত করিতে পারে, ভারতবাসিগণ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়া নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে এবং শত্রুগণ ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকিবে, তখন ভারতবাসিগণের দুঃখকষ্টের কোন সীমা থাকিবে না। এই প্রকার অবস্থা ঘটিতে দিলে তাহা ভারতবাসিগণের পক্ষে মহাপাপ হইবে। ভারতের স্বাধীনতা ও সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কোন বৈদেশিক শত্রু অন্যায়ভাবে ভারত আক্রমণ করিলে, সেই অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য শত্রুপক্ষের যত লোক প্রভৃতি ধ্বংস করা আবশ্যক, তাহা কঠোরভাবে করিতে হইবে এবং ভারতের জোয়ানগণকেও প্রয়োজনানুযায়ী জীবনদান করিতে হইবে।

গীতায় অত্যুচ্চ আদর্শবাদের পার্শ্বেই বাস্তববাদকে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রসঙ্গে এই যুদ্ধের কর্তব্যতা সম্বন্ধে গীতায় যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা ইহার বাস্তববাদের অঙ্গ। গীতায় সমীচীন শিক্ষা এই—যুদ্ধ নিবারণের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু যদি ইহা কিছুতেই সম্ভব না হয়, তখন অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য ধর্ম্ম্যযুদ্ধ করাই সুসঙ্গত কাজ হইবে।

পুলিশ বাহিনী ও সামরিক বাহিনীসমূহে যোগদান ব্যতীত ক্ষত্রিয়বর্ণের লোকসমূহ অন্যপ্রকার কার্যও করিতে পারে। যেখানেই শক্তিশালী, সাহসী ও কর্মতৎপর লোক আবশ্যক, সেখানেই ক্ষত্রিয়-বর্ণের লোক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইলে ক্ষত্রিয়-বর্ণের লোক বৈশ্যের কার্যও করিতে পারে।

অর্জুন গার্হস্থাশ্রমী ছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ক্ষত্রিয়বর্ণের লোকসমূহ গার্হস্থাশ্রমী হইলেও তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান আবশ্যক হইতে পারে।

(৩) গার্হস্থাশ্রমে ধনোৎপাদক বৈশ্যের কার্য :—

বৈশ্যবর্ণের লোকসমূহের স্বভাবজাত কার্য কি প্রকার, তাহাও গীতায় বলা হইয়াছে এবং এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে।

বৈশ্যবর্ণের লোকসমূহকে মনুষ্যসমাজের ভিত্তি বলা যাইতে পারে, কারণ পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য যে ধন আবশ্যক, তাহারাই সেই প্রকৃত ধনের উৎপাদক। সরকারী নোট, মুদ্রা প্রভৃতি কৃত্রিম ধন। এই কৃত্রিম ধনের উপকারিতা ও অপকারিতা দুইই আছে। জমি, জায়গা, ঘরবাড়ি, শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রভৃতি প্রকৃত ধন এবং এইগুলি সহজে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্রিম ধন সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার ফলে লোভী ও স্বার্থপর লোকেরা বুদ্ধিবলে বা কৌশলে অপরিমিত ধনের অধিকারী হইয়া যায় এবং ইহাকে তাহারা গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

জনসমাজ সুষ্ঠু ধনবণ্টনের পথে ইহা বিঘ্নস্বরূপ হয়। কিন্তু ধনবান ব্যক্তিগণ দানশীল হইলে, এই অমঙ্গল কিছু পরিমাণে দূরীভূত হয়।

কৃষকগণ নানাপ্রকার শস্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সমস্ত জাতির জীবনরক্ষা করে; শ্রমিকগণ নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করে এবং ব্যবসায়ী কৃষিজাত ও শ্রমজাত দ্রব্যসমূহ যাহাতে বিভিন্নস্থানের লোকে পায় তাহার ব্যবস্থা করে। কৃষক, শ্রমিক ও বণিক ইহারা সকলে বৈশ্যবর্ণের লোক।

মনুষ্যসমাজকে রক্ষা করিবার দিক হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ বা শ্রেণীর লোকের কাজ সমানভাবে প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেক বর্ণের লোককে অন্য দুই বর্ণের লোকের উপর নির্ভর করিতে হয়। বৈশ্যোৎপাদিত ধনের কিয়দংশলাভ এবং ক্ষত্রিয়ের সামাজিক শান্তিরক্ষার কাজ ব্যতীত পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে ব্রাহ্মণের জীবনধারণ সম্ভব নহে। বৈশ্যোৎপাদিত ধনের কিয়দংশ লাভ এবং ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষালাভ ব্যতীত পৃথিবীতে সুন্দর ও সুখযুক্ত জীবনযাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষালাভ এবং ক্ষত্রিয়ের সামাজিক শান্তিরক্ষার কাজ ব্যতীত পৃথিবীতে সুন্দর ও সুখযুক্ত জীবনযাপন বৈশ্যের পক্ষে সম্ভব নহে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণের কাজ সমানভাবে আবশ্যক বলিয়া, গীতায় সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে বর্ণধর্ম (অর্থাৎ বর্ণানুযায়ী কর্তব্য) ত্যাগ করা উচিত নহে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥—গীতা ৩।৩৫

—অন্য বর্ণের কাজ ভালভাবে করিতে পারিলেও এবং নিজবর্ণের কাজ ভালভাবে করিতে না পারিলেও, নিজ বর্ণানুযায়ী কাজ করাই ভাল। নিজবর্ণের কাজ করিতে করিতে মৃত্যু ঘটিলেও তাহাই ভাল; অন্যবর্ণের কাজ করা সাধারণতঃ কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। (৩।৩৫)

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।—গীতা ১৮।৪৫
—মানুষ নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াই সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। (১৮।৪৫)

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥—গীতা ১৮।৪৬

—(অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তিরূপে) যিনি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত প্রাণী তাহাদের বিভিন্ন প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা লাভ করে, নিজ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। (১৮।৪৬)

ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ঐশ্বরিক প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারণ ও সুখভোগের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, প্রকৃতি তাহা সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের লোকেরা যখন সৎভাবে নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কর্তব্যপালন করিতে থাকিবে, তখন তাহারা ভাবিবে যে তাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতেছে এবং এই প্রকার কাজের দ্বারা তাহারা ঈশ্বরের পূজা করিতেছে। বর্ণধর্ম পালন (অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য সাধন) মানুষকে ধর্মের পথে ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে "নিজ নিজ কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করিয়া মানুষ সিদ্ধিলাভ করে।"—গীতা ১৮।৪৬

(৪) **গার্হস্থ্যাশ্রমে সর্বসেবক শূদ্রের কার্য ঃ—**

গীতায় সেবাকার্যকে শূদ্রবর্ণের লোকের স্বভাবজাত কার্য বলা হইয়াছে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের লোকসমূহের সহিত সহযোগিতা করিয়া ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কার্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে। উচ্চজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতার অভাব তাহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়।

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রবর্ণের লোকের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু নানাপ্রকার অসৎ প্রকৃতির লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। নরঘাতক, দস্যু, চোর, প্রতারক, লম্পট, অনিষ্টকারী, উৎকোচ গ্রহণকারী, স্বার্থপর, মিথ্যাবদী, কর্তব্যপালনে অবহেলাকারী ব্যক্তি প্রভৃতি অধম বর্ণের লোক। ইহারাই সমাজের পঞ্চমা বা পঞ্চমবর্ণের লোক অর্থাৎ শূদ্র হইতেও অধম।

গার্হস্থাশ্রমে বিবাহ :—

বিবাহ গার্হস্থাশ্রমের প্রধান অঙ্গ। মানুষ পুত্রকন্যা লাভ করুক এবং পুরুষাক্রমে এই পৃথিবীতে বাস করিতে থাকুক ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়াই মনে হয়। কারণ ইহার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই এবং প্রাকৃতিক প্রেরণায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব বিদ্যাশ্রমের পর এবং পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়স হইবার পর পুরুষ উপার্জনক্ষম হইলে তাহার পক্ষে বিবাহ করাই সাধারণ নিয়ম। অবিবাহিত অবস্থা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহার ব্যতিক্রম মাত্র। বিবাহের জন্য যৌতুক দাবি করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য এবং ইহা হীন মনোভাবের পরিচায়ক। বিবাহ আবশ্যক হইলেও, বিবাহের অর্থ এই নয় যে কোন স্ত্রীলোক যত পুত্রকন্যার জননী হইতে পারে, কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া সে তত পুত্রকন্যার জননী হইতে থাকিবে। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। চিন্তা না করিয়া কেবল প্রবৃত্তির বশে তাহার কোন কার্য করা উচিত নহে। যে পিতামাতা দুই তিনটি সন্তানের পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির যথাযথ ব্যবস্থা করিতে অক্ষম, তাহারা যদি আট-দশটি সন্তানের জনকজননী হয়, তাহা হইলে তাহারা যে নিজেদের ও সন্তানগণের দুঃখকষ্টকে ডাকিয়া আনে, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্বে দেশের জনসংখ্যা বর্তমান সময়ের ন্যায় এত অধিক ছিল না এবং জীবনধারণের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক, তাহাদের মূল্যও এত অধিক ছিল না। সুতরাং কোন পিতামাতার সন্তান সংখ্যা অধিক হইলে তাহা অধিক কষ্টের কারণ হইত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনসংখ্যাও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণ বাড়িতেছে না। তাহার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য হইতেছে এবং জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার প্রত্যেকটির মূল্য এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে যে তাহা সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় বর্তমান সময়ে প্রত্যেক সাধারণ দম্পতির (অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর) পক্ষে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দুই তিনটির অধিক সন্তান যাহাতে না হয়, সেইজন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া তাহাদের উচিত। আত্মসংযমের দ্বারা ইহা হইতে পারে, কিন্তু অনেকের পক্ষে এইরূপ আত্মসংযম অসুবিধাজনক হইতে পারে। তাহারা সরকারের পরিবার কল্যাণ বিভাগের কর্মিগণের সহিত যোগাযোগ করিলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হইতে পারে। পল্লীঅঞ্চলের সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ হইতেও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

যদি অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় এবং তাহার ফলে ভারতের বহুলোক ক্ষয় ঘটে, তখন সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা থাকিবে না। ভারতের স্বাধীনতা ও সম্পদকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট জনবল সবসময়ই আবশ্যক হইবে। সেইজন্য সব সময়ই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গীতা কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। তখন ভারতে জনসংখ্যার আধিক্য বা দ্রব্যমূল্যের আধিক্য ছিল না। সেই জন্য গীতায় এই সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু প্রথমতঃ গীতায় আত্মসংযমের কথা এবং ইন্দ্রিয় সুখের জন্য কোনরূপেই লালায়িত হওয়া উচিত নহে ইহার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং দেশের জনসংখ্যার আধিক্যের কথা চিন্তা না করিয়া যদি কোন দম্পতি অসংযতভাবে কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া বহু

পুত্রকন্যার জনকজননী হয়, তাহা হইলে তাহারা যে গীতার শিক্ষা-বিরোধী কার্য করিতেছে ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ কীভাবে সামাজিক সুখশান্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার শিক্ষা গীতায় দেওয়া হইয়াছে। দেশের জনসংখ্যার আধিক্যের কথা চিন্তা না করিয়া, বহু দম্পতি যদি বহু পুত্রকন্যার জনকজননী হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যা আরও বাড়িবে এবং তাহার ফলে সামাজিক দুঃখকষ্ট আরও বাড়িবে। সুতরাং এই দিক হইতে দেখিয়াও বলা যাইতে পারে যে বর্তমান সময়ে বহু সন্তানের অনিয়ন্ত্রিত জন্মদান গীতার শিক্ষার বিরোধী।

জনসংখ্যার আধিক্য ঘটায়, যদি কিছু কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকে, তাহা সমাজের পক্ষে অহিতকর না হইয়া বরং হিতকর হইবে। কিন্তু তাহাদিগকে শুদ্ধ ও সংযতভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্মসাধনা ও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সমাজসেবা তাহাদের এইভাবে জীবনযাপনের পক্ষে সহায়ক হইবে।

কর্মযোগ ও সংযত সম্ভোগ :—

ঈশ্বরের সহিত মনের সংযোগস্থাপনের চেষ্টাকে যোগ বলা হয়। আমাদের মন সাধারণতঃ জাগতিক দ্রব্যসমূহ লইয়া ব্যস্ত থাকে। মনকে মধ্যে মধ্যে এই সমস্ত দ্রব্য হইতে টানিয়া লইয়া ঈশ্বরে স্থাপিত ও যুক্ত করিতে হইবে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন "মামনুস্মর যুধ্য চ" (গীতা ৮।৭) আমাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর।

যদি যুদ্ধ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্য প্রকার কার্য করিতে করিতেও মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই স্মরণ করা যাইতে পারে। নিজের আত্মীয়স্বজনের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য গার্হস্থাশ্রমে গৃহীকে ও গৃহিণীকে দিনরাত নানাপ্রকার কার্য করিতে হয়। এই সমস্ত কার্যের মধ্যেও মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করা যাইতে পারে। মানুষ যে সমস্ত কার্য করে, তাহা ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া

প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যেই করে; সুতরাং ইহাতে তাহার অহঙ্কারের কিছুই নাই। "ধর্মের অবিরোধী কাম আমি (অর্থাৎ জাগতিক দ্রব্যাদির সাহায্য সুখলাভ করিবার সঙ্গত কামনা ঐশ্বরিক প্রেরণা হইতেই আসে)"—গীতা ৭।১১। "প্রকৃতিক গুণসমূহের দ্বারা সর্ব-প্রকার কার্য সম্পন্ন হইতেছে। অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া মানুষ 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করে"—গীতা ৩।২৭। "তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা আহার করিবে, যে হোম করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপস্যা করিবে, তৎসমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিবে।—গীতা ৯।২৭

গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্মের অ-বিরোধী সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্য অনাসক্তভাবে করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া অহঙ্কার ত্যাগপূর্বক সমস্ত কার্য ঈশ্বরে অর্পণ করিলে, তাহাই হইবে গৃহী ও গৃহিণীগণের কর্মযোগ। ইহা গীতার অন্যতম প্রধান শিক্ষা।

বিদ্যাশ্রমে বালক-বালিকাগণ ও যুবকযুবতীগণ উপার্জনক্ষম নহে বলিয়া, তাহাদের মধ্যে ভোগস্পৃহার উন্মেষ হইতে থাকিলেও, ইহার সংযত তৃপ্তিসাধনও অনেক সময় সম্ভব হয় না কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে বিভিন্ন প্রকার কার্যের দ্বারা তাহারা উপার্জনক্ষম হইলে, তখন ভোগস্পৃহার সংযত তৃপ্তিসাধনের সুযোগ আসে। কিন্তু তখনও পুত্রকন্যা, ভাইবোন, পিতামাতা প্রভৃতির কথা অনেক. স চিন্তা করিতে হয় এবং তাহাদের জন্য ত্যাগও করিতে হয়। এই প্রকার ত্যাগ ধর্ম্যকার্যের অন্তর্গত এবং ইহার মধ্যে আনন্দ আছে। এই প্রকার ত্যাগের মধ্যে তখন গৃহী ও গৃহিণীকে সুসংযতভাবে তাহাদের ভোগস্পৃহার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিতে হয়।

গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহিণীগণের অন্নযজ্ঞ :—

পুরুষেরা সাধারণতঃ বাহিরে গিয়া পরিশ্রমের কার্য করে এবং অর্থোপার্জন করে। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য করে। কিন্তু এই গৃহকার্যের জন্য তাহাদিগকে কম পরিশ্রম করিতে হয়—এইরূপ নহে। গৃহে সকলেই সুখশান্তি লাভ করিতে চায় এবং ইহার জন্য গৃহিণীগণকে নানাদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

স্বামী, পুত্রকন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রত্যহ দুই তিনবার বা তিন-চারবার আহারের ব্যবস্থা স্ত্রীলোকগণকে করিতে হয়; ইহা কম পরিশ্রমের কার্য নহে। মাতা প্রত্যহ যে আহার্য গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার দেহকে রক্ষা করে। ঐশ্বরিক বিধানে মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণ দিনের পর দিন মাতৃদেহ হইতে যে রক্ত টানিয়া লয়, তাহার সাহায্যে তাহার দেহের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সেইজন্য সন্তানসম্ভবা মাতাকে যথেষ্ট খাদ্য দিতে হয়। জন্মের পর শিশুর দেহের অবয়ব ক্ষুদ্র থাকে, কিন্তু দিনের পর দিন সে যে আহার্য গ্রহণ করে, তাহার সাহায্যে তাহার দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্নের দ্বারা আমাদের দেহ গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে অন্নময় দেহ বলা হয়। গীতায় ৩।১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি"—অন্ন হইতে সমস্ত প্রাণীর দেহ উৎপন্ন হয়।

প্রাণিগণের দেহসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতি প্রাণিগণের উপযোগী নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে। গৃহের সকলের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া গৃহিণী ঈশ্বরচিন্তা করিবেন এবং ঈশ্বরে ইহা নিবেদন করিয়া প্রয়োজনানুসারে ইহা সকলের মধ্যে বণ্টন করিবেন ও নিজের জন্য কিছু রাখিবেন। ইহাই গৃহিণীগণের প্রাত্যহিক অন্নযজ্ঞ।

যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণ্যাৎ॥ গীতা ৩।১৩

—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারী সাধুগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপিগণ কেবল নিজেদের জন্য পাক করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করে।—গীতা ৩।১৩

সুতরাং গৃহিণীগণ ঈশ্বরে অন্ন নিবেদন করিয়া গৃহের সকলের মধ্যে ইহা বণ্টন করিবার পর নিজের শরীর রক্ষা করিবার জন্য যে অন্ন ভোজন করেন, ইহার দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজনকারী সাধুগণের ন্যায় কার্য করেন। এই প্রকার কার্যের দ্বারা তাঁহারা পাপমুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের শরীরকেও সুস্থ ও সবল রাখা

আবশ্যক। সেই জন্য যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন যাহাতে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে পান, সেইদিকে গৃহিগণের লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

২। **গার্হস্থ্যাশ্রমে দৈনন্দিন জীবনে পরাবিদ্যার প্রয়োগঃ—**

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাহাদের শত শত বা সহস্র সহস্র প্রয়োজনে সহস্র সহস্র প্রকার কার্য করে। এই কার্যগুলিকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ ব্রাহ্মণবর্ণের কার্য, ক্ষত্রিয়বর্ণের কার্য, বৈশ্যবর্ণের কার্য ও শূদ্রবর্ণের কার্য এইভাবে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং সমাজের প্রয়োজনে ও সমাজের মঙ্গলের জন্য কার্যের এই বিভাগ আবশ্যক হয়।

কিন্তু পরাবিদ্যার অনুশীলনের পথ এবং সর্বপ্রকার মানসিক দুঃখকষ্ট ও অশান্তি হইতে মুক্তির পথ সমস্ত মানুষের নিকট সমানভাবে উন্মুক্ত। এই পথে যে যেখানে আছে, তাহাকে সেই স্থান হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।

বিদ্যাশ্রমে পরাবিদ্যার কি প্রকার শিক্ষা আবশ্যক তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমেও সেই শিক্ষার অনুশীলন ও প্রয়োগ চলিতে থাকিবে।

(ক) আত্মসংযম :—

গার্হস্থ্যাশ্রমে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিতে হইলে, অর্থ যে একান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য; সেইজন্য ধর্মানুমোদিতভাবে প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। আয় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে মিতব্যয়ী হওয়া বিশেষ আবশ্যক। আয়ের সচ্ছলতা থাকিলে ভাবী আপদবিপদের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখাও আবশ্যক। টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পত্তি হাতে আসিলে কেহ কেহ জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য সেবন প্রভৃতিতে আসক্ত হয় ও এইভাবে দুঃখকষ্টকে ডাকিয়া আনে। বাল্যকাল হইতে আত্মসংযম শিক্ষা না করিবার জন্য অনেক লোকের জীবনে নানাপ্রকার দুর্ভোগ ঘটে। তাহারা কুপ্রবৃত্তিসমূহকে দমন করিতে পারে না বলিয়া, নানাপ্রকার অন্যায় ও অসৎকার্য করে এবং অনেক সময় তাহার ফলভোগও করে। তাহাদের আত্মীয়স্বজনকেও এই দুর্ভোগের অংশীদার হইতে হয়।

যদি প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিণী শুদ্ধ ও সংযত জীবনযাপনের চেষ্টা করেন এবং পুত্রকন্যাগণ ও পরিবারের অন্যান্য সকলে যাহাতে ঐ প্রকার জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা নানাক্ষেত্রে যে দুর্নীতি দেখিতে পাই, তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং সমাজ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

(খ) **সমদর্শন ঃ—**

প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জীবাত্মা ঈশ্বরের সনাতন (অর্থাৎ চিরস্থায়ী) অংশ কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির প্রভেদবশতঃ মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য ঘটিয়া যায়।

মানুষে মানুষে বহু পার্থক্য থাকিলেও সমস্ত মানুষের জীবাত্মা ঈশ্বরের সনাতন অংশ ইহা মনে রাখিয়া সকলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতে হইবে এবং কাহাকেও অযথা দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দেওয়া উচিত হইবে না। ইহার অর্থ এই নহে যে অধীনস্থ ব্যক্তিকে ভাল করিবার জন্য তাহাকে তিরস্কার প্রভৃতি করা চলিবে না। কোন ব্যক্তি তাহার নিজের দুঃখকষ্ট চায় না। সেই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে মনে রাখিতে হইবে যে সে যেমন নিজের দুঃখকষ্ট চায় না, অন্য কোন লোকও সেইভাবে নিজের দুঃখকষ্ট চায় না। সুতরাং অন্যের দুঃখকষ্ট উৎপাদন করিতে পারে, এইরূপ কোন কাজ, কখনও কাহারও করা উচিত নহে। নিয়মসঙ্গত, আইনসঙ্গত বা ধর্মানুমোদিত কাজ করিয়া অন্যকে সুখী করিতে পারিলে, যে মানসিক আনন্দলাভ করিতে পারা যায়, তাহাই উচ্চতর আনন্দ।

অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ঔষধ বা চিকিৎসার ব্যবস্থা, শিক্ষা, কিছু নির্দোষ আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যক। প্রত্যেকের জন্য যাহাতে এইগুলির যথাসম্ভব ব্যবস্থা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা ও তাহাতে যথাসম্ভব সাহায্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। এই প্রকার সমাজসেবা ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ, ইহা প্রত্যেককে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

নিজের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা ও তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রত্যেকের পক্ষে নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু ঐ প্রকার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের চিন্তাকে আবদ্ধ রাখা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। নিজের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, দেশের কোটি কোটি লোকের মঙ্গলের কথাও সেইভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। মানুষের কামনার কোন অন্ত নাই। যাহার যথেষ্ট সম্পদ আছে, সে অন্যের কথা না ভাবিয়া নিজের জন্য আরও সম্পদ চায়। ইহা ধর্মের পথ নহে। ধর্মের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, নিজের কামনা বাসনাকে যতদূর সম্ভব সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং অল্পে সন্তুষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে হইবে. সঙ্গে সঙ্গে যাহারা অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ, তাহারাও যাহাতে কিছু কিছু সম্পদের অধিকারী হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে পার্থিব সম্পদের সমবণ্টন ও সমতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। কিন্তু সকলেই যাহাতে সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া যতদূর সম্ভব দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে. তাহার জন্য চেষ্টা করা উচ্চ স্তরের ধর্মকার্য। বৈশেষিক দর্শনে, ধর্মের দুইটি লক্ষ্যের কথা বলা হইয়াছে। ধর্মের প্রথম লক্ষ্য সার্বজনীন অভ্যুদয় বা উন্নতি; সুতরাং অন্যান্য লোকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া, যে কেবল নিজের সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা করে, সে জপতপ প্রভৃতি যাহাই করুক না কেন, সে প্রকৃত ধার্মিক নহে। ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। যে নিজের কামনাকে সংযত করিয়া অন্যের জন্য ত্যাগের চেষ্টা করে, সে এই পথের ভিতর দিয়াই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

গার্হস্থ্যাশ্রমে সকলের পক্ষে অর্থদান সম্ভব হইবে না, কিন্তু সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া কিছু সময় ও শ্রমদান প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যক।

আত্মসংযমের ন্যায় সমদর্শনও ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু অন্যায়-কারীকে অন্যায় কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিবার জন্য যথাযথ পন্থা

অবলম্বন করা আবশ্যক। সমদর্শনের সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই।

(গ) প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা ও যোগসাধনের চেষ্টা :—

গার্হস্থাশ্রমে প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিণীর পক্ষে সকালে বা সন্ধ্যায় বা অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে প্রত্যহ কিছুক্ষণ (২৫।৩০ মিনিট) ঈশ্বরচিন্তা ও যোগসাধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। সাংসারিক কার্যের মধ্যেও মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করা যাইতে পারে।

যোগদর্শনের দ্বিতীয়সূত্রে বলা হইয়াছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে নানাপ্রকার চিন্তা চলিতে থাকে। সর্বপ্রকার চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে। তৃতীয়সূত্রে বলা হইয়াছে "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"—তখন (অর্থাৎ মনকে সর্বপ্রকার চিন্তামুক্ত করিতে পারিলে) দ্রষ্টা (অর্থাৎ আত্মা) তাহার নিজস্বরূপে অবস্থান করিবে।

গীতায় বলা হইয়াছে :—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬।২৬

—অর্থাৎ চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে টানিয়া আনিয়া আত্মায় স্থাপিত ও যুক্ত করিবে।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।—গীতা ৬।২৫

—অর্থাৎ মনকে আত্মসংস্থ (অর্থাৎ আত্মায় স্থাপিত ও যুক্ত) করিয়া অন্য কোন কিছুর কথা চিন্তা করিবে না। (কেবল বিশ্বব্যাপী চিন্ময় পরমাত্মারই চিন্তা করিবে)।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর ও প্রকৃতির সমবায়ে বিশ্ব। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দ্বিবিধ রূপ আছে। কিন্তু ঈশ্বরের কোন স্থূল রূপ নাই। আমাদের প্রত্যেকের মন আছে এবং বিভিন্ন লোকের মন বিভিন্নভাবে কাজ করিতেছে। কিন্তু মনের কোন স্থূল রূপ নাই এবং ইহাকে চোখে দেখাও যায় না। তাহা হইলেও বিভিন্ন

লোকের বিভিন্ন মন যে আছে, ইহাতে কখনও কাহারও সন্দেহ হয় না। সমস্ত মন সচেতন বা চেতনাযুক্ত। ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তি মাত্র। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের চেতনা এবং প্রকৃতির নিকট হইতে তাহাদের দেহলাভ করে।

আমাদের দেহ প্রকৃতিজাত স্থূল বস্তু, এবং আমাদের চতুর্দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ সর্বদা বর্তমান। যোগসাধনা করিতে হইলে, মনকে জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রথমে ইহাকে আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মায় স্থাপিত ও যুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর আত্মারও পশ্চাতে ঈশ্বররূপে যে অতিসূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তি বর্তমান, তাহাতে মনকে স্থাপিত ও যুক্ত করিতে হইবে। গার্হস্থ্যাশ্রমে দিনের পর দিন এইভাবে যোগসাধনার প্রাথমিক কার্য করিতে হইবে। অর্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "মন চঞ্চল এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বিক্ষুব্ধ করে। ইহা বলবান ও দৃঢ়। বায়ুকে যেমন দমন করিয়া রাখা যায় না, ঐভাবে মনকে দমন করাও অতিশয় কঠিন"—গীতা ৬।৩৪

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "মন যে চঞ্চল এবং ইহাকে দমন করা যে কঠিন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাকে বশে আনা যায়"—গীতা ৬।৩৫

যোগদর্শনের প্রথম অধ্যায় (সমাধিপাদের) দ্বাদশ সূত্রেও ঐ একই কথা বলা হইয়াছে। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির (অর্থাৎ মনের সর্বপ্রকার চিন্তা প্রভৃতির) নিরোধ করা যায়।

মনকে ঈশ্বরে সমাহিত (অর্থাৎ স্থাপিত ও যুক্ত) করিয়া রাখিবার দুইটি উপায়ের কথা যোগদর্শনে ও গীতায় সমানভাবে বলা হইয়াছে।

১ম উপায়—অভ্যাস: যাহা প্রথমতঃ কষ্টকর মনে হয়, তাহা অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে। সেইজন্য দিনের পর দিন প্রত্যহ কিছুক্ষণ বা কিছুবার মনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ হইতে টানিয়া আনিয়া নিজ আত্মায় ও বিশ্বব্যাপী চিন্ময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

২য় উপায়—বৈরাগ্য : জাগতিক সমস্ত দ্রব্য, সমস্ত প্রাণীদেহ এবং সমস্ত নরনারীর দেহ যে বিনাশশীল—এই কঠোর সত্যকে আমরা সাধারণতঃ ভুলিয়া যাই এবং ইহাদের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হই। মানুষের আত্মা অমর কিন্তু তাহার স্থূল দেহ ভঙ্গুর ও নশ্বর। পুত্রকন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের দেহের বিনশ্বরতার কথা এবং সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক দ্রব্য ও প্রাণীর ক্ষণধ্বংসিতার কথা চিন্তা করিয়া ইহাদের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ভাব কমাইতে হইবে এবং মনের ভিতর ক্রমশঃ ইহাদের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব আনিতে হইবে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসিতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি কর্তব্য করিতে হইবে। ধর্মানুমোদিতভাবে অর্থোপার্জন করিতে হইবে এবং জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সংগ্রহও করিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত প্রাণীদেহের ও সমস্ত প্রাকৃতিক দ্রব্যের নশ্বরতার কথা মনে রাখিয়া, তাহাদের প্রতি সাধারণতঃ যে অত্যধিক আসক্তির ভাব মনোমধ্যে থাকে, তাহাকে ক্রমশঃ মন হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, এই প্রকার অনাসক্তির ভাব অত্যাবশ্যক।

(ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান ঃ—

নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

গার্হস্থ্যাশ্রমে পুত্রকন্যা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন লইয়া সুস্থদেহে জীবনধারণ করিতে হইলে অন্নবস্ত্রাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আবশ্যক হইবে। প্রথমতঃ অন্ন আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ বস্ত্র আবশ্যক, তৃতীয়তঃ গৃহ ইত্যাদি—এইভাবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নানাপ্রকার দ্রব্যের জন্য আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু জীবন ধারণের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা ব্যতীত আরও নানাপ্রকার দ্রব্য প্রভৃতি মানুষ চায়। ইহাদের সাহায্যে সে সুখী হইতে পারিবে, এইরূপ ধারণা সে করে এবং এইগুলি লাভ করিবার জন্য সে অনেক সময় অসঙ্গত উপায়ও অবলম্বন করে। নানাপ্রকার

পার্থিব দ্রব্যাদির সাহায্যে সুখী হইবার প্রবল কামনাকে এক কথায় কাম বলা হয়। এই প্রকার কামনাকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া রাখা প্রত্যেকের কর্তব্য।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥—গীতা ২।৭০

—অর্থাৎ চতুর্দিক হইতে জলরাশি সমুদ্রে প্রবেশ করিতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন অচল অবস্থায় থাকে, সেইরূপ নানাপ্রকার মনোহর দ্রব্যাদি যাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করিতে পারেন, যাহারা নানাপ্রকার ভোগ্য দ্রব্য কামনা করে, তাহারা শান্তি পায় না।—গীতা ২।৭০

প্রথমতঃ কোন প্রকার দ্রব্য প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যক হইলে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু ইহার জন্য প্রবল কামনা মনোমধ্যে পোষণ করা উচিত নহে। কারণ আশাপূর্ণ না হইলে, অনেক সময় আশাভঙ্গজনিত গভীর দুঃখ উপস্থিত হয়। সেইজন্য সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, লাভ ও অলাভ, জয় ও পরাজয়—উভয় প্রকার অবস্থার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার শিক্ষা গীতায় দেওয়া হইয়াছে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে, সুষ্ঠু উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুনরায় বা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন সময়েই প্রবল কামনা মনোমধ্যে পোষণ করা উচিত নহে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কাজ নিজের ও আত্মীয়স্বজনের পক্ষে হিতকর হইলেও, তাহা যদি সমাজের পক্ষে অহিতকর হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে। কোটি কোটি লোক লইয়া মনুষ্যসমাজ গঠিত হইয়াছে, সুতরাং সমাজের মঙ্গল বলিলে বুঝিতে হইবে সমাজের অন্তর্গত সমস্ত লোকের মঙ্গল। সমাজ বা সমষ্টির স্বার্থের সহিত ব্যক্তি বা ব্যষ্টির স্বার্থের বিরোধ ঘটিলে, যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং ব্যক্তির স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া

সমাজের স্বার্থের দিকে এমনভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে ব্যষ্টি (বা ব্যক্তি) ও সমষ্টি (বা সমাজ) উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহার আত্মা ও প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার দেহ লাভ করিয়াছে এবং প্রত্যেকেই সুস্থদেহে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সমস্ত মানুষই তাহার নিজেরই অনুরূপ এবং বিভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবাত্মারূপে তাহারা তাহার নিজেরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সুতরাং সে যেমন নিজের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে, সমাজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করাও তাহার পক্ষে সেইভাবে ধর্ম্য কর্তব্য।

সুতরাং নিজের সঙ্গতি অনুসারে যাহার পক্ষে যেভাবে অর্থদান বা দ্রব্যদান সম্ভব, তাহার পক্ষে তাহা করণীয় হইবে। কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভব না হইলে, সে শ্রমদান, শক্তিদান, সময়দান, আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহদান প্রভৃতি করিতে পারে।

চতুর্থতঃ ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সাহায্যে মানুষ নানাপ্রকার কাজ করে; সুতরাং ইহাতে তাহার অহঙ্কারের কিছুই নাই এবং সর্বপ্রকার অহঙ্কার হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে। নিজের, আত্মীয়স্বজনের ও সমাজের পক্ষে হিতকর কাজ করিবার পর, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে।

উল্লিখিত প্রকারের নিষ্কাম কর্ম গৃহী ও গৃহিণীর কর্মযোগের অন্তর্গত।

(ঙ) দৈবীসম্পদ লাভের চেষ্টা :—

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কতকগুলি উত্তম গুণ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই গুণগুলি মানুষকে দেবতুল্য করিয়া তোলে। সেইজন্য গার্হস্থ্যাশ্রমেও এই গুণগুলি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কি প্রকার দোষ মানুষকে আসুরিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলে, তাহার কথাও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই দোষগুলি

পরিহার করিবার জন্যও যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যক।

(চ) মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা ঃ—

গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহী ও গৃহিণীকে নানাপ্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। এই অবস্থাগুলি কখন অনুকূল, কখন বা প্রতিকূল হয়। কোন সময় ধনসম্পত্তি লাভ হইতে পারে, আবার কোনসময় ধন-সম্পত্তি নাশ ঘটিতে পারে। এইভাবে কেহ উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করিতে পারে, আবার ইহা হারাইতেও পারে। উত্তম বন্ধুলাভ হইতে পারে, আবার বন্ধুবিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। নিজের ও নিকট আত্মীয়স্বজনের পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারে, আবার আত্মীয়স্বজনের বা পুত্রকন্যার মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

গার্হস্থ্যাশ্রমে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা মধ্যে মধ্যে ঘটিতে পারে। কিন্তু অনুকূল অবস্থা ঘটিলে যেমন আনন্দে আত্মহারা হওয়া উচিত নহে, প্রতিকূল অবস্থা ঘটিলে সেইরূপ দুঃখ বা শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। মনের যতদূর সম্ভব সমভাব বা সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকের উচিত।

ন প্রহৃষেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥—গীতা ৫।২০

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকিয়া মোহমুক্ত ও স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন হন। প্রিয়বস্তুলাভে তাঁহার হর্ষ এবং অপ্রিয় ঘটনা ঘটিলে তাঁহার উদ্বেগ উপস্থিত হয় না।—গীতা ৫।২০

যোগস্থঃ কুরুকর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥—গীতা ২।৪৮

—হে অর্জুন, ঈশ্বরে মন নিবদ্ধ রাখিয়া কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ও ইহার বিফলতায় সমান মনোভাবাপন্ন হইয়া কর্মসমূহ কর। মনের সমতা রক্ষা যোগের অঙ্গ।—গীতা ২।৪৮

সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে বিদ্যাশ্রমের পর কর্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন বাঞ্ছনীয় নহে। গীতায় কখনও কর্মত্যাগ

করিতে বলা হয় নাই। কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ইহাই গীতায় বলা হইয়াছে।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥—গীতা ৫।২

—সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মুক্তির পথে সহায়ক।—কিন্তু এই দুইটির মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ।—গীতা ৫।২

বিদ্যাশ্রমে বেদান্ত ধর্মের পঞ্চাঙ্গ সাধনার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে গৃহী ও গৃহিণীগণকে সুখ দুঃখ, সচ্ছলতা ও অভাব, জন্মমৃত্যু, রোগ ও সুস্থতা, লাভক্ষতি, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও মনের সমভাব রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা বেদান্ত ধর্মের ষষ্ঠ সাধনা এবং গার্হস্থ্যাশ্রমিগণকে বিদ্যাশ্রমিগণের জন্য নির্ধারিত পঞ্চ সাধনার সহিত এই ষষ্ঠ সাধনা যুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমীর সাধনা হইবে ষড়ঙ্গ সাধনা।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধনাশ্রমে গীতার শিক্ষা

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ

১। অপরাবিদ্যার (বা জাগতিক বিদ্যার) প্রয়োগ।

গার্হস্থ্যাশ্রমে কর্মের যে প্রাবল্য থাকে, সাধনাশ্রমে তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। ৬০।৬৫ বৎসর বয়স হইবার পর অধিকাংশ লোকের কর্মক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। সেইজন্য ঐরূপ বয়স হইবার পর বা অবস্থা বিশেষে ইহার কিছু পরে পুত্রকন্যা প্রভৃতির উপর সংসারের ভার অর্পণ করিয়া গৃহী ও গৃহিণীর পক্ষে সাধনাশ্রমের জন্য নির্ধারিত কার্য আরম্ভ করাই উচিত।

গীতায় কখনও সম্পূর্ণরূপে কর্মত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য কিছু কিছু কার্য প্রত্যেককে করিতে হইবে।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে-ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥—গীতা ৩।৮

—তুমি নিয়ত (শাস্ত্রবিহিত অর্থাৎ নিজের ও সমাজের পক্ষে হিতকর) কার্য কর। অকর্ম অপেক্ষা কর্মই ভাল। অকর্মের দ্বারা তোমার শরীর রক্ষাও হইবে না।—গীতা ৩।৮

অতএব শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য যে যে কার্য করা আবশ্যক, অপরাবিদ্যার প্রয়োগের দ্বারা তাহা করিতে হইবে। যাহার সহায় সম্বল আছে, সাধনাশ্রমে সাধনার কার্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য হইবে। কিন্তু যাহার তাহা নাই, তাহার পক্ষে অন্যের গলগ্রহ না হইয়া নিজের জীবনধারণের জন্য সদুপায়ে কিছু কিছু অর্থোপার্জনও আবশ্যক হইতে পারে।

২। সাধনাশ্রমে পরাবিদ্যার অনুশীলন।

বাল্যকাল হইতেই প্রত্যেক বালকবালিকার পক্ষে পরাবিদ্যার শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কারণ

বিদ্যাশ্রমে যে যত প্রকার বিদ্যাশিক্ষাই করুক না কেন, পরাবিদ্যার শিক্ষা ও অনুশীলন ব্যতীত তাহার শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য যত অধিক সময় দেওয়া আবশ্যক হয়, পরাবিদ্যা-শিক্ষার জন্য তত সময় দেওয়া আবশ্যক হয় না। তাহা হইলেও, ইহার অনুশীলন দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যক হয়। কেবল পরাবিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই প্রত্যেক বালকবালিকার জীবন সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে।

জনসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে বিভিন্ন লোককে প্রধানতঃ তাহাদের স্বভাব, শিক্ষা প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কার্য করিতে হয় এবং এই প্রকার কার্যে তাহাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই প্রকার কার্যের ভিতর দিয়াও পরাবিদ্যার অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। কারণ কেবল তাহা হইলেই তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠা সম্ভব হইবে।

বিদ্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকাংশ লোকের জীবন যদি ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শে গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের জনসমাজও একটি সুন্দর রূপ ধারণ করিবে।

সাধনাশ্রমে পরাবিদ্যার অনুশীলনই প্রধানকার্য হইবে এবং দৈনন্দিন জীবনের অনেক সময় এই কার্যে নিয়োজিত করিতে হইবে।

(ক) আত্মসংযম ঃ—

যাহারা বিদ্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে কতকটা সংযম অভ্যাস করিয়াছে, সাধনাশ্রমে অপেক্ষাকৃত কঠোর আত্মসংযম তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইবে না। কঠোর আত্মসংযমকেই তপস্যার নামান্তর বলা যাইতে পারে এবং ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার ভিত্তি বলিয়া, গীতায় পুনঃ পুনঃ আত্মসংযমের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

—গীতা ১৬৷২১

—কাম (বা কামনা), ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের (অর্থাৎ মানুষের দুঃখকষ্টের) দ্বারস্বরূপ। ইহারা আত্মার স্থায়ী সুখশান্তির বিনাশকারী। অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবে।—১৬।২১

বিদ্যাশ্রমে বালকবালিকাগণের মনে নানাপ্রকার কামনার উদয় হয় এবং ইহাদের সংযততৃপ্তিসাধনের কিছু কিছু সুযোগ তাহারা পায়। গার্হস্থ্যাশ্রমে অনেকেই উপার্জনক্ষম বলিয়া, গৃহী ও গৃহিণীগণও তাহাদের সঙ্গত কামনাসমূহের সংযত তৃপ্তিসাধনের জন্য আরও বেশী সুযোগ পায়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ, তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছে যে ইহার দ্বারা তাহারা স্থায়ী সুখশান্তির বা স্থির ও নির্মল আনন্দের অধিকারী হইতে পারে নাই।

সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥—গীতা ৫।২২

—নানাপ্রকার (পার্থিব) দ্রব্য ও বিষয়ের সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মনের সংযোগ হইতে যে সমস্ত সুখ জন্মে, তাহাদের হইতে দুঃখও জন্মে। তাহাদের আদি ও অন্ত উভয়ই আছে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত বা মুগ্ধ হন না।—৫।২২

সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখের আদি ও অন্ত আছে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে ইহা আবার নানাপ্রকার দুঃখকষ্টের কারণ হয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা যে পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করি, তাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই সুখগুলি স্থায়ী সুখ নহে। নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লোকে জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধন করে। কিন্তু পর্যাপ্ত আহারের পর তাহার আর আহার করিবার ইচ্ছা থাকে না এবং আহার করিবার সময় জিহ্বার যে সুখ সে পাইতেছিল, তাহাও সে আর পায় না। যদি কোন লোভী ব্যক্তি কেবল তাহার জিহ্বার সুখের জন্য তাহার শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর খাদ্য ভক্ষণ করে, অথবা যখন তখন অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করে,

সে তাহার নিজের রোগকে ডাকিয়া আনে এবং এই জন্য তাহার নিজের ও তাহার গৃহের অন্যান্য লোকেরও দুর্ভোগ ঘটে। যাত্রা, থিঅ্যাটার, সবাক চলচ্চিত্র, নাচগান প্রভৃতি একসঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের সুখদায়ক হয়। কিন্তু যতক্ষণ এইগুলি চলিতে থাকে, সুখ ততক্ষণ স্থায়ী হয়। বিরামহীনভাবে এইগুলি চলিতে থাকিলে, ইহারা আবার তেমন সুখকর মনে হয় না। কেহ যদি আবার এই-গুলিতে অত্যধিক আসক্ত হইয়া অর্থের অপব্যয় করে ও অন্যান্য কর্তব্য-পালনে অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের অন্যান্য লোকের দুর্ভোগ ঘটিতে পারে। অতএব সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখই অস্থায়ী এবং অসংযত হইলেই ইহা হইতে নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট আসিতে পারে ও অনেক সময় আসে।

আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যও আমাদের নিকট বিশেষ সুখদায়ক হয়। কিন্তু এই প্রকার সুখও স্থায়ী সুখ নহে। মানুষের স্থূলদেহ ধ্বংসশীল বলিয়া যে কোন সময়ে যে কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিতে পারে। তখন মনোমধ্যে গভীর দুঃখ সুখের স্থান অধিকার করে। নানা কারণে কখন কখন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মনোমালিন্য হইতে বিচ্ছেদও ঘটে এবং তখনও মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় ও চলিতে থাকে।

পদমর্যাদার হ্রাস বা বিলুপ্তি এবং অর্থনাশ প্রভৃতিও যে কোনসময় ঘটিতে পারে, এবং তাহা হইতেও দুঃখ উপস্থিত হয়।

সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে যে সর্বপ্রকার সংস্পর্শজ সুখ (অর্থাৎ নানাপ্রকার পার্থিব দ্রব্য ও বিষয়ের সহিত এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের সংস্পর্শ বা যোগ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা) হইতে পরে দুঃখকষ্টও জন্মে সুতরাং কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত বা মুগ্ধ হন না।

কিন্তু উল্লিখিত প্রকারের সাময়িক সুখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ শান্তি লাভের বা স্থির ও নির্মল আনন্দ লাভের অন্য কোন উপায় আছে কি? হাঁ, ইহার উপায় নিশ্চয়ই আছে। এই উপায় কী, তাহার

শিক্ষাই গীতার প্রধান শিক্ষা এবং অন্ততঃ সাধনাশ্রমে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ ইহাই ইহলোক ও পরলোকে সর্ব প্রকার দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরা সুরাঃ।—গীতা ১৬।৭

—যাহারা আসুরিক ভাবাপন্ন লোক তাহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ভেদজ্ঞান নাই (অর্থাৎ কি প্রকার কার্যে কতদূর পর্যন্ত প্রবৃত্ত থাকা যাইতে পারে এবং কোথায় ওই কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা তাহারা জানে না. সুতরাং তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করে। তাহারা অন্যান্য লোকেরও দুঃখকষ্ট ঘটায়।)

প্রত্যেক লোকের সম্মুখে প্রবৃত্তিমার্গ (অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথ) ও নিবৃত্তিমার্গ (অর্থাৎ নিবৃত্তির পথ) এই দুইটি পথ রহিয়াছে। বিদ্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এই দুইটি পথের মধ্যস্থলে যে মধ্যপন্থা রহিয়াছে, তাহা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিচক্ষণ গার্হস্থ্যাশ্রমী পুরুষগণ ও স্ত্রীলোকগণ দেখিতে পান যে এই মধ্যপন্থাও স্থায়ী সুখ শান্তি লাভের পথ নহে। তখন স্থির ও নির্মল আনন্দ লাভের জন্য সাধনাশ্রম অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গের দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

নিম্নে অঙ্কিত তিনটি রেখার সাহায্যে ইহা সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

নিবৃত্তিমার্গ
(সর্বপ্রকার পার্থিব সুখ বর্জনের পথ) —— সাধনাশ্রম সন্ন্যাসাশ্রম

মধ্যপন্থা
(সুসংযতভাবে পার্থিব সুখ ভোগের পথ) —— বিদ্যাশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রম

প্রবৃত্তিমার্গ
(উচ্ছৃঙ্খলভাবে পার্থিব সুখ ভোগের পথ)

বিদ্যাশ্রমিগণকে যে ব্রহ্মচারিব্রত পালন করিতে হয়, সাধনাশ্রমীকে আবার সেই ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, সুতরাং গার্হস্থাশ্রমে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে যৌনসম্বন্ধ থাকে, সাধনাশ্রমে তাহা নিশ্চয়ই বর্জনীয় হইবে।

প্রশান্তাত্মা বিগত ভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্যমচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥—গীতা ৬।১৪

—প্রশান্তচিত্ত ও ভয়হীন হইয়া, ব্রহ্মচারিব্রত অবলম্বনপূর্বক, মনঃ সংযমের সহিত মনকে ঈশ্বরে স্থাপিত করিয়া ও ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া যোগী অবস্থান করিবেন।—গীতা ৬।১৪

অস্থায়ী ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া সাধনাশ্রমীকে নিম্নলিখিত ভাবে স্থির ও নির্মল আনন্দলাভের চেষ্টা করিতে হয়।

(১) দ্রষ্টার আনন্দ ঃ—

একজন সঙ্গতিসপন্ন গৃহস্থ প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। পূর্বে মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করিলেও এখন ঐ দিকে তাঁহার আর ঝোঁক নাই। তিনি এখন অত্যন্ত পরিমিতভাবে সাধারণ আহার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সামাজিক কাজকর্ম উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবগণের জন্য নানাপ্রকার উপাদেয় ও মুখরোচক খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অল্পদূরে বসিয়া তাহাদের মধ্যে ঠিকভাবে ঐ সমস্ত পরিবেশন করা হইতেছে কি না তাহা তিনি লক্ষ্য করেন। আহারের আনন্দ তিনি গ্রহণ না করিলেও, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আনন্দ দেখিয়া তিনি যে কম আনন্দিত হন, তাহা নহে। তিনি এখন ভোক্তার আসন পরিত্যাগ দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্যান্য লোকের আনন্দলাভে সহায়তা করিয়া এবং তাহাদের আনন্দ দেখিয়া যে আনন্দলাভ করা যায়, তাহা দ্রষ্টার আনন্দ এবং ইহাই উচ্চতর মানসিক আনন্দ।

চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত সকলে, দেশবাসী সকলে, পৃথিবীবাসী সকলে এবং বিশ্ববাসী সকলে সুখী হউক—এই প্রকার ইচ্ছা সাধনাশ্রমীকে

প্রত্যহ করিতে হইবে এবং কাহারও দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য যদি তাঁহার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হয়, তাঁহার পক্ষে তাহা করণীয় হইবে।

ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতি যে লীলা করিতেছে, চতুর্দিকে প্রকৃতির সেই লীলা দেখিয়া, অথবা বিরাট বিশ্বে প্রকৃতির লীলার বিবরণ পাঠ করিয়া যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাও দ্রষ্টার আনন্দ।

ঈশ্বর সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতং (গীতা ১৩।১৪—অর্থাৎ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই, সুতরাং তিনি কোন ইন্দ্রিয় সুখভোগ করেন না), তিনি উপদ্রষ্টা (গীতা ১৩।২২ অর্থাৎ তাঁহার প্রেরণায় বিরাট বিশ্বে প্রকৃতি যে কার্য করিয়া চলিয়াছে, তিনি নিকটে থাকিয়া তাহার দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিতেছেন), তাহা হইলেও তিনি সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ তাঁহার ভিতর কোন দুঃখের ভাব নাই, তাঁহার চিৎশক্তির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহার জীবাত্মা লাভ করিয়াছে ; এই জীবাত্মাও স্বরূপতঃ দ্রষ্টা। কিন্তু এই জীবাত্মার উপাধিরূপে তাহার দেহ, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি তাহাকে নানাপ্রকার সাময়িক ইন্দ্রিয়সুখে ও অন্যান্য প্রকার পার্থিব সুখে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহার ফলে সে নানাপ্রকার দুঃখকষ্টও ভোগ করিতেছে। সে যদি তাহার দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরূপ উপাধি বা আবরণ ভেদ করিয়া ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং নিজেকে জীবাত্মার স্বরূপে অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে সেও ঈশ্বরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে স্থির, নির্মল ও মৃদু আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। এই ভাবে ঈশ্বরের সারূপ্য লাভই সাধনাশ্রমীর প্রতিদিনের লক্ষ্য হইবে।

(২) আত্মিক আনন্দ :—

জীবাত্মা ঈশ্বরের সনাতন অংশ বলিয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে যে ভাবে স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব আছে, জীবাত্মার ভিতরও ঐ ভাবে স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঐ দিকে লক্ষ্য না দিয়া এবং ঐ আনন্দের ভাবকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য লালায়িত হয় এবং

নানাপ্রকার পার্থিব দ্রব্য, প্রাণী ও অন্যান্য মানুষকে তাহার সুখের জন্য অবলম্বন করে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥—গীতা ৩।১৭

—যিনি তাঁহার আত্মা হইতেই আনন্দলাভ করেন এবং তাহাতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার অন্য কোন করণীয় কার্য থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥—গীতা ৩।১৮

—এই প্রকার মানুষের কোন কার্য করিবার প্রয়োজন থাকে না, কার্য হইতে বিরত থাকাও তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয় না; সমস্ত প্রাণী অপ্রাণীর মধ্যে এমন কেহ বা কিছু নাই যাহাকে অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে (অর্থাৎ তিনি কেবল ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং কেবল নিজের শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু খাদ্য প্রভৃতি গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা অনাসক্তভাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার সুখ অন্য কোন মানুষ বা জিনিসের উপর নির্ভর করে না।)

বাহ্যস্পর্শেস্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ —গীতা ৫ ২১

—(বহির্জগতের) সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের (অর্থাৎ প্রাণী অপ্রাণীর) প্রতি আসক্তিহীন হইয়া, যোগী তাঁহার আত্মা হইতে যে সুখলাভ করেন, ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মাকে যুক্ত করিতে পারিলে, তাঁহার সেই সুখ অক্ষয় হইয়া যায়।

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৫।২৬

—সর্বপ্রকার কামনা ও ক্রোধ হইতে মুক্ত, সংযতচিত্ত ও আত্মজ্ঞ মুনিগণ উভয় স্থানেই (অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে) মুক্তিলাভের যোগ্য হন (অর্থাৎ কেবল পরলোকে নহে ইহলোকে জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

(৩) নিষ্কামকর্মের আনন্দ :—

মানুষ সাধারণতঃ সকাম কর্ম (অর্থাৎ নিজের ও পুত্রকন্যা বা অন্য নিকট আত্মীয়গণের স্বচ্ছন্দজীবনধারণের জন্য নানাপ্রকার কামনা লইয়া কাজ) করে। কিছু যাহারা বিদ্যাশ্রমে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে কিছু কিছু নিষ্কাম কর্ম করিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে যে নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়াও নির্মল আনন্দ লাভ করা যায়। সুতরাং নিজের জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু সকাম কর্ম আবশ্যক এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যে ঈশ্বরধ্যান ও স্বাধ্যায় (উপনিষদ পাঠ বা গীতাপাঠ) প্রভৃতি আবশ্যক তাহা ব্যতীত নিষ্কাম কর্মের জন্যও কিছু সময় দেওয়া সমাজবাসী সাধনাশ্রমীর কর্তব্য হইবে।

কঠোর আত্মসংযমের দ্বারা গীতার ৫।২২ শ্লোকে উল্লিখিত সর্ব-প্রকার সংস্পর্শজ সুখ যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া (১) দ্রষ্টার আনন্দ, (২) আত্মিক আনন্দ, ও (৩) নিষ্কাম কর্মের আনন্দ লাভের জন্য সাধনাশ্রমীকে চেষ্টা করিতে হইবে।

(খ) সমদর্শন :—

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সুখে দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কোটি কোটি পশুপক্ষীরও এই প্রকার ইচ্ছা। মানুষ ও অন্যান্য জীবের এই প্রকার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করাই সঙ্গত। সেই জন্য সমস্ত মানুষকে সমানভাবে দেখিয়া তাহাদের কাহাকেও অযথা দৈহিক বা মানসিক কষ্ট না দেওয়াই আমাদের কর্তব্য। জীবজন্তু-গণকেও অযথা কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।

সমদর্শনের ভিত্তি ও কারণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পুনরায় পাঠ করিতে পারেন।

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥—গীতা ১২।১৩
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যোমদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥—গীতা ১২।১৪

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং—কোনপ্রাণীর প্রতি যোগীর কোন বিদ্বেষভাব থাকে না (কারণ সকলেই ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের আত্মা লাভ করিয়াছে এবং সকলেই সুখে থাকিতে চায়)।

মৈত্রঃ করুণ এব চ—যোগী সেই জন্য সবসময় সকলের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব ও দয়ার ভাব পোষণ করেন।

নির্মমো—তিনি কোন দ্রব্য বা জীবদেহকে নিজের মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না; কারণ এ সমস্তই বিনাশশীল।

নিরহঙ্কার—তিনি নিষ্কাম কর্মী, সুতরাং জনহিতকর কার্য করিতে থাকিলেও তিনি তাহার জন্য অহঙ্কার বোধ করেন না।

সমদুঃখসুখঃ—তাঁহার নিজের দুঃখ বা সুখের কারণ ঘটিলেও তাহার দ্বারা তাঁহার মনের সমতা নষ্ট হয় না।

ক্ষমী—তাঁহার প্রতি কেহ অন্যায় করিলেও, সে অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ করিতেছে ইহা মনে করিয়া, তিনি তাহাকে ক্ষমাই করেন।

সন্তুষ্ট সততং যোগী—যোগীর মনে সর্বদাই সন্তোষের ভাব বিরাজ করে।

যতাত্মা—তিনি তাঁহার মনকে সংযত করিয়াছেন।

দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—(ঈশ্বরে মনকে নিবিষ্ট করিয়া সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিবেন) এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া,

মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি—যিনি ঈশ্বরে মনোবুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন

মদ্ভক্ত—ও ঈশ্বর ভক্ত হইয়াছেন

স মে প্রিয়ঃ—তিনি ঈশ্বরের প্রিয় হন।

উল্লিখিত প্রকারের মানসিক অবস্থা লাভ করিবার জন্য সাধনা-শ্রমীকে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে।

(গ) প্রাত্যহিক ঈশ্বর ধ্যান ও যোগসাধনা :—

জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে পার্বতীর একটি প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিয়াছেন—

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরণ্যত্র মারুতঃ।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাসনে॥

—মন, শিব, শক্তি ও মরুত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে মনে করিয়া অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ 'এই তীর্থ, এই তীর্থ' বলিয়া ভ্রমণ করে। কিন্তু হে দেবি, যে মানুষ আত্মতীর্থ জানে না, সে কিরূপে মুক্তিলাভ করিবে?

ইহা দ্বারা তীর্থভ্রমণ যে নিষিদ্ধ হইল, তাহা নহে। তীর্থ ভ্রমণের উপকারিতা আছে; কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ভিতর ঈশ্বরের সনাতন অংশরূপে জীবাত্মা বর্তমান এবং সমস্ত জীবাত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত হইয়া সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্বত্র রহিয়াছেন ইহা মনে রাখিয়া যে কোন স্থানে থাকিয়া যোগসাধনা করা তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥—গীতা ৬।৫

—নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের উদ্ধার সাধন করিবে, নিজেকে অবসাদ-গ্রস্ত করিবে না। নিজেকেই নিজের বন্ধুর কার্য করিতে হইবে. তাহা না করিলে নিজেই নিজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।—গীতা ৬।৫

কিছু লোক আছে, যাহারা গুরুর অন্বেষণেও এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহারা যদি নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য আন্তরিকভাবে আগ্রহশীল না হয়, তাহা হইলে কোন গুরুর এমন ক্ষমতা নাই যে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। সুতরাং গীতার ৬।৫ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে মনে রাখিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে কি গুরুর আবশ্যকতা নাই এবং কোথায় আমরা প্রকৃত গুরু খুঁজিয়া পাইব? ইহার সহজ উত্তর এই যে গুরুর আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে এবং একবার কয়েক টাকা খরচ করিলেই উচ্চতম স্তরের একজন আধ্যাত্মিক চালককে ইহলোক ও পরলোকে গুরুরূপে ও চিরসঙ্গীরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

ভগবদ্গীতোপনিষদ্ যে কোন জীবিত গুরু অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ— ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবে। গীতা হিন্দুধর্মের উচ্চতম স্তরের গুরুসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং স্বর্গত ও জীবিত গুরুগণও এই গুরুর নিকট তাহাদের অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। গীতাগুরুর দ্বারা প্রতারিত হইবার কোন ভয় নাই এবং ইহার জন্য পরে আর অর্থব্যয়ও করিতে হয় না। সর্বদাই এই গুরুকে নিজগৃহে পাওয়া যায়।

আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি করিবার জন্য পূর্বে বলা হইত যে (১) শ্রবণ, (২) মনন ও (৩) নিদিধ্যাসন আবশ্যক। কিন্তু বর্তমান সময়ে পঠন শ্রবণের স্থান অধিকার করিয়াছে। গীতা প্রভৃতি পুস্তক ছাপা আকারে সহজেই পাওয়া যায়। যিনি সংস্কৃত জানেন না, তিনি সহজেই মাতৃভাষায় ইহার অনুবাদ পাঠ করিতে পারেন। কোন জীবিত গুরুর নিকট গিয়া গীতাপাঠ এখন আর শ্রবণ করিতে হয় না। কোন ব্যক্তি নিরক্ষর হইলে, তাহাকে অবশ্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গিয়া গীতাপাঠ শ্রবণ করিতে হইবে। যে কোন শিক্ষিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক প্রত্যহ গীতার কিয়দংশ পাঠ করিয়া ফেলিতে পারেন। এইভাবে বইটিকে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে।

কিন্তু কেবল পাঠ করিলেই হইবে না। এক একটি বিষয় লইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে। ইহাকেই মনন বলা হয়।

কিন্তু কেবল মননই যথেষ্ট নহে। ভালভাবে বিভিন্ন জিনিসগুলি বুঝিবার জন্য নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান বা গভীর চিন্তাও আবশ্যক হইবে।

এইভাবে গীতাকে গুরুরূপে সম্মুখে বা পার্শ্বে রাখিয়া অথবা গীতার শিক্ষাকে গুরুর শিক্ষারূপে মনে রাখিয়া ক্রমশঃ নিজের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। গীতার কোন বিষয় সহজবোধ্য না হইলে, ইহা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, অথবা অন্য কাহারও সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে।

যোগসাধনাই মানুষের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা; সেই জন্য গীতায় পুনঃ পুনঃ যোগসাধনার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী-তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুনঃ॥—গীতা ৬।৪৬

—হে অর্জুন, যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যোগী কর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও।—গীতা ৬।৪৬।

যোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার (১) হঠযোগ, ও (২) রাজযোগ। (১) হঠযোগে প্রধানতঃ শরীরের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। হঠযোগী নিজের শরীরকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আনিবার চেষ্টা করেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অথবা দিনের পর দিন ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন। কোন চিকিৎসক তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস বা নাড়ী চলিতেছে না দেখিয়া মনে করিবেন যে তিনি মৃত, কিন্তু হঠযোগী তাঁহার মানসিক শক্তির বলে সাময়িক-ভাবে তাঁহার দেহের ঐরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছেন; তিনি সুস্থাবস্থায় জীবিতই আছেন। হঠযোগে সিদ্ধ কোন যোগীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা করিতে হয় এবং ইহার জন্য বহু বৎসরের সাধনাও আবশ্যক হয়। কিন্তু হঠযোগের খুব বেশী আধ্যাত্মিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না এবং যে কোন সাধারণ লোক ইহা সহজে শিখিতেও পারে না।

হঠযোগে নানাপ্রকার যৌগিক আসনের শিক্ষা দেওয়া হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশের ব্যায়ামের জন্য বিভিন্নপ্রকার আসনের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনানুযায়ী কোন কোন আসনের সামান্য পরিবর্তন করিয়া কতকগুলি আসনকে যোগব্যায়াম নামে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যাশ্রমী বালকবালিকাগণ এবং গার্হস্থ্যাশ্রমী পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণও প্রত্যহ সামান্য কিছু সময় যোগব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারে। ইহার জন্য মনের একাগ্রতা এবং আহার প্রভৃতিতে সংযম আবশ্যক হয়। যোগব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে সুস্থ ও সবল, দৃঢ় ও কর্মক্ষম

রাখা যাইতে পারে এবং নানাপ্রকার রোগেরও উপশম করা যাইতে পারে। সুতরাং শারীরিক যন্ত্রণা ও কষ্ট নিবারণের জন্য ইহা অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়।

(২) গীতায় যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা রাজযোগ। ইহাতে প্রধানতঃ মনের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকিলে রাজযোগের সাধনাও চলে না। সেইজন্য রাজযোগেও শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

রাজযোগের একটি বহিরঙ্গ সাধনা ও একটি অন্তরঙ্গ বা নিগূঢ় সাধনা আছে। কোন জীবিত গুরুর সাহায্য ব্যতীত গীতাগুরুর নির্দেশ অনুসারে দিনের পর দিন কার্য করিয়া যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে মৃত্যু পর্যন্ত রাজযোগের বহিরঙ্গ সাধনা করিতে পারেন। ইহাই তাহাকে ইহলোক ও পরলোকে মুক্তির পথে বা স্থির ও নির্মল আনন্দলাভের পথে অগ্রগতি লাভে সাহায্য করিবে। কিন্তু রাজযোগের নিগূঢ় সাধনার জন্য তাহাকে জীবিত যোগীগুরুর সাহায্য লইতে হইবে।

বেদান্ত ধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ যোগসাধনা। যাহারা বিদ্যাশ্রমে (১) আত্মসংযম, (২) সমদর্শন, (৩) প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা, (৪) নিষ্কামকর্ম ও দান ও (৫) দৈবী-সম্পদলাভ— এই পঞ্চ সাধনার চেষ্টা করিয়াছে এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে উক্ত সাধনা ব্যতীত (৬) মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টাও করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সাধনাশ্রমে যোগসাধনা করা কষ্টকর হইবে না। এই যোগসাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনাশ্রমে যে সপ্তম সাধনা অত্যাবশ্যকভাবে করিতে হইবে, তাহা (৭) অনাসক্তির সাধনা। পার্থিব সমস্ত দ্রব্য, বিভিন্ন প্রাণী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির সহিত যে আসক্তির বন্ধন থাকে, সেই বন্ধন হইতে যতদূর সম্ভব নিজেকে মুক্ত করিতে এবং মনকে এই সমস্ত হইতে টানিয়া লইয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে হইবে। অনাসক্তভাবে যে নিষ্কাম কর্ম সাধনাশ্রমীর পক্ষে অন্যান্য লোকের জন্য করণীয় হইবে, বন্ধুবান্ধব

ও আত্মীয়স্বজনকে অবশ্য তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারিবে অর্থাৎ তাহাদের জন্যও নিষ্কাম কর্ম করা যাইতে পারিবে।

গীতায় যোগ শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ব্রাহ্মীস্থিতিকে সর্বপ্রকার সাধনার শেষ লক্ষ্যরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥—গীতা ৩।৩

—হে অর্জুন, ইহলোক দুই প্রকার (মুক্তির পথে) স্থিতির কথা আমাকর্তৃক পূর্বে বলা হইয়াছে—সাংখ্যমার্গ অবলম্বনকারিগণের জ্ঞান-যোগ এবং যোগিগণের কর্মযোগ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥—গীতা ২।৫৫

—যখন (পার্থিব দ্রব্য লাভের জন্য) সর্বপ্রকার মনোগত কামনা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে এবং নিজের আত্মা হইতেই নিজের আনন্দলাভ করে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। (অর্থাৎ কেবল তখন বলা যাইতে পারে যে তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইয়াছে এবং ইহা তাহার ভিতর স্থিরতা লাভ করিয়াছে)—গীতা ২।৫৫

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥—গীতা ২।৭১

—যখন কোন ব্যক্তি (পার্থিব দ্রব্য প্রভৃতির জন্য) সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া, কোন দ্রব্য বা জীবকে নিজের মনে না করিয়া এবং কোন বিষয়ে অহঙ্কার পোষণ না করিয়া বিচরণ করে, তখন সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে।—গীতা ২।৭১

২।৫৫ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, ২।৭১ শ্লোকে তাহারই অনেকটা পুনরুক্তি করিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক ২।৭২ শ্লোকে বলা হইয়াছে,

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি ॥—গীতা ২।৭২

—হে পার্থ, এই প্রকার অবস্থাকে ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি) বলে। এই প্রকার অবস্থা কেহ প্রাপ্ত হইলে, সে মোহগ্রস্ত হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া, সে ব্রহ্ম নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করে।—গীতা ২।৭২

মুক্তিলাভই বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গসাধনার চরম লক্ষ্য। জ্ঞানযোগের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতার কথা এবং কর্মযোগের অর্থাৎ ফলের প্রতি আসক্তিহীন কর্মের আবশ্যকতার কথা গীতায় যেমন বলা হইয়াছে, ঐভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আবশ্যকতার কথাও গীতায় মধ্যে মধ্যে বলা হইয়াছে।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীতা ১৪।২৬

—যিনি অব্যভিচারী (অর্থাৎ যাহা কখনও অন্যদিকে যায় না এইরূপ) ভক্তিযোগের দ্বারা আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সেবা করেন, তিনি (প্রকৃতিজাত সত্ত্বরজস্তমঃ) গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসারূপ্য লাভের যোগ্য হন।—গীতা ১৪।২৬

অতএব ব্রাহ্মীস্থিতি বা মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ও ভক্তিযোগ সমস্তই আবশ্যক। অন্ধভাবে কর্ম করিয়া যাওয়া অথবা অন্ধভাবে ভক্তি প্রদর্শন করা যে উচিত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, কর্মফল প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া ঐ জ্ঞানের উপর কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং ঈশ্বর জ্ঞানের সহিত ঈশ্বর ভক্তিকে যুক্ত করিতে হইবে।

রাজযোগের আবশ্যকতার কথাও বিশেষভাবে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। রাজযোগের সর্বপ্রধান অঙ্গ সমাধি এবং ইহার পূর্ববর্তী অঙ্গ ঈশ্বরধ্যান। সাধনাশ্রমে প্রত্যহ সকালে স্নানের পর ও মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে এবং সন্ধ্যায়—অন্ততঃ এই তিনটি সময় কিছুক্ষণ ঈশ্বরধ্যান করা অত্যাবশ্যক। অন্য সময় কাজের মধ্যে মধ্যেও ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইবে।

ধ্যান সম্বন্ধে গীতার ৬।১০ শ্লোক হইতে ৬।৩২ পর্যন্ত ২৩টি শ্লোকে

বলা হইয়াছে, "যোগী সর্বদা একাকী নির্জন স্থানে থাকিয়া, সংযতচিত্ত, কামনাশূন্য ও অপরিগ্রহ (অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য যাহা অত্যাবশ্যক তাহা ব্যতীত অন্যদ্রব্য গ্রহণ বর্জিত) হইয়া (পরমাত্মার সহিত) আত্মাকে যুক্ত করিবেন। (৬।১০) পবিত্রস্থানে প্রথমে কুশ, তাহার উপর মৃগব্যাঘ্রাদিচর্ম এবং তাহার উপর বস্ত্র বিছাইয়া, অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন নহে এইরূপ স্থির আসন প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির ক্রিয়াকে সংযত করিবেন এবং মনকে একাগ্র করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহা (ঈশ্বরে) যুক্ত করিবেন (৬।১১-১২)। প্রশান্তচিত্ত, ভয়হীন ও ব্রহ্মচারিব্রতাবলম্বী হইয়া, মস্তক, গ্রীবা (অর্থাৎ ঘাড়) ও শরীরকে সমসূত্রে (অর্থাৎ সোজা করিয়া) অচল ও স্থিরভাবে রাখিয়া অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল নাসিকার অগ্রভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনঃসংযমের সহিত ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন। (৬।১৩-১৪) যোগী সংযতচিত্ত হইয়া মনোবুদ্ধিকে সর্বদা এইভাবে ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া ঈশ্বরে স্থিতি ও নির্বাণরূপ শান্তিলাভ করেন (৬।১৫)।

যিনি অপরিমিত ভোজন করেন অথবা অনাহারে থাকেন, অত্যধিক নিদ্রা যান অথবা জাগিয়া থাকেন, তাঁহার ঠিকভাবে যোগ-সাধনা হয় না (৬।১৬)। যিনি নিয়মিতভাবে আহার-বিহার করেন, নিয়মিতভাবে কর্ম করেন, নিয়মিতভাবে জাগিয়া থাকেন ও নিদ্রা যান, তাঁহার যোগ দুঃখনাশক হয় (৬।১৭)। যখন কাহারও চিত্ত নিয়ন্ত্রিত ও সর্বপ্রকার কামনামুক্ত হইয়া আত্মায় অবস্থান করে, তখন তাঁহাকে যোগসাধনাকারী বলা হয় (৬।১৮)। বায়ুপ্রবাহহীন স্থানে যেমন প্রদীপের শিখা কোন দিকে বিচলিত না হইয়া একভাবে থাকে, যোগাভ্যাসকারী ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে উপমা বলিয়া জানিও (অর্থাৎ তাঁহারও মন অন্য কোন দিকে না গিয়া যেন অবিচলিতভাবে ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইয়া থাকে) ৬।১৯। যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয় (অর্থাৎ অন্য সর্বপ্রকার চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়), আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই সাধক সন্তোষলাভ

করে, বুদ্ধিদ্বারা বোধগম্য অতীন্দ্রিয় আত্যন্তিক সুখবোধ করে, যে অবস্থায় স্থিত হইলে আত্মতত্ত্ব হইতে আর বিচলিত হয় না, যাহা লাভ করিয়া অন্য কোন কিছুকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ মনে করে না, যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না, তাহাকে দুঃখের সহিত সংযোগহীন যোগাবস্থা বলিয়া জানিও; অবসাদহীন চিত্তের দ্বারা এই প্রকার যোগাভ্যাস নিশ্চয়ই করা উচিত (৬।২০-২৩)। সুখদায়ক বস্তুসমূহের চিন্তা হইতে জাত সর্বপ্রকার কামনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ধারণার দ্বারা স্থিরীকৃত বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে বিরত হইয়া, মনকে আত্মায় যুক্ত করিবে এবং অন্য কোন কিছুর চিন্তা করিবে না (৬।২৪-২৫)। চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে টানিয়া আনিয়া আত্মায় যুক্ত করিবে (৬।২৬)। রজোগুণের নিবৃত্তি হওয়ায় যোগী পাপহীন প্রশান্তচিত্ত, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া উত্তমসুখ লাভ করেন (৬।২৭)। মনকে সর্বদা ব্রহ্মে যুক্ত করিয়া ও নিষ্পাপ হইয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখপ্রাপ্ত হন (৬।২৮)। যোগী সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিজের আত্মাকে সমস্ত প্রাণী-অপ্রাণীতে এবং সমস্ত প্রাণী-অপ্রাণীর আত্মাকে নিজের আত্মায় দেখেন (৬।২৯)। যিনি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখেন এবং সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত দেখেন ঈশ্বর তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকেন এবং তিনিও ঈশ্বরের দৃষ্টিপথে থাকেন (৬।৩০)। ঈশ্বর সমস্ত প্রাণী-অপ্রাণীর ভিতর থাকিলেও যে যোগী ঈশ্বরের একত্ব ধারণায় স্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি সকল অবস্থার মধ্যে ঈশ্বরভাবেই অবস্থান করেন (৬।৩১)।

যিনি নিজের উপমা দ্বারা সুখ বা দুঃখকে সকলের মধ্যে সমানভাবে দেখেন, তিনি পরম যোগী (৬।৩২)।"

ধ্যানের জন্য মৃগচর্মাদিযুক্ত যে আসনের কথা বলা হইয়াছে তাহা অত্যাবশ্যক নহে। যে-কোন শুদ্ধ আসন হইলেই চলিবে। কিন্তু মাথা, ঘাড় ও শরীরকে সমসূত্রে রাখিয়া সোজা হইয়া বসা

অত্যাবশ্যক। স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকা যায় এইভাবে বসিতে হইবে, সুতরাং দুইটি পা'কে মুড়িয়া একটি পা'কে অন্য পায়ের উপর রাখিয়া কোলে দুইটি হাত রাখিতে হইবে। বহির্জগতের সমস্ত দ্রব্য এবং সমস্ত জীবদেহ—আত্মীয়স্বজনের দেহ ও অন্যান্য প্রাণীদেহ সমস্তই—ধ্বংসশীল, ইহাদের বিনশ্বরতার কথা চিন্তা করিয়া ইহাদের প্রতি আসক্তি হইতে মনকে মুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর সমস্ত জীবাত্মার পশ্চাতে ও ইহাদের সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত হইয়া এক ঈশ্বর সমস্ত বিশ্বে রহিয়াছেন এই চিন্তা করিতে হইবে। ঈশ্বর অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তিভাবে বিশ্বের সমস্ত প্রাণী-অপ্রাণীর ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এবং প্রকৃতির প্রেরণাদাতা ও নিয়ন্তারূপে কার্য করিতেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহাতে মনোবুদ্ধিকে স্থাপিত ও যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। এইভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া কয়েকবার ঈশ্বরধ্যান করিতে হইবে। (ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য এই পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সমদর্শন ও ঈশ্বরচিন্তা প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পুনরায় পাঠক পড়িতে পারেন)।

মন চঞ্চল বলিয়া প্রথম প্রথম অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন বহির্জগতের সকলের প্রতি ও সমস্ত দ্রব্যের প্রতি অনাসক্তির ভাব মনোমধ্যে দৃঢ় করিতে থাকিলে এবং ঈশ্বরে মনকে স্থাপিত ও যুক্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে থাকিলে ঈশ্বরধ্যান ক্রমশঃ সহজ হইবে। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"—অভ্যাস ও বৈরাগ্য (অর্থাৎ অনাসক্তির) দ্বারা মনকে আত্মায় ও ঈশ্বরে যুক্ত করিয়া রাখা যায় (৬।৩৫)।

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরে মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে আত্মিক আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। তখন কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যের সাহায্যে সংস্পর্শজ সুখলাভ করা আবশ্যক হয় না। পার্থিব সুখের পরিবর্তে এই আত্মিক আনন্দলাভের জন্য চেষ্টা করিবার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

প্রাণায়াম ও সমাধি পরিপূর্ণ যোগের অঙ্গ। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণশক্তির সংযম বা নিয়ন্ত্রণ। আমাদের শরীরে প্রাণশক্তি কাজ করিতেছে ও আমাদের দুইটি ফুসফুসকে চালিত করিতেছে। আমরা বাহির হইতে বায়ু টানিয়া লইয়া নিশ্বাস গ্রহণ করি এবং এই বায়ু বাহির করিয়া দিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করি। নিশ্বাস গ্রহণকে পূরক, প্রশ্বাস ত্যাগকে রেচক ও বায়ুকে ফুসফুসের ভিতর ধরিয়া রাখাকে কুম্ভক বলা হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শরীরস্থ প্রাণ-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। সেইজন্য পূর্ণ যোগী হইতে গেলে প্রাণায়াম শিক্ষা করা আবশ্যক। হঠযোগী ও রাজযোগী উভয় প্রকার যোগীকেই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। বিদ্যাশ্রম হইতেই প্রাণায়াম আরম্ভ করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রাণায়ামে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা না করিয়া নিজে নিজে প্রাণায়াম করা ভাল নহে, কারণ ইহাতে শরীরের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু নিম্নলিখিত নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম নিজে নিজে করা যাইতে পারে। কোন বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত স্থানে সোজা হইয়া বসিয়া আস্তে আস্তে তালে তালে দুই নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ সময় এক দুই তিন চার প্রভৃতি গণনা করা যাইতে পারে। বায়ুকে ফুসফুসে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া আস্তে আস্তে তালে তালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের সময় বাড়ান যাইতে পারে। বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা ফুসফুস দুইটিকে পূর্ণ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে এবং ঐ সময় পেটটিকে ভিতর দিকে টানিয়া লইতে হইবে। প্রত্যহ সকালে ২০।২৫ বার এবং সন্ধ্যায় ২০।২৫ বার এই প্রকার ব্যায়াম করা যাইতে পারে এবং ইহা আজীবন চলিতে পারে। শরীরকে সুস্থ রাখিবার পক্ষে ইহা সহায়ক হইবে। এই ব্যায়ামের সময় ঈশ্বর চিন্তাও করা যাইতে পারে।

সমাধি যোগের উচ্চতম অঙ্গ। ইহা ধ্যানের পরবর্তী অবস্থা। কিন্তু কোন যোগীগুরুর নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক।

যোগদর্শনে চিত্তের (অর্থাৎ মন, অহংবোধ ও বুদ্ধির) সমস্ত বৃত্তির (অর্থাৎ ক্রিয়ার) নিরোধকে যোগ বলা হইয়াছে। তাহার পর বলা হইয়াছে যে তখন (অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধের পর) দ্রষ্টা (অর্থাৎ জীবাত্মা) নিজের প্রকৃত রূপে অবস্থান করেন। এই অবস্থাই সমাধির অবস্থা। স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আমাদের মন ও বুদ্ধি যেভাবে কার্য করে সমাধিস্থ অবস্থায় তাহারা সেভাবে কার্য করে না। এমনকি অহংবোধও তখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা নিদ্রার অবস্থা নহে। বরং ইহাকে উচ্চতর জাগরণের অবস্থা বলা যাইতে পারে। বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এবং সমস্ত মানুষের ভিতর যে একই আত্মা বিরাজমান, যোগী সমাধিস্থ অবস্থায় সাক্ষাৎভাবে তাহা উপলব্ধি করেন এবং স্থির আনন্দও লাভ করেন।

আমাদের মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুসমূহ নির্গত হইয়া শরীরের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। শরীরের কোন স্থানে মশা কামড়াইলে বা কাঁটা ফুটিলে বা কাটিয়া গেলে আমরা তাহা স্নায়ুগুলির সাহায্যে বুঝিতে পারি। যোগিগণ শরীরের স্নায়বিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের বশে আনিবার চেষ্টা করেন এবং যোগীগুরুর সাহায্যে বহুবৎসরের সাধনা দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। তাঁহারা বলেন যে আমাদের শরীরে মলদ্বারের কিছু ঊর্ধ্বে একটি স্নায়ুজাল আছে। ইহাকে মূলাধার চক্র বলা হয়। ইহার ভিতর কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্তভাবে থাকে। যদি কোন যোগী এই স্নায়বিক শক্তিকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নানাপ্রকার অসাধারণ শক্তির অধিকারী হন; ইহাকে যোগবিভূতি বলা হয়। কোন কোন যোগী অন্য লোকের মনের কথা জানিতে পারেন, তাঁহাদের দূরদর্শন ও দূরশ্রবণের ক্ষমতা লাভ হয়, কেহ কেহ স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহে বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত দূরদেশে গমন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নিজেকে সেখানে প্রকাশিত করিতে পারেন। কেহ কেহ নিজ শক্তির দ্বারা কোন কোন রোগীকে

রোগমুক্ত করিতে পারেন ইত্যাদি। যোগিগণের জীবনবৃত্তান্তে তাঁহাদের নানাপ্রকার অসাধারণ শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের এই সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ শক্তি এবং সর্বজ্ঞত্ব লাভ কোন যোগীর পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না। যে কোন ব্যক্তির পক্ষে অসাধারণ যৌগিক শক্তিলাভ সম্ভব নহে। যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন কোন কোন ব্যক্তি যোগসাধনা দ্বারা অসাধারণ শক্তিলাভে সমর্থ হইলে. কেবল তাঁহাদের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তির প্রকৃত তথ্য জানা যাইতে পারিবে। অলৌকিক শক্তিলাভ কিন্তু যোগসাধনের প্রকৃত লক্ষ্য নহে। নৈতিক উৎকর্ষলাভ এবং ব্রাহ্মীস্থিতি (অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি) দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে স্থির, নির্মল ও শাশ্বত আনন্দলাভ (অর্থাৎ মুক্তিলাভই) যোগসাধনার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনাশ্রমীরও ঐ একই প্রকার লক্ষ্য হইবে। যদি কেহ নিগূঢ় যোগসাধনার যোগ্য হন এবং যোগের যে অন্তরঙ্গ বা নিগূঢ় সাধনা আছে কোন যোগী-গুরুর সাহায্যে তাহা অভ্যাস করিবার সুযোগ পান, তিনি ঐ নিগূঢ় সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোক সাধনাশ্রমীকে গভীর ধ্যান ও অনাসক্তির ভিতর দিয়া ব্রাহ্মীস্থিতি বা ঈশ্বরসারূপ্য (অর্থাৎ ঈশ্বরের যে সচ্চিদানন্দ ও নির্বিকার দ্রষ্টার রূপ আছে সেইরূপ) লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এইভাবে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

সাধনাশ্রমীকে কি প্রকার হইতে হইবে তাহা পুনরায় গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭-১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে।

অমানিত্ব (নিজেকে বেশী মাননীয় মনে না করা), অদম্ভিত্ব (দম্ভ-হীনতা), অহিংসা (কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া), ক্ষান্তি (প্রতিশোধ না লইবার মনোভাব), আর্জব (সরলতা), আচার্যোপাসন (আচার্যের সেবা), শৌচ (দেহ বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা বা বাহ্যশৌচ এবং মনের পবিত্রতা বা অন্তঃশৌচ), স্থৈর্য (স্থিরভাব) আত্মবিনিগ্রহ (কঠোর আত্মসংযম), ইন্দ্রিয়ার্থসমূহে বৈরাগ্য (ইন্দ্রিয়

গ্রাহ্য বিষয়সমূহে আসক্তিহীনতা), অনহঙ্কার (অহঙ্কারশূন্যতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন (জন্ম, রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু হইতে পৃথিবীতে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় সেই সম্বন্ধে মনে মনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা), পুত্রদার গৃহাদিতে অসক্তি (স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে আসক্তিহীনতা) ও অনভিষঙ্গ (তাহাদের সুখদুঃখে অভিভূত না হওয়া), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিতে নিত্যসমচিত্তত্ব (ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহাই ঘটুক না কেন, সর্বদা মনের সমভাব), ঈশ্বরে অনন্যযোগের সহিত (একমাত্র ঈশ্বরে মনকে যুক্ত করিয়া) অব্যভিচারিণী ভক্তি (তাঁহাতে অচলাভক্তি), বিবিক্তসেবিত্ব (নির্জনস্থানে বাস), জনসংসদে (জনসভায়) অরতি (অনুরাগহীনতা), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব (সর্বদা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মুক্তির চিন্তা)—এই সমস্তই প্রকৃতজ্ঞান, যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান। গীতা ১৩।৭-১১

স্ত্রীপুত্রাদি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই নহে যে সাধনাশ্রমী স্ত্রীপুত্রকন্যা, অন্যান্যআত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবগণের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য কোন কিছু করিতে পারিবেন না। সমাজবাসী ব্যক্তি হিসাবে অন্যের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য যদি তিনি কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাহা করণীয় হইবে। কিন্তু তাঁহাকে এই কার্য অনাসক্তভাবে ও মনের সমভাব রক্ষা করিয়া করিতে হইবে। ইহা তাঁহার নিষ্কাম কর্মের অঙ্গ হইবে।

উপরে গীতার ১৩।৭-১১ শ্লোকের যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে সাধনাশ্রমীর পক্ষে নিজের মনকে আত্মজ্ঞানে ও ঈশ্বরজ্ঞানে যেমন নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক, মনের মধ্যে ঈশ্বরভক্তির গভীরতা ঐভাবে আবশ্যক। ঈশ্বরভক্তি ঈশ্বরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় যোগস্থাপন করিয়া দেয়। সেইজন্য গীতায় ঈশ্বরজ্ঞানের সহিত ঈশ্বরভক্তিরও আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে।

কিছু লোক আছে যাহারা বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ। তাহারা

প্রধানতঃ ভক্তির দ্বারা চালিত হয় এবং কখন কখন ভক্তির আবেগে নৃত্যাদিও করে। কখন কখন তাহাদের ভাবাবেশও ঘটে ও তাহারা সংজ্ঞাহীন হয়।

বেদান্তধর্মে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটিরই আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু কর্ম ও ভক্তিকে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, সেইজন্য বেদান্তধর্মে জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। গীতায় বলা হইয়াছে—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥—গীতা ৪।৩৮

—এই জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই; যোগসিদ্ধ ব্যক্তি কালক্রমে নিজ আত্মায় এই জ্ঞান লাভ করেন।—গীতা ৪।৩৮

যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় বলিয়া যোগীকে আবার জ্ঞানী অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে।

"যোগী তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব যোগী হও।"—গীতা ৬।৪৬

সুতরাং সাধনাশ্রমিগণকে প্রধানতঃ যোগী হইতে হইবে। যোগের নিগূঢ় সাধনার জন্য যোগীগুরু আবশ্যক হয়। কিন্তু কেবল গীতাগুরুর সাহায্যে যোগের অত্যাবশ্যক বহিরঙ্গ সাধনা যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক করিতে পারেন। কঠোর আত্মসংযম, সমদর্শন, নিষ্কামকর্ম, দৈবীসম্পদ লাভের চেষ্টা, মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা, অনাসক্তি ও ঈশ্বরধ্যান, এইগুলিকে যোগের বহিরঙ্গ সাধনা বলা যাইতে পারে। এইগুলি অভ্যাস করিবার জন্য গীতাগুরু ব্যতীত অন্য কোন গুরু আবশ্যক হয় না।

(ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান:—

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে—গীতা ৫।১১

—ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগিগণ কর্ম করেন।—গীতা ৫।১১

বিদ্যাশ্রমিগণ ও গার্হস্থ্যাশ্রমিগণ যে কার্য করে, তাহা প্রধানতঃ

সকাম কর্ম। কিন্তু তাহাদেরও যে কিছু কিছু নিষ্কাম কর্ম করা উচিত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাধনাশ্রমিগণের প্রধান কার্য হইবে যোগসাধনা এবং ইহাতেই অধিকাংশ সময় নিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু সমাজবাসী সমস্ত মানুষ প্রত্যেক সাধনাশ্রমীর নিজেরই অনুরূপ, ইহা মনে রাখিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু কিছু নিষ্কামকর্ম প্রত্যেক সাধনাশ্রমীর করা উচিত। চিত্তশুদ্ধির জন্য, চিত্তের প্রসারতা জন্য, ঈশ্বরের সনাতন অংশরূপে সমস্ত মানুষই তাহার নিজেরই অনুরূপ এবং জনসেবা দ্বারা সাধনাশ্রমী ঈশ্বরের পূজা করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া প্রত্যেক সাধনাশ্রমীকে কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিছু কিছু সমাজহিতকর কার্য করিতে হইবে। এই প্রকার কার্যের কথা গীতায় বলা হইয়াছে এবং ইহা সাধনাশ্রমীর কর্মযোগের অঙ্গ হইবে।

অতএব সাধনাশ্রমীর জীবনে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ (অর্থাৎ ঈশ্বরধ্যান প্রভৃতি) সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিবে।

সাধনাশ্রমীর পক্ষে দ্রব্যদান ও অর্থদল সাধারণতঃ সম্ভব হইবে না। কিন্তু সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু সময় এবং কিছু শ্রমদান করা দুঃসাধ্য হইবে না। জনহিতকর কার্যের জন্য অন্যকে উৎসাহদান এবং অন্যান্য লোককে সুশিক্ষা দানও দানের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইবে।

(ঙ) দৈবী সম্পদ রক্ষা করিবার চেষ্টা :—

কতকগুলি উত্তম গুণকে দৈবী সম্পদ বলা হয়। এবং বিদ্যাশ্রম ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এইগুলিকে অর্জন করিবার চেষ্টা করিতে হয়—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সাধনাশ্রমে এইগুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কি প্রকার দোষসমূহকে আসুরিক দোষ বলা হয়, তাহাও দৈবীসম্পদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এই আসুরিক দোষগুলি যাহাতে স্বভাবের মধ্যে না আসে তাহার জন্যেও সাধনাশ্রমীকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

(চ) মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা :—

অনুকূল অবস্থা ঘটিলে অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়া এবং প্রতিকূল

অবস্থা ঘটিলে অত্যধিক বিষণ্ণ হওয়া উচিত নহে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (গীতা ২।৪৮)—(সর্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে) মনের সমভাব রক্ষা করিবার চেষ্টা যোগের অঙ্গ।—গীতা ২।৪৮

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকোন্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়॥—গীতা ১২।১৫

—যাঁহার নিকট হইতে কোন লোক উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না, এবং যিনি কোন কোন লোকের নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ (অত্যধিক উৎফুল্ল ভাব), অমর্ষ (ক্রোধ), ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি ঈশ্বরের প্রিয়।—গীতা ১।২১৫

সাধনাশ্রমী সর্বজন হিতৈষী, সুতরাং কোন লোক তাঁহার নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং তিনিও কোন লোকের নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না। কোন কিছুতেই তিনি অত্যধিক উৎফুল্ল হন না এবং অন্যের ত্রুটিতে তিনি ক্রোধী বা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন না। তিনি কোনপ্রকার অন্যায় কার্য করেন না বলিয়া তাঁহার মন সর্বদা ভয়মুক্ত ও উদ্বেগমুক্ত অবস্থায় থাকে। এই কারণগুলি মনের সমভাব রক্ষা করিবার পক্ষে সাধনাশ্রমীর সহায়ক হয়।

(ছ) অনাসক্তি :—

বিদ্যাশ্রমে (১) আত্মসংযম, (২) সমদর্শন, (৩) প্রাত্যহিক ঈশ্বর-চিন্তা, (৪) নিষ্কামকর্ম ও দান, এবং (৫) দৈবী সম্পদলাভের চেষ্টা—এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্য-শ্রমে এই পাঁচটি সাধনার সহিত ৬ষ্ঠ সাধনারূপে মনের "সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টাকে যুক্ত করিতে বলা হইয়াছে। সাধনাশ্রমে আবার ৭ম সাধনারূপে "অনাসক্তি"কে যুক্ত করিতে হইবে।

যে যোগসাধনা সাধনাশ্রমীর পক্ষে অত্যাবশ্যক, অনাসক্তি ব্যতীত তাহাতে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। মনের মধ্যে অনাসক্তির ভাব আনিতে হইলে দুই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সমস্ত পার্থিব দ্রব্য, সমস্ত প্রাণীদেহ এবং ক্লেদময় সমস্ত নরনারীদেহ ধ্বংসশীল। যে

কোন সময় ইহাদের কোনটির বিনাশ ঘটিতে পারে; সুতরাং ইহারা যে সবসময় সুখদায়ক হইয়া রহিবে তাহা সম্ভব নহে। সুখে জীবনধারণের যে প্রকার অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্যাদি আবশ্যক, তাহা অনেকেই লাভ করিতে পারে না। ইহার উপর নানাপ্রকার রোগ এবং বার্ধক্যে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং পৃথিবী সম্পূর্ণ সুখের স্থান নহে। বিচক্ষণতার সহিত সংযতভাবে সুপথে চলিলে, দুঃখ অপেক্ষা সুখের আধিক্য ঘটিতে পারে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে কুপথে চলিলে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সাধনাশ্রমীকে মনে রাখিতে হইবে যে তাহার নিজেরও মৃত্যু অনিবার্য, এবং যে সমস্ত পার্থিব দ্রব্য ও বিষয় হইতে এবং যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য হইতে সে কিছু কিছু সাময়িক সুখ লাভ করে, সে তাহাদের কোন কিছুকে বা কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং ইহাদের উপর সুখের জন্যে নির্ভর না করিয়া ইহাদের প্রতি অনাসক্তির ভাব মনোমধ্যে আনিতে হইবে। তাহার পর নিজের স্বরূপ চিন্তা করিয়া নিজ আত্মায় ও ঈশ্বরে মনকে স্থাপিত ও যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

স্থির ও নির্মল আনন্দলাভের জন্যে তিনটি উপায়ের কথা এই অধ্যায়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

(১) দ্রষ্টার আনন্দ

(২) আত্মিক আনন্দ

(৩) নিষ্কাম কর্মের আনন্দ

সাধনাশ্রমীকে যতদূর সম্ভব ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিতে হইবে এবং উল্লিখিত তিন প্রকারের স্থির ও নির্মল আনন্দলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহলোকে এই তিনভাবে আনন্দলাভে অভ্যস্ত হইলে, সাধনাশ্রমী যখন পরলোকে সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মারূপে অবস্থান করিবেন, তখন সেখানেও তাঁহার কোনরূপ দুঃখকষ্ট থাকিবে না। ইহাই ইহলোক জীবন্মুক্তি ও পরলোকে পূর্ণমুক্তির পথ।

সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা :—

অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোককে নির্লিপ্তভাবে গৃহে থাকিয়া সাধনাশ্রমের সাধনাদি করিতে হইবে। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠারও আবশ্যকতা আছে। শহর অঞ্চলে ও পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে সাধনাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহা সমাজের পক্ষে হিতকর হইবে। এই আশ্রমসমূহ বেদান্ত ধর্মের অনুশীলনে এবং জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সহায়ক হইবে। আশ্রমের আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে দুই একজন বা ততোধিক সাধনাশ্রমী আশ্রমে থাকিবেন। গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মপুস্তক এই স্থানে থাকিবে এবং বেদান্তধর্মের আলোচনা প্রভৃতির জন্য নিকটবর্তী সাধনাশ্রমিগণ মধ্যে মধ্যে আশ্রমে সমবেত হইবেন। ধর্মানুরাগী অন্যান্য ব্যক্তিও আলোচনায় যোগদান করিতে পারিবেন।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥—গীতা ১৮।৭০

—যিনি আমাদের দুইজনের মধ্যে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে) আলোচিত ধর্মসম্বন্ধীয় এই বিবরণ পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) পূজা করিবেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চিত মত।—গীতা ১৮।৭০

বেদান্তিগণ যে সাধনাশ্রমে থাকিবেন, সেখানে গীতার অনুবাদ পাঠ, উপনিষদসমূহের অনুবাদ পাঠ ও বেদান্তধর্মের সমর্থক অন্যান্য পুস্তকপাঠ এবং ব্রাহ্মীস্থিতিলাভের জন্য ঈশ্বরধ্যান প্রভৃতি চলিবে। জ্ঞানযজ্ঞ ও যোগসাধনা সাধনাশ্রমিগণের প্রধান কার্য হইবে। কী প্রকার নিষ্কাম কর্ম সম্ভব হইবে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী কার্যও তাঁহারা করিতে পারেন। দ্রব্যময় যজ্ঞ ও মূর্তি-পূজা এই আশ্রমের উপযোগী হইবে না। জনসাধারণের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এই আশ্রমের মাধ্যমে হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মন্দির আছে এবং প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা ও অন্যান্য

দেবদেবীর পূজা মূর্তি বা অন্যপ্রকার প্রতীকের সাহায্যে করা হয়। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা যাঁহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে, তাঁহারা মন্দিরে গমন করিতে পারেন ও বাহ্যপূজাসমূহে যোগদান করিতে পারেন।

সমাজবাসী প্রত্যেককে জীবনধারণের জন্য সমাজের নিকট নানাভাবে ঋণী হইতে হয়। কিছু কিছু জনহিতকর নিষ্কাম কর্মের দ্বারা এই ঋণের অন্ততঃ কতকটা পরিশোধ করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসাশ্রমে গীতার শিক্ষা

ত্যাগযোগ

১। **অপরাবিদ্যা :—**

সম্ (পূর্বক)-নি (পূর্বক)-অস্ (ধাতু) হইতে সন্ন্যাস শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। নি (পূর্বক) অস্ (ধাতুর) অর্থ নিক্ষেপ করা বা ছুঁড়িয়া ফেলা। ইহার পূর্বে সম্ যুক্ত হইলে সম্যকরূপে সমস্ত কিছু ছুঁড়িয়া ফেলা অর্থ হইবে। যিনি সমস্ত জাগতিক দ্রব্য প্রভৃতিকে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া এবং মনকে আত্মায় ও ব্রহ্মে সমাহিত করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

কিন্তু সন্ন্যাসীও স্থূলদেহধারী মানুষ এবং স্থূলদেহকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতিজাত স্থূল খাদ্যদ্রব্য, জল প্রভৃতি তাঁহারও আবশ্যক হয় অরণ্যবাসী বা গুহাবাসী সন্ন্যাসী ফল, মূল, জল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন। কিন্তু লোকালয়বাসী বা সমাজবাসী সন্ন্যাসীকে কৃষিজাত খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে তাঁহার চিকিৎসাও আবশ্যক হয়।

সুতরাং সন্ন্যাসীকেও প্রয়োজনানুযায়ী অপরাবিদ্যার বা জাগতিক বিদ্যার সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু কোন কিছুর প্রতি তাঁহার আসক্তি থাকে না। সন্ন্যাস বা সর্বত্যাগ সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার।

২। **পরাবিদ্যা :—**

পরাবিদ্যার অনুশীলনই সন্ন্যাসীর জীবনের প্রধানকার্য। সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী ঈশ্বরনিষ্ঠ পুরুষ। কোন স্ত্রীলোকও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রাহ্মী স্থিতিলাভের জন্য সন্ন্যাসিনী হইতে পারেন। কারণ যোগসাধনার পথে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবার অধিকার জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই আছে। ইহা গীতাতেই

বলা হইয়াছে। কোন স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনী হইলে সন্ন্যাসিনীগণের জন্য নির্ধারিত কোন আশ্রমে বাস করাই বাঞ্ছনীয়। গীতায় ব্রহ্মনির্বাণ শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ২।৭২, ৫।২৪, ২৫, ২৬ শ্লোকে ব্রহ্মনির্বাণকেই আধ্যাত্মিক সাধনার চরম লক্ষ্যরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ৬।১৫ শ্লোকেও নির্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নির্বাণের অর্থ কী? বাংলায় আমরা বলি "আগুনটা নিবিয়া গিয়াছে বা প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে"। নির্বাণ শব্দের অর্থ "নিবিয়া গিয়াছে এইরূপ অবস্থা" এবং বাংলায় ব্যবহৃত "নিবিয়া যাওয়া" শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'নির্বাণ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গীতায় ৩।৩৯ শ্লোকে কাম বা কামনাকে দুষ্পূরণীয় অনলের (অর্থাৎ সর্বদা অতৃপ্ত আগুনের) সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আগুনে যত দাহ্য পদার্থ দেওয়া যাক না, তাহার যেমন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, সে যেমন আরও দাহ্য পদার্থ চায়, সেইরূপ মানুষের কামনারও কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না। সে সুন্দর পোশাক, সুন্দর ঘরবাড়ি, নিজের গাড়ি, পুরুষ হইলে সুন্দরী ও গুণবতী ভার্যা (স্ত্রীলোক হইলে ধনবান ও সুন্দর স্বামী), পুত্রকন্যা, বিষয় সম্পত্তি, লক্ষ লক্ষ টাকা, উচ্চ পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি চায়। যে লক্ষপতি হইয়াছে, সে কোটিপতি হইবার আকাঙ্ক্ষা করে এবং কোটিপতি হইবার পরও তাহার অর্থলোভের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কামনার কোন অন্ত নাই। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও তাহারা পৃথিবীতে পূর্ণ সুখশান্তি লাভ করিতে পারে কি? সাধারণভাবে ইহার উত্তর 'না'ই হইবে। উল্লিখিত দ্রব্যাদি তাহাদের পক্ষে সুখদায়ক হয় না এমন নহে। কিন্তু নানা কারণে নানাভাবে দুঃখ কষ্টও আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং পূর্ণ সুখ-শান্তি লাভ হয় না। তাহার পর প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য প্রভৃতি তাহাদের নিকট কতটা সুখকর হইয়াছিল তাহারা তাহাদের কোনটিই সঙ্গে লইয়া

যাইতে পারিবে না। তাহাদের মনে সুখকর দ্রব্যাদির প্রতি প্রবল আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। অথচ তাহাদের সূক্ষ্মদেহধারী আত্মা এইগুলির কোনটিই পরলোকে পাইবে না—ইহাতে তাহাদের মনে দুঃখকষ্ট ও অশান্তি চলিতেই থাকিবে।

ইহলোকে ও পরলোকে ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভের চেষ্টাই ইহার একমাত্র উপায়। অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মনে নানাপ্রকার কামনার আগুন বিভিন্নভাবে জ্বলিতেছে। কোন কামনার আগুন প্রবলভাবে, কোন কামনার আগুন মৃদুভাবে। কোন কামনার আগুন আরও ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। বিবিধ কামনার এই সমস্ত আগুনকে নিবাইয়া ফেলিতে হইবে এবং মনকে প্রথমতঃ আত্মায় ও পরে সর্বব্যাপী ব্রহ্মে ইহাকে স্থাপিত ও যুক্ত করিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মনির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে সমাহিত মনের সমস্ত কামনার অবসান। মনকে সমস্ত কামনা হইতে মুক্ত করিতে পারিলে জীবাত্মা তাহার স্বরূপে অবস্থান করে এবং আত্মার ভিতর যে স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব আছে, তখন তাহার বিকাশ ঘটে।

অতএব নির্বাণের অর্থ জীবাত্মার পৃথক ব্যক্তিত্বের লোপ নহে। ইহা মন হইতে সমস্ত কামনার বিলুপ্তি সাধন করিয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ও সেইভাবে থাকিয়া স্থায়ী ও মৃদু আনন্দ ও শান্তিলাভ।

বিশ্বে সূক্ষ্ম বা স্থূল যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের প্রেরণায় তাঁহার অচেতন শক্তি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইগুলি হইতে ব্রহ্মের নিজের কিছু লাভ হয় না। তাঁহার নিজের যে নির্বিকার সচ্চিদানন্দরূপ আছে, তাহা সব সময়ই বজায় থাকে। ব্রহ্মের কোনও ভোক্তার রূপ নাই; তাঁহার কেবল দ্রষ্টার ও সাধারণভাবে নিয়ন্তার রূপ আছে। জীবাত্মা ব্রহ্মের সনাতন বা চিরস্থায়ী অংশ। সেইজন্য জীবাত্মাও ধ্বংসশীল সমস্ত প্রাকৃতিক দ্রব্যকে ত্যাগ করিয়া ইহাদের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং ব্রহ্মের ন্যায় নির্বিকার সচ্চিদানন্দরূপ ধারণ করিতে পারে।

এই অবস্থায় জীবাত্মারও ভোক্তার রূপ থাকিবে না কিন্তু স্বেচ্ছাধীন ভাবে দ্রষ্টার রূপ থাকিবে। এই অবস্থাকে জীবাত্মার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ও নির্বাণলাভ বলা হয়। ইহাকে মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিও বলা হয়। গীতায় বলা হইয়াছে যে কোন জীবাত্মা এই অবস্থা লাভ করিলে তাহাকে পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম, ব্যাধি, জরা মৃত্যুর অধীন কিংবা পৃথিবীতে যে শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব বা বিপরীত ভাবসমূহ আছে, তাহাদের অধীন হইতে হয় না।

কোন সুন্দর দ্রব্য বা সুন্দর দেহ, অথবা অন্য লোকে যে দ্রব্যকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করে তাহা প্রকৃত সন্ন্যাসীকে আকৃষ্ট বা মোহগ্রস্ত করিতে পারে না। সৌন্দর্যের পশ্চাতে যে কদর্যতা বা কুৎসিতভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে, অথবা মহামূল্যবান দ্রব্যের পশ্চাতে যে মূল্যহীনতা গুপ্তভাবে রহিয়াছে, স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী তাঁহার তৃতীয় জ্ঞাননেত্রের দ্বারা তাহা সর্বদাই দেখিতে পান, সুতরাং তিনি বিভিন্ন প্রকার জাগতিক দ্বন্দ্ব ও মায়ার উর্ধ্বে উঠিয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টা করেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ গীতা ৬।৮

(পুস্তকলব্ধ বা উপদেশলব্ধ) জ্ঞান ও (অনুভূতিলব্ধ) বিজ্ঞানের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইয়াছে, যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তরখণ্ড ও স্বর্ণখণ্ডকে সমানভাবে দেখেন, এই প্রকার যোগীকে প্রকৃত (ঈশ্বরযুক্ত) যোগী বলা হয়।—গীতা ৬।৮

সমদুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতিঃ॥—১৪।২৪
মানাপ মানয়ো স্তুল্য স্তুলে মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥—১৪।২৫

যিনি সুখ দুঃখে সমান, যিনি আত্মসংস্থ, যিনি মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তরখণ্ড ও স্বর্ণখণ্ডকে সমানভাবে দেখেন, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার নিকট তুল্য, যিনি সর্বদা ধীরভাবে থাকেন, অন্য লোকে যাঁহার নিন্দা বা

প্রশংসা করিলে যিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, মান ও অপমানে যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান মনোভাবাপন্ন, কোন কিছু লাভের জন্য যিনি যত্নবান নহেন, তাঁহাকে গুণাতীত (সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অতীত) বলা হয়। গীতা—১৪। ২৪-২৫

প্রকৃত সন্ন্যাসীর মন কোন্ স্তরে উঠিয়া যায়, তাহারই কতকটা বর্ণনা উপরে দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সন্ন্যাসীর নিকট অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। তাঁহার মন আত্মায় ও ঈশ্বরে অবস্থিত থাকে।

সুখ দুঃখ, প্রিয় অপ্রিয়, (অন্যের) নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, শত্রু মিত্র এইগুলি সাধারণ লোকের মনে পরস্পর বিপরীত ভাবের উদ্রেক করিয়া তাহাদের মনকে উদ্বেলিত করে, কিন্তু সন্ন্যাসীর মন এই সকল দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠিয়া যায়; তিনি সর্বদা নির্বিকার মনোভাব লইয়া বিরাজ করেন। তিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত হইয়া যান। নিজের শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু অন্নবস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহার অতিরিক্ত কোন কিছু তিনি গ্রহণ করেন না। কিন্তু এই সামান্য পার্থিব দ্রব্যও তাঁহাকে পৃথিবীতে আবদ্ধ করিতে পারে না, কারণ তিনি জানেন যে তাঁহার দেহপাতের পর এই সামান্য পার্থিব দ্রব্যেরও কোন আবশ্যকতা তাঁহার আর থাকিবে না। সুতরাং ইহার প্রতি তাঁহার মনে কোন আসক্তি থাকে না। সম্পূর্ণরূপে আসক্তিহীন অবস্থায় তিনি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আত্মা হইতে যে মৃদু, স্থির ও নির্মল আনন্দের স্ফুরণ হয়, তিনি পরলোকে সূক্ষ্মদেহে সেই আনন্দের অধিকারী হন। ইহাই (সমস্ত কামনার) নির্বাণ। বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি লাভ করেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥—গীতা ২।৫৫

—যখন কোন ব্যক্তি মনোগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, এবং নিজ আত্মাতেই নিজে সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।
—গীতা ২।৫৫

প্রকৃত সন্ন্যাসীর মনে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরতা লাভ করে এবং তাঁহার মন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি ইহা হইতে আনন্দলাভ করেন। পার্থিব দ্রব্যাদির জন্য সর্বপ্রকার কামনা তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইয়া যায়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—গীতা ২।৫৮

কচ্ছপ যেমন তাহার প্রত্যঙ্গগুলিকে দেহের মধ্যে টানিয়া লয়, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ হইতে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহকে টানিয়া লইতে পারেন, তাঁহার ভিতর প্রকৃষ্ট আত্মজ্ঞান-স্থিরতালাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

প্রকৃত সন্ন্যাসীকে কচ্ছপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে থাকে বলিয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়। সন্ন্যাসী তাঁহার মনকে টানিয়া লইয়া আত্মায় ও ব্রহ্মে যুক্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং কচ্ছপের প্রত্যঙ্গগুলি কচ্ছপের চেষ্টায় যেমন তাহার শরীরের ভিতর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, সেইরূপ সন্ন্যাসীর মন আত্মায় ও ঈশ্বরে স্থিত হইবার ফলে তাঁহার দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সমূহ প্রায় নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥—গীতা ২।৬৮

অতএব বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে টানিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার ভিতর প্রকৃত জ্ঞান স্থিরতা লাভ করিয়াছে।—গীতা ১।৬৮

প্রকৃত সন্ন্যাসী এই প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ কামনামুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি।

যস্ত্বাত্মরতিবের স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—গীতা ৩।১৭

যিনি নিজ আত্মা হইতে আনন্দলাভ করেন, নিজ আত্মায় তৃপ্ত, নিজ আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোন করণীয় থাকে না।—গীতা ৩।১৭

ইহার কারণ এই যে তিনি সাধনার উচ্চতম স্তরে উঠিয়া এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো না কৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥—গীতা ৩।১৮

এই জগতে এমন কোন কাজ নাই যাহা করিলে, বা না করিলে তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।—গীতা ৩।১৮

ইহার অর্থ এই যে যিনি ঈশ্বরকে পরম আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ও তাঁহাতে সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সর্বার্থসিদ্ধি হইয়াছে (অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে)। কিন্তু যতদিন স্থূলদেহ বর্তমান আছে, ততদিন এই স্থূলদেহকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য যতদূর সম্ভব অনাসক্তভাবে যতদূর সম্ভব স্বল্প পার্থিব অন্নবস্ত্র প্রভৃতি এই প্রকার ঈশ্বরনিষ্ঠ পুরুষ বা স্ত্রীলোককেও গ্রহণ করিতে হয়।

তস্মাদশক্তঃ সততং কার্যাং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥—গীতা ৩।১৯

অতএব সর্বদা অনাসক্তভাবে করণীয় কার্য (অর্থাৎ নিজের ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর কার্য) কর। অনাসক্তভাবে এই প্রকার কার্য করিয়া পুরুষ পরম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) অবস্থা লাভ করে।—গীতা ৩।১৯

অতএব সন্ন্যাসীও অনাসক্তভাবে কোনপ্রকার কামনা মনোমধ্যে না রাখিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য অন্যান্য লোককে সাহায্য করিতে পারেন এবং জনহিতকর কার্যের জন্য অন্যান্য লোকের মনে প্রেরণাদান করিতে পারেন।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥—গীতা ৪।২১

কামনাহীন, সংযতচিত্ত, শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত যিনি কোন কিছু গ্রহণ করেন না, যিনি কেবল শরীর

রক্ষার জন্য করণীয় কার্য করেন, তিনি এই প্রকার কার্য করিয়া পাপপ্রাপ্ত হন না।—গীতা ৪।২১

যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌচ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥—গীতা ৪।২২

সহজেই যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, শীত-গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, কাহারও প্রতি কোন শত্রুতার ভাব যাঁহার নাই, (জনহিতকর কার্যে লিপ্ত হইলেও) যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, এই প্রকার কার্য করিয়াও তিনি ইহা দ্বারা সংসারে আবদ্ধ হন না।—গীতা ৪।২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥—গীতা ৪।২৩

(পার্থিব কোন দ্রব্য বা জীব দেহের প্রতি) যাঁহার আসক্তি নাই, সর্বপ্রকার আসক্তির বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানে যাঁহার মন অবস্থিত, যিনি কেবল যজ্ঞ (অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনার জন্য কর্ম) করেন, কর্মজনিত কোন বন্ধন তাঁহার হয় না।—গীতা ৪।২৩

জ্ঞেয় স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
—গীতা ৫।৩

কোন কিছু বা কাহারও প্রতি যাঁহার দ্বেষ নাই, কোন কিছু বা কাহাকেও যিনি পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। (শীতগ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যু লাভ ক্ষতি প্রভৃতি) দ্বন্দ্ব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।—গীতা ৫।৩

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥—গীতা ১২।১৮
তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
—গীতা ১২।১৯

শত্রু ও মিত্রের প্রতি, মান অপমানে, শীত গ্রীষ্ম সুখদুঃখে যাঁহার সমভাব, যাঁহার কোনদ্রব্য বা প্রাণী বা লোকের প্রতি আসক্তি নাই, নিন্দা ও প্রশংসা যাঁহার নিকট তুল্য, যিনি বেশী কথা বলেন না, (শরীর রক্ষার জন্য) সামান্য কোন কিছু পাইলেই যিনি সন্তুষ্ট, যাঁহার কোন নির্দিষ্ট বাসগৃহ নাই, ঈশ্বরভক্তির সাহায্যে যাঁহার মনের স্থিরতা আসিয়াছে, তিনি আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) প্রিয়।

—গীতা ১২।১৮-১৯

সন্ন্যাসীকে কিভাবে নির্বিকার, আসক্তিহীন, অতি অল্পে সন্তুষ্ট, স্বগৃহত্যাগী এবং ঈশ্বর নিবিষ্ট ও স্থিরভাবাপন্ন হইতে হয়, উপরের দুইটি শ্লোকে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে।

নির্মানমোহা জিত সঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈ
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥—গীতা ১৫।৫

যে বিবেকী ব্যক্তিগণ মান অপমানবোধ, মোহ এবং সর্বপ্রকার আসক্তি ও কামনা হইতে এবং সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বদা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করেন, তিনি সেই অব্যয় পদ অর্থাৎ ঈশ্বরভাব লাভ করেন।—গীতা ১৫।৫

আসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥—গীতা ১৮।৪৯

যাঁহার কোন কিছু বা কাহারও প্রতি আসক্তি নাই, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন ও কামনাশূন্য হইয়াছেন, তিনি সন্ন্যাস (অর্থাৎ সর্বত্যাগের দ্বারা) পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন। (অর্থাৎ পৃথিবীতে তাঁহার করণীয় কোন কার্য থাকে না)।—গীতা ১৮।৪৯

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্ কায়মানসঃ
ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥—গীতা ১৮।৫২
অহঙ্কারবলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা ১৫।৫৩

—নির্জনবাসী ও অল্পাহারী হইয়া শরীর মন ও বাক্যকে সংযত করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক যিনি সর্বদা ঈশ্বরধ্যানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করেন এবং অহঙ্কার, বল, দর্প, কামনা, ক্রোধ, (শরীর রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য ব্যতীত) পার্থিব দ্রব্য গ্রহণ ও মমত্ববোধ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্মের ভাব লাভ করিবার যোগ্য হন।—গীতা ১৮।৫২-৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥—১৮।৫৪

—ব্রহ্মভাবেস্থিত প্রসন্ন ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না এবং কোন কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্বজীবে সমভাবাপন্ন হইয়া তিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি লাভ করেন।—গীতা ১৮।৫৪

বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনা সন্ন্যাসীর জীবনে পূর্ণতালাভ করে। প্রকৃত সন্ন্যাসী ইহলোকে জীবন্মুক্তি ও পরলোকে পূর্ণমুক্তি লাভ করেন।

(ক) আত্মসংযম।

সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে সংযত ব্যক্তি।

(খ) সমদর্শন।

সন্ন্যাসী সর্বজীবে সমদর্শী ও সকলের হিতৈষী হন।

(গ) ঈশ্বরচিন্তা ও যোগ।

যোগাভ্যাসের ফলে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তাঁহার মন বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের ধারণায় অবস্থান করে।

(ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান।

সন্ন্যাসীর মনে ফললাভের কোন কামনা থাকে না। জনসমাজের মঙ্গলের জন্য সুশিক্ষাদান, শুভ কার্যের জন্য প্রেরণাদান করিলেও তিনি ইহা নিষ্কামভাবে করেন। শরীর রক্ষার জন্য যে অল্প আহারাদি তাঁহাকে করিতে হয়, তাহাও দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িক ব্যাপার মনে করিয়া তিনি ইহাতে অনাসক্ত থাকেন। হিতকর কার্য করিতে থাকিলেও ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রাকৃতিক শক্তির

দ্বারা সমস্ত কার্য হইতেছে জানিয়া তিনি ঐ কার্যের জন্য কোন অহঙ্কার বোধ করেন না এবং ইহা ঈশ্বরে অর্পণ করেন।

(ঙ) দৈবী সম্পদলাভের চেষ্টা।

নিজের ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা সন্ন্যাসী দৈবীসম্পদের অধিকারী হন।

(চ) মনের সমতা রক্ষা।

সুখ দুঃখ, মান অপমান, লাভক্ষতি প্রভৃতি নানা প্রকার জাগতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও সন্ন্যাসী নিজের মনের সমতা রক্ষা করিয়া চলেন।

(ছ) অনাসক্তি।

জাগতিক সর্বপ্রকার দ্রব্য ও সর্বজীবদেহের প্রতি আসক্তি হইতে সন্ন্যাসী নিজের মনকে মুক্ত করেন। জীবদেহের নশ্বরতার কথা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে।

(জ) ত্যাগ।

নিজের গৃহাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী হন।

এইভাবে সর্বপ্রকার আসক্তির বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া এবং বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে মনের স্থিতি লাভ করিয়া সন্ন্যাসী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি যে এই পৃথিবীতে কেবল তাঁহার দেহকে ফেলিয়া চলিয়া যান তাহা নহে ; পার্থিব সমস্ত কামনাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরলোক সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা এবং বর্তমান যুগে নির্ণীত তথ্য

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥—গীতা ২।২০

—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করে না বা মারা যায় না। ইহা একবার জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না এমনও নহে। ইহা জন্মহীন, চিরস্থায়ী ও প্রাচীন। শরীরের বিনাশে ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।—২।২০

ঈশ্বর ও মূল প্রকৃতি এই দুইটির কোনটির জন্ম বা উৎপত্তি হয় নাই। ঈশ্বরকে পরম পুরুষ বলা হয়। গীতায় বলা হইয়াছে "প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জন্মহীন বলিয়া জানিও"—১৩।১৯। বিশ্বের চরম, জন্মহীন ও অবিনশ্বর সত্তাকে এইভাবে আমরা দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দেখিলেও এই দুইটি মূলতঃ এক। প্রলয়কালে অর্থাৎ যখন নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রাকৃতিক পদার্থের বিনাশ ঘটে এবং তাহারা একটি অতিসূক্ষ্ম একাকার অবস্থায় চলিয়া যায়, তখন সর্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম ঈশ্বর ও সর্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম প্রকৃতির ভিতর কোন ভেদভাব থাকে না। একটি মাত্র বিশ্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম, জন্মহীন ও বিনাশহীন নিষ্ক্রিয় চরম সত্তা তখন বর্তমান থাকে। এই একটিমাত্র বিশ্বসত্তাকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, "হে সৌম্য, অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) বিশ্বসত্তা এক ও অদ্বিতীয় ছিল।" ইহার ভিতর কোন গুণের প্রকাশ না থাকায়, ইহা নির্গুণ অবস্থায় ছিল। এই এক নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ চরম বিশ্বসত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়। সংস্কৃত বৃন্‌হ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বৃন্‌হ ধাতুর

অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। ব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থায় থাকেন না। ব্রহ্মের এই নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থাকে মানুষের নিদ্রার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। নিদ্রাভঙ্গের পর মানুষের যেমন কর্মপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, প্রলয়কালের অবসানে ব্রহ্মেরও ঐভাবে সৃষ্টিকার্যের ইচ্ছা জন্মে। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে—

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানিকল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥—গীতা ৯।৭

—হে অর্জুন, কল্পক্ষয়ে (অর্থাৎ প্রলয়কালে) সমস্ত প্রাণী-অপ্রাণী আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; কল্পের প্রারম্ভে (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে) আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) পুনরায় তাহাদের সৃষ্টি করি।—৯।৭

চিন্ময় ঈশ্বরের পুনরায় সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে, তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত প্রকৃতি প্রথমে সূক্ষ্ম জড়শক্তি ও তারপর স্থূল জড় পদার্থের রূপ ধারণ করে। ব্রহ্মের প্রকৃতি নামক সূক্ষ্ম অংশ বিরাট বিশ্বে এইভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে বলিয়া ব্রহ্মকে ব্রহ্ম (অর্থাৎ বর্ধিতরূপ ধারণ করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন সত্তা) বলা হয়।

পরে প্রাকৃতিক অবস্থা যখন কোন স্থানে প্রাণধারণের উপযোগী হয়, তখন সেই স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এই প্রাণশক্তিকে ভিত্তি করিয়া, ইহার সহিত বিভিন্ন স্তরের চিৎশক্তিও আত্মপ্রকাশ করে। অবশেষে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে আমরা মানুষের ভিতরই চিৎশক্তির উচ্চতম প্রকাশ দেখিতে পাই। ঈশ্বরই চিৎশক্তির মূলাধার। মানুষ ঈশ্বরের নিকট হইতে ঐশ্বরিক চিৎশক্তির একটা অতি ক্ষীণ অংশ লাভ করে। ইহাকে জীবাত্মা বলা হয়। সমস্ত জীবাত্মা পরমাত্মা বা ঈশ্বরের অংশ। পৃথিবীতে সমস্ত জীবাত্মা স্থূলদেহধারী জীব।

ব্রহ্মের প্রকৃতি নামক অংশই বিরাট বিশ্বে সূক্ষ্ম ও স্থূল নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে। সেইজন্য ইহাকে মহৎব্রহ্ম বলা হয়। জীবের উৎপত্তিকে মানুষের জন্মের সহিত গীতায় তুলনা করা হইয়াছে। বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনে পুত্রকন্যা লাভের ইচ্ছা জন্মে। তখন স্বামী স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন করেন। এইভাবে আমরা প্রত্যেকেই পিতামাতার নিকট হইতে জন্মলাভ (অর্থাৎ স্থূলদেহ লাভ) করিয়াছি।

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥—গীতা ১৪।৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদেযানিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।
—গীতা ১৪।৪

—মহৎব্রহ্ম (অথাৎ প্রকৃতি) আমার যোনি (অর্থাৎ জীবগণের উৎপত্তি স্থান); আমি সেই স্থানে গর্ভোৎপাদন করি এবং তাহা হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়।—১৪।৩

সমস্ত জীবোৎপত্তিস্থানে যে সমস্ত মূর্তির আবির্ভাব হয়, মহৎব্রহ্ম (বা প্রকৃতিই) তাহাদের উৎপত্তিস্থান এবং (অর্থাৎ ঈশ্বরই তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।—১৪।৪

ঈশ্বর চিন্ময় পুরুষ; তিনি প্রকৃতির ভিতর তাঁহার চিৎশক্তির অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বীজসমূহ বপন করিলে, প্রাকৃতিক স্থূলদেহযুক্ত নানাপ্রকার জীবের উৎপত্তি হয়। অতএব ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যস্থলে জীব। সে ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহার আত্মা এবং মাতৃদেহের ভিতর দিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে তাহার দেহলাভ করে। মাতৃদেহ আদ্যাশক্তি প্রকৃতিরই অংশ।

প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের একাংশ আত্মপ্রকাশ করিলে, তখন আমরা তাহাদিগকে জীবাত্মা বলি। ঈশ্বর অবনিশ্বর এবং মূল প্রকৃতিও অবিনশ্বর। কিন্তু এই দুইটির সমাবেশে যে বহুজীবের উৎপত্তি হয়, এবং তাহারা পৃথক

পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তাহারাও কি অবিনশ্বর ? কেহ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেও, তিনি মনে করিতে পারেন, যে যখন কাহারও মৃত্যু হয় ও তাহার স্থূলদেহের বিনাশ ঘটে, তখন তাহার জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ঈশ্বরে বিলীন হইয়া যায় এবং স্থূলদেহের প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ ক্রমশঃ প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সহিত মিশিয়া যায়।

(১) জীবাত্মার অমরত্ব :—

কিন্তু গীতার শিক্ষা উল্লিখিত মতের বিপরীত। জীবাত্মার অমরত্বের কথা গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

মানুষের স্থূলদেহের ভিতর তাহার একটি সূক্ষ্মদেহ থাকে—। যখন কোন লোকের মৃত্যু ঘটে, তখন তাহার সেই সূক্ষ্মদেহ তাহার স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥—গীতা ১৫।৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥—গীতা ১৫।৮

—আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) চিরস্থায়ী অংশ জীবলোকে জীবরূপ ধারণ করিয়াছে ; (বিষয় ভোগের জন্য) এই জীব মন সহ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকরূপে প্রাকৃতিক দেহে) অবস্থিত এই ইন্দ্রিয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।—১৫।৭

জীব যখন দেহ ধারণ করে, অথবা স্থূলদেহ ত্যাগ করে, তখন প্রবহমান বায়ু যেমন ফুল প্রভৃতি হইতে গন্ধ টানিয়া লইয়া যায়, জীবও সেইরূপ মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহকে সঙ্গে লইয়া আসে বা যায়।—১৫।৮

অতএব জীবের মৃত্যুর অর্থ তাহার স্থূলদেহ ত্যাগ। ইহাতে তাহার সূক্ষ্মদেহ, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ বিনষ্ট হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে অন্যান্য দেশের কিছু কিছু লোকের মনেও মৃত্যুর পর

জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ লিখিত "মরণের পারে" নামক পুস্তকে বাঙালী পাঠকগণ এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাইতে পারেন।

ইংরাজী ভাষা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজের দ্বারা লিখিত The Survival of Man (দ্যা স্যারভাইভ্যাল অভ ম্যান)—মানবাত্মার উদ্বর্তন (অর্থাৎ স্থূলদেহ নাশের পরও তাহার অবস্থান) নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। ইংল্যাণ্ডে Society for Psychical Research (স্যাসাইঅ্যাটি ফার সাইকিক্যাল্ রিসার্চ—প্রেততত্ত্ব গবেষণা সঙ্ঘ) নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা কোন ভাবে থাকে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, তাঁহারা কঠোর বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ অবলম্বন করিয়া বহু বৎসর ধরিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। স্যার অলিভার লজও ঐ সঙ্ঘের সভ্য এবং সাময়িক সভাপতি ছিলেন। সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যের ন্যায় তাঁহারও অবশেষে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে মৃত্যুর পরও মানুষের জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে পরলোকে থাকে; তখন তিনি উল্লিখিত পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন দেশে পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডে Society for Psychical Research (সংক্ষেপে S. P. R.) এর তত্ত্বাবধানে বহু বৎসর ধরিয়া যে প্রকার নিয়মনিষ্ঠ-ভাবে পরীক্ষাসমূহ করা হইয়াছে, অন্য কোন দেশে বোধ হয় সেই প্রকার পরীক্ষা করা হয় নাই।

ভারতীয় যোগিগণের জীবনবৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে কোন কোন যোগীর অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। তাঁহারা নিজেদের জীবন্ত স্থূলদেহকে কোন স্থানে শায়িত অবস্থায় রাখিয়া, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সমূহকে লইয়া সূক্ষ্মদেহে অন্যত্র গমন করিতে পারেন এবং ইচ্ছা

করিলে সেখানে দেখা দিয়া সেইস্থান হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য লইয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজদেহে প্রবেশ করিতে পারেন ও পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

কোন মানুষের মৃত্যুর সময় ঐশ্বরিক ব্যবস্থায় ঐ ভাবে তাহার বিনা চেষ্টায় তাহার স্থূলদেহ হইতে তাহার মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সমূহকে লইয়া তাহার সূক্ষ্মদেহ বাহির হইয়া যায় এবং পরলোকে গমন করে। মৃতদেহে ফিরিয়া আসিবার তাহার কোন ক্ষমতা থাকে না। গীতায় মানুষের মৃত্যুর পর জীবাত্মার পরলোক গমন সম্বন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে।

বর্তমান কালে পরলোকে প্রয়াত আত্মা (বা প্রয়াতাত্মা) সমূহ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সন্দেহাতীতভাবে জানা গিয়াছে। মহা-প্রয়াণের পর প্রয়াতাত্মাগণের স্থূলদেহের বিনাশ ঘটে, কিন্তু তাহাদের জীবনের চিন্তাধারা ও স্মৃতিশক্তি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহভালবাসা প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহলোকে তাহাদের স্থূল-দেহের যে প্রকার চেহারা ছিল, পরলোকে তাহাদের সূক্ষ্মদেহেরও ঐ প্রকার চেহারা থাকে। সুতরাং ইহলোকে আমরা যেমন পরিচিত লোকজনকে চিনিতে পারি, পরলোকেও ঐ ভাবে প্রয়াতাত্মাগণের মধ্যে কে পূর্ব পরিচিত এবং কে অপরিচিত, তাহা তাহারা পরস্পর বুঝিতে পারে। স্থূলদেহের বিনাশ ঘটায়, স্থূল-দেহে যে প্রকার রোগযন্ত্রণা কখন কখন ভোগ করিতে হইত, প্রয়াতাত্মাকে সেই প্রকার রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

কোন কোন প্রয়াতাত্মার সহিত পৃথিবীর কোন কোন লোক যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে। পৃথিবীতে আমরা টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে একস্থানে কিছু লিখিয়া অন্যস্থানে সেই লেখা পাঠাইতে পারি; টেলিফোনের তারের সাহায্যে একস্থানে কিছু কথা বলিয়া বা কিছু শব্দ করিয়া, অন্যস্থানে সেই কথা বা শব্দ পাঠাইতে পারে। তারহীন রেডিওর সাহায্যে এক স্থানে গান বাজনা করিয়া বা বক্তৃতা দিয়া দূরবর্তী স্থানসমূহের লক্ষ

লক্ষ লোককে তাহা শোনাইতে পারি। একস্থান হইতে বেতার-বার্তা দূরে পাঠাইতে পারি। তারের সাহায্য না লইয়া টেলিভিজ্‌ন ব্যবস্থার সাহায্যে একস্থানের কোন দৃশ্যকে দূরবর্তী স্থানসমূহের সহস্র সহস্র লোককে দেখাইতে পারি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু লেখা, শব্দ ও দৃশ্য যাহাই দূরে পাঠাই না কেন, যে স্থান হইতে পাঠান হয়, সেই স্থানে প্রেরক যন্ত্র এবং যে স্থানে এইগুলি গৃহীত হয়, সেই স্থানে গ্রাহক যন্ত্র রাখিতে হয়।

মানুষের মন উল্লিখিত যন্ত্রসমূহ অপেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্ম। একস্থানে অবস্থিত কোন মানুষের মন প্রেরক যন্ত্ররূপে এবং দূরে অবস্থিত কোন মানুষের মন গ্রাহক যন্ত্ররূপে কার্য করিতে পারে কি? কঠোরভাবে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহা সম্ভব কিন্তু এই প্রকার মনের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। একস্থানে অবস্থিত কোন মানুষের মন তীব্র চিন্তা করিয়া তাহার মন হইতে চিন্তাতরঙ্গ দূরবর্তী কোন মানুষের মনের দিকে পাঠাইতে পারে এবং এইভাবে নিজের চিন্তাকে দূরবর্তী ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত বা অঙ্কিত করিতে পারে। ইহাকে Telepathy (টেলেপ্যাথি বা চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ) বলা হয়। টেলেপ্যাথিতে একটি মন সাক্ষাৎভাবে অন্য মনের উপর কার্য করে এবং একটি মনের চিন্তা অন্য মনের উপর প্রতিফলিত হইয়া যায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে সূক্ষ্ম দেহধারী প্রয়াতাত্মার মন পরলোকে অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি তাহার কোন নিকট পৃথিবীবাসী আত্মীয় বা বন্ধু পৃথিবীতে আসিবার জন্য তাহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়, তখন ঐ চিন্তাতরঙ্গ প্রয়াতাত্মার মনে প্রতিফলিত হয় এবং পৃথিবীতে আসিবার পক্ষে তাহার কোন বাধা বা অসুবিধা বা অনিচ্ছা না থাকিলে, সে পৃথিবীতে আহ্বায়কের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ প্রয়াতাত্মার নিকট হইতে বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত বা মৌখিক উত্তর আবশ্যক হইলে, তাহার জন্য medium (মীডিঅ্যাম্ বা মাধ্যমের)-র ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রয়াতাত্মার স্থূল মস্তিক বা স্থূল হস্ত বা স্থূল

বাগ্‌যন্ত্র (অর্থাৎ মুখ প্রভৃতি) নাই। সুতরাং লিখিবার জন্য তাহাকে কোন জীবন্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক ও হস্তকে ব্যবহার করিতে হয়, এবং মৌখিক উত্তর দেওয়ার জন্য তাহাকে কোন জীবন্ত ব্যক্তির মস্তিষ্ক ও মুখ ব্যবহার করিতে হয়।

স্ত্রীলোকগণের দেহ ও মন পুরুষগণের দেহ ও মন অপেক্ষা অনেক বেশী কোমল ও নমনীয় হয়। সেই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণই সাধারণতঃ মীডিয়াম বা মাধ্যমের কাজ করে। কিন্তু মীডিঅ্যাম হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম।

আমরা কখন কখন বলি যে কোন একটি স্ত্রীলোক প্রেতাবিষ্ট হইয়াছে। চলিত কথায় আমরা ইহাকে ভর করা বা ভূতে পাওয়া বলি। কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন প্রেতাত্মা ভর করিয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে ঐ প্রেতাত্মা তাহার দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার মস্তিষ্ক প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সুতরাং ঐ স্ত্রীলোকটির নিজের মন তখন কাজ করিতে পারিতেছে না ; অনুপ্রবেশকারী প্রেতাত্মার মনই তাহার মস্তিষ্ক ও দেহের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে।

কিন্তু কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোক হিস্টিয়্যারিঅ্যা বা মৃগী রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, সাধারণ লোকে তাহাকে প্রেতাবিষ্ট মনে করে ; তাহাদের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের উপর কোন দেবতার ভর হইয়াছে—এই প্রকার কথাও কখন কখন প্রচার করা হয়। ইহাও সাধারণতঃ অমূলক।

কিন্তু কোন 'প্রয়াতাত্মা পার্থিব কোন ব্যক্তির চিন্তাতরঙ্গের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে তাহার নিকট-আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে এবং মীডিয়াম হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের মাধ্যমে আহ্বানকারীর বা তাহার নিকটে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদান করিতে পারে। তখন পৃথিবীতে অবস্থান করিবার সময় ঐ প্রয়াতাত্মার যে প্রকার জ্ঞান, চিন্তা, কথা বলিবার ধরণ-ধারণ প্রভৃতি ছিল, তাহা মীডিয়ামের মাধ্যমে লিখিত উত্তর

বা মৌখিক উত্তরের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। পূর্বে (অর্থাৎ পৃথিবীতে অবস্থানকালে) কথা বলিবার সময় কোন মুদ্রাদোষ থাকিলে, তাহাও মাধ্যমের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। পূর্বে যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান ছিল, সেই সম্বন্ধে সে লিখিতে বা বলিতে পারে।

লিখিত উত্তরের জন্য Planchette (প্লান্‌শেট্) নামক একটি অতি সাধারণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী plank (প্ল্যাংক) শব্দের অর্থ কাঠের তক্তা। প্লান্‌শেটের প্রধান উপাদন কাঠের একটি ছোট তক্তা বা plank—করাসী ভাষায় planche। (ফরাসী ভাষায় ছোট তক্তা বুঝাইবার জন্য planchette—প্লান্‌শেট)। মীডিয়াম ভাবে কার্যকারী কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের স্থূল হস্তে পেন্সিল দিলে, পৃথিবীতে আগত প্রয়াতাত্মা ছোট তক্তার উপর স্থাপিত কাগজের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যায়।

আহূত প্রযাতাত্মার নিজের মস্তিষ্ক ও স্থূল মুখ না থাকায়, সে নিজে কথা বলিতে অক্ষম। বিভিন্ন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়ার জন্য তাহাকে মীডিয়ামের মস্তিষ্ক ও মুখ ব্যবহার করিতে হয়।

যখন কোন প্রয়াতাত্মা কোন মীডিয়ামের ভিতর দিয়া কথা বলে, তখন মীডিয়ামের স্বাভাবিক অবস্থা থাকে না এবং স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার থাকে না। প্রয়াতাত্মার চিন্তাই তখন তাহার ভিতর দিয়াই প্রকাশ লাভ করে। মীডিয়ামের ঐ প্রকার অবস্থাকে ইংরাজীতে Trance (ট্রান্‌স্ অর্থাৎ আবিষ্ট অবস্থা) বলা হয়।

কোন সাধারণ লোক পরলোকে গিয়া হঠাৎ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং কোন সাধারণ প্রয়াতাত্মাকে কোন ব্যাপারে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হয়। ঈশ্বর বা দেবদেবী সম্বন্ধে তাহার কোন আতিরিক্ত জ্ঞানও হয় না।

উপরে যে টেলেপ্যাথির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আর একপ্রকার টেলেপ্যাথিও আছে। ইহাকে Spontaneous telepathy (স্পন্‌টেইনিয়াস টেলেপ্যাথি—স্বতোজাত বা স্বতঃস্ফূর্ত

চিন্তাতরঙ্গ গমন) বলা হয়। রাত্রিতে দুর্ঘটনার ফলে কোন লোক আহত হইয়া যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে তাহার কোন নিকট আত্মীয় স্বপ্নাবস্থায় ঐ দুর্ঘটনা দেখিয়াছে এবং আহত ব্যক্তির ন্যায় সেও যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে। ইহা নিকট আত্মীয়ের মনের উপর আহত ব্যক্তির মনের ক্রিয়া।

কোন প্রয়াতাত্মা মীডিয়ামের ভিতর দিয়া লিখিবার বা কথা বলিবার সময় সে নিকটস্থ অন্য কোন লোকের সচেতন মন হইতে চিন্তাতরঙ্গ ধরিয়া ও তাহার অবচেতন মন হইতেও তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে পারে। ইহাও একপ্রকার টেলেপ্যাথি।

কোন কোন শক্তিসম্পন্ন যোগী অন্যমনের চিন্তাকে বুঝিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে নিজের মনের চিন্তাকে অন্য মনে প্রতিফলিত করিতে পারেন। কোন প্রয়াতাত্মাকে আহ্বান করিয়া মীডিয়ামের সাহায্য ব্যতীত তিনি সেই প্রয়াতাত্মার মনের কথা জানিতে পারেন।

অন্য কোন কোন দেশেও এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন লোকের জন্ম হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হল্‌মের দার্শনিক পণ্ডিত সোয়েডেনবর্গের নাম করা যাইতে পারে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রয়াতাত্মাগণের সহিত যোগাযোগ করিতে পারিতেন—এই প্রকার জনশ্রুতি ছিল। একবার একটি ভদ্রমহিলা তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার পরলোকগত স্বামী একটি স্বর্ণকারের নিকট হইতে কিছু রূপোর জিনিস কিনিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী কখনও কাহারও নিকট ঋণী থাকিতেন না। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই রূপোর জিনিসগুলির দাম দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণকার ঐ দাম চাহিতেছে এবং তিনি নিজে তাঁহার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত টাকার কোন রসিদ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কোথায় ঐ রসিদখানি আছে, তাহা যদি সোয়েডেনবর্গ তাঁহার পরলোকগত স্বামীর নিকট হইতে জানিয়া তাঁহাকে বলেন, তাহা

হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। তিন দিন পরে সোয়েডেনবর্গ ঐ মহিলাটির বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন তাঁহার বাড়িতে কফিপানের জন্য কয়েকজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সোয়েডেনবর্গ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণসহ ঐ মহিলাটিকে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামীর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় রসিদের খবর লইয়াছেন। উপরের ঘরে যে দেরাজযুক্ত আলমারি আছে, তাহার বামদিকের একটি দেরাজ টানিয়া লক্ষ্য করিলে ভিতরে একটি গুপ্তস্থান দেখিতে পাওয়া যাইবে। হল্যাণ্ডে লিখিত কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় রসিদখানি ঐ গুপ্তস্থানে আছে। তখন সকলে উপরের ঘরে গেলেন এবং বামদিকের একটি বিশেষ দেরাজ টানিয়া তাহার ভিতরের গুপ্তস্থান লক্ষ্য করিলেন। ঐ গুপ্তস্থানে ব্যক্তিগত কিছু চিঠিপত্রের সহিত প্রয়োজনীয় রসিদখানি পাওয়া গেল। মৃত্যুর পর প্রয়াতাত্মা পরলোকে থাকে এবং প্রয়োজন হইলে তাহার সহিত যোগাযোগ করা যায়—ইহাই উল্লিখিত ঘটনাদ্বারা প্রমাণিত হয়। বিখ্যাত জারম্যান দার্শনিক ক্যাণ্ট এই ঘটনার কথা জানিতেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই।

প্রয়াতাত্মাগণের সহিত যোগাযোগের জন্য কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ মীডিয়ামের কার্য করিলে, তাহার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে তাহার নিজের কোন লাভ হয় না। কিন্তু পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবনের সম্প্রসারণ মাত্র। সুতরাং পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভের চেষ্টা কেবল অলস কৌতূহলের চরিতার্থ নহে। মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতা আছে। এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব ছিল; কেবল কীভাবে তাহার কোথায় অস্তিত্ব ছিল, তাহা আমরা জানি না। মৃত্যুর পরও পরলোকে তাহার অস্তিত্ব থাকে।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥—গীতা ২।২৮

—অর্থাৎ হে অর্জুন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পূর্বে জীবগণের অবস্থা

অপ্রকাশিত থাকে এবং মৃত্যুর পর তাহারা আবার অপ্রকাশিত অবস্থায় চলিয়া যায়। এই দুইটির মধ্যভাগে কিছুদিন তাহারা প্রকাশিত অবস্থায় থাকে, কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিবার কী আছে?—গীতা ২।২৮

বুদ্ধিমান জীব হিসাবে মানুষ বিশ্বের সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে জড় জগৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য ইহা অপেক্ষা আরও বেশী চেষ্টা করা হইয়াছে। কারণ মানুষের আরাম, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তাহার নির্মল ও স্থির আনন্দ, তাহার শান্তি—মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। যাহারা বিজ্ঞানের চর্চা করে, তাহারা পৃথিবীতে মানুষের দৈহিক আরাম ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য অনেক কিছু করিয়াছে ও করিতেছে। ভারতের অধ্যাত্মবাদীগণ তাহাদের এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে সুসঙ্গত প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করে এবং এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে অব্যাহত গতিতে চালাইয়া যাইবার আবশ্যকতা আছে—ইহাও তাহারা মনে করে। কিন্তু যখন কোন জড়বাদী ব্যক্তি মানুষের জন্মের পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কোন আবশ্যকতা নাই বলে, তখন ভারতের অধ্যাত্মবাদীগণ তাহাকে "অর্ধমূঢ়" আখ্যা দেয়।

অতএব যাহারা মীডিয়ামের কার্য করে, পারলৌকিক জীবনের তত্ত্বোদ্ঘাটনে ও মানুষের জ্ঞান-বিস্তারে সাহায্য করিয়া থাকে তাহারা মানবসমাজের হিতসাধনই করে।

(২) প্রয়াতাত্মাগণের পরলোকবাস :—

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে মনে হয় প্রয়াতাত্মাগণ পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে অনেক দূরে ঊর্ধ্বাকাশে বাস করে। এই আকাশের অন্তের কথা আমরা সাধারণতঃ ভাবিতে পারি না এবং আমাদের নিকট ইহা অনন্ত বলিয়াই মনে হয়। পৃথিবীর উপরিভাগ সীমাবদ্ধ হইলেও যেমন ইহা বহুদেশে

বিভক্ত, অসীম আকাশ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়াতাত্মগণের জন্য কি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে? যাহারা চোর, দস্যু, নরঘাতক, লম্পট, প্রতারক প্রভৃতি ছিল, তাহাদের প্রয়াতাত্মাগণ কি শুদ্ধচিত্ত ঐশ্বরিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের প্রয়াতাত্মাসমূহের সহিত একই স্থানে বা লোকে বাস করে? অর্থাৎ পরলোক বলিলে কি একটি সুবিস্তীর্ণ স্থান বা লোক বোঝায়?

পুরাণ প্রভৃতিতে সপ্তলোকের কথা আছে—ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। জনলোক, তপলোক ও সত্যলোককে আবার ব্রহ্মলোক বলা হয়।

ভূ ভূর্বঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপএব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্তিতাঃ ॥—অগ্নিপুরাণ

গীতায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বর্গের কথা বলা হইয়াছে। উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ এই যুদ্ধে (গীতা ২।৩২)। (এই যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গলাভ করিবে—২।৩৭)। অন্য কোন কোন লোকের বা স্থানের কথাও গীতায় বলা হইয়াছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। যথা যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিগণের লোকসমূহে গিয়া ও সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া (পরে পৃথিবীতে) শুদ্ধচিত্ত ও শ্রীসম্পন্ন মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করে (গীতা ৬।৪১)। ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকের অধিবাসিগণ পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে, তাহার আর জন্ম হয় না (গীতা ৮।১৬)। বেদত্রয় অনুসারে যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের পূজা করিয়া এবং সোমরস পানের পর পবিত্র-ভাবাপন্ন হইয়া স্বর্গকামনা করে, তাহারা পুণ্যময় ইন্দ্রলোকে গিয়া দেবতাগণের উপযুক্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ ভোগ করে (গীতা ৯।২০)। সেই বিশাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে, তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে; এইভাবে বেদবিহিত যজ্ঞকারী কামনাযুক্ত ব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হয় (গীতা (৯।২১)। যাহারা দেবপূজা করে তাহারা দেবলোকে, যাহারা পিতৃপূজা করে

তাহারা পিতৃলোকে, যাহারা ভূতপূজা করে তাহারা ভূতলোকে গমন করে, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের পূজা করে, কেবল তাহারাই ঈশ্বরকে লাভ করে (গীতা ৯।২৫)।

(৩) প্রয়াতাত্মাগণের পুনর্জন্ম :—

পৃথিবীর কিছু লোকের ধারণা এই পৃথিবীতে মানুষ প্রথম জন্মগ্রহণ করে; ইহার পূর্বে তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ইহার বিপরীত ধারণা চলিয়া আসিতেছে।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥—গীতা ৪।৫

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন "হে অর্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম পূর্বে হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত জানি, তুমি তাহা জান না" (গীতা ৪।৫)।

গীতার ৯।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "হে অর্জুন, প্রলয়কালে প্রাণী ও অপ্রাণী সমস্তই ঈশ্বরের সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বর পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন।"

কিন্তু প্রথমেই পূর্ণাবয়ব মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীতে বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

ভারতে অবতার সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। অবতরণ শব্দের অর্থ নামিয়া আসা। যখন কোন মানুষের ভিতর ঐশ্বরিক শক্তি বিশেষভাবে নামিয়া আসে বা আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাকেই সাধারণতঃ অবতার বলা হয়। কিন্তু অবতার শব্দের একটি ব্যাপক অর্থও আছে। যখন ঐশী শক্তি প্রকৃতির ভিতর দিয়া ক্রমাগতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তখন যাহাদের ভিতর দিয়া এই ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহাদিগকেও পুরাণ প্রভৃতিতে অবতার-রূপে গণ্য করা হইয়াছে। সেই জন্য মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী,—এই দশ অবতারের

উল্লেখ আছে। এই দশাবতারবাদ ক্রমবিকাশ বাদকেই সমর্থন করে।

পৃথিবীর উপরিভাগের প্রায় ৭০ ভাগ জল এবং মানুষের দেহেরও প্রায় ৭০ ভাগ জল। সুতরাং প্রাণিদেহের প্রথম উৎপত্তি জলেই হইয়াছিল এবং ঐশ্বরিক চিৎশক্তি পৃথিবীতে প্রথমে জলচর প্রাণিগণের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং মৎস্যকে ঈশ্বরের প্রথম অবতাররূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

জলচর প্রাণীর পর উভচর (অর্থাৎ জলে ও স্থলে সমানভাবে বিচরণ করিতে পারে এইপ্রকার) প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। কূর্ম বা কচ্ছপ ইহার দৃষ্টান্ত সুতরাং কূর্ম দ্বিতীয় অবতার।

স্থলচর বরাহ তৃতীয় অবতার।

আংশিকভাবে মানুষের দেহ ও বুদ্ধি সমন্বিত এবং আংশিকভাবে পশুরাজ সিংহের দেহ, শক্তি ও সাহসযুক্ত প্রাণী নৃসিংহকে চতুর্থ অবতাররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। নৃসিংহ অর্ধমানুষ ও অর্ধ পশু।

পঞ্চমধাপে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাবয়ব মানুষের সৃষ্টি। সুতরাং বামন পঞ্চম অবতার।

এইভাবে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য মতে একপ্রকার বনমানুষই বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ।

(অবতারবাদ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনেক হিন্দু কোন কোন মানুষকে অবতার মনে করিলেও, প্রত্যেক বৈদান্তিক ইহাকে ঠিক বলিয়া মনে করেন না এবং এই প্রকার বিশ্বাস বেদান্ত ধর্মের অঙ্গ নহে।)

কেহ কেহ মনে করে যে প্রত্যেক মানুষের জন্মের সময় ঈশ্বর একটি নূতন মানুষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু সাধারণ ভারতীয় মত এইরূপ নহে। জীবাত্মাগণের সংরক্ষণই উত্তম বিধান। পৃথিবীতে মৃত্যুর অর্থ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছেদ। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর তাহার সূক্ষ্ম দেহ তাহার মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহকে লইয়া পরলোকে চলিয়া যায়

এবং ঐশ্বরিক বিধানে এই প্রস্থিত আত্মা বা প্রয়াতাত্মা পরলোকে সংরক্ষিত হয় (অর্থাৎ বর্তমান থাকে)। কিন্তু পরলোকে দুঃখ যেমন কম, ঐভাবে সুখও কম। পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের আধিক্য থাকিলেও, সুখেরও আধিক্য আছে। এখানে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে এবং অনেকে স্থূলদেহে নানাপ্রকার উদ্দাম সুখভোগও করে। সেইজন্য এই স্থূল দেহকে ভোগায়তন বলা হয়। যে যাত্রা থিঅ্যাটার প্রভৃতি হইতে বেশ সুখলাভ করে, সে সুযোগ পাইলেই যাত্রা থিঅ্যাটার প্রভৃতিতে গিয়া হাজির হয়। যে ভোজনে খুব আনন্দ পায়, সে যে স্থানে ইহার ব্যবস্থা আছে, সে স্থানে যায়। এইভাবে মানুষের সুখলাভ স্পৃহাই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টানিয়া লইয়া যায়।

পৃথিবীতে মানুষ অনেক কিছু ভালবাসে ও লাভ করিতে চায়। এই ভালবাসার অর্থ কী? কোন জিনিসকে, কোন প্রাণীকে, বা কোন লোককে ভালবাসার অর্থ তাহা হইতে সুখলাভ করা। পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ভালবাসেন—ইহার অর্থ পুত্রকন্যার সাহচর্যে, তাহাদিগকে সুস্থ ও সুখী দেখিয়া ও তাহাদিগের কথা চিন্তা করিয়া পিতামাতা সুখলাভ করেন। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ও নরনারীগণের মধ্যে যে ভালবাসা তাহার অর্থও এইরূপ। আমরা সুন্দর পোশাক, সুন্দর আসবাবপত্র, সুন্দর ঘরবাড়ি, সুন্দর বাগান, সুন্দর গাড়ি প্রভৃতি ভালবাসি। নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আমাদের যে প্রবল ভালবাসা থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ব্যতীত পদমর্যাদার প্রতি ভালবাসা, খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতি ভালবাসা, নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতিও আছে। এইভাবে মানুষের মনে নানাপ্রকার ভালবাসার স্রোত বহিতে থাকে। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যু এই সমস্ত স্রোতের সম্মুখে অভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দেয় এবং সাময়িকভাবে সমস্ত ভালবাসার স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু মানুষের জীবন ধারাবাহিকভাবে চলে। অধিকাংশ মানুষের প্রয়াতাত্মা স্থায়ীভাবে পরলোকে থাকে না। পৃথিবীতে তাহাদের

স্থূলদেহ ছিল। সূক্ষ্মদেহে তাহারা পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। ইহলোকে স্থূলদেহও স্থূল ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে তাহারা যে ভাবে স্থূলদ্রব্যাদি ভোগ করিত ও নানাপ্রকার সুখলাভ করিত, পরলোকে সেই প্রকার ব্যবস্থা নাই। অথচ তাহাদের মনে বিভিন্ন প্রকার সুখলাভের কামনাসমূহ রহিয়াছে। এই পার্থিব সুখলাভ কামনাই অধিকাংশ প্রয়াতাত্মাকে পরলোক হইতে পৃথিবীতে টানিয়া আনে এবং তাহারা পৃথিবীতে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া পুনরায় নানাভাবে পার্থিব সুখলাভের চেষ্টা করে। নানাপ্রকার ভালবাসার স্রোত তাহাদের মনে আবার পূর্বের ন্যায় বহিতে থাকে এবং জন্মজন্মান্তরে ইহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ভারতে ইহাকেই আমরা পুনর্জন্ম (অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় স্থূলদেহধারণ) বলি।

কিন্তু কীভাবে কোন প্রয়াতাত্মার পুনর্জন্ম হয়, তাহা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি না। কোন কোন মতে প্রয়াতাত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া খাদ্যের ভিতর দিয়া ভাবী পিতার দেহে প্রবেশ করে এবং সেই স্থান হইতে তাহার ভাবী মাতার গর্ভাশয়ে যায়। কীভাবে পুনর্জন্ম হয় তাহা আমরা সুনিশ্চিতভাবে না জানিলেও, পুনর্জন্মের ধারণা ভ্রান্ত ইহা বলা যায় না। আমাদের আত্মা বা মন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের প্রত্যেকের মন আছে—এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জড়বস্তুর যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ (বা গভীরতা) আছে, মনের সেইরূপ কিছুই নাই। আমাদের মন আছে বলিয়াই, আমরা নিজেদের মানুষ বলি এবং মনের সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি, অনুভব করি ও ইচ্ছা করি। মন মস্তিষ্কের সাহায্যে ইহা করে, কিন্তু মস্তিষ্ক মন নহে। তাহা হইলে মনের প্রকৃত স্বরূপ কী প্রকার? সত্য স্বীকার করিলে বলিতে হইবে আমরা মনের প্রকৃত স্বরূপ জানি না। কিন্তু আমরা ইহা জানি না বলিয়া যে মন নাই তাহা নহে। এইভাবে পুনর্জন্ম কী ভাবে হয় তাহা আমরা না জানিলেও পুনর্জন্ম হইতে পারে।

কখন কখন কোন কোন বালক বা বালিকা তাহার পূর্বজন্মের কিছু

কিছু বৃত্তান্ত বলে। এই প্রকার বালক বা বালিকাকে জাতিস্মর বলা হয়। কিন্তু এই প্রকার বালক বা বালিকার সংখ্যা নগণ্য। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্বজন্মের কথা স্মৃতিপটে থাকিত, তাহা পৃথিবীতে একটি সমস্যার সৃষ্টি করিত। কোন ব্যক্তি পূর্বজন্মে কোথায় ছিল, কাহারা তাহার আত্মীয়স্বজন ছিল, কি প্রকার বিষয় সম্পত্তি তাহার ছিল, এই জ্ঞান লইয়া সে ইহজন্মে কী করিবে? সে নূতন পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও নূতন আত্মীয়স্বজন লাভ করিয়াছে। নূতন পরিবেশের মধ্যে তাহাকে নূতন শিক্ষার্থী জীবন ও নূতন কর্মজীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। অতীতের ভুলভ্রান্তি যতটা সম্ভব মুছিয়া ফেলিয়া সে নূতনভাবে সাধনা করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি তাহার মনে সর্বদা জাগরূক থাকিলে, ইহা সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে নূতন জীবন গঠনের পক্ষে সহায়ক না হইয়া অন্তরায় স্বরূপ হইত। সুতরাং পৃথিবীতে স্থূল দেহধারণের পর প্রয়াতাত্মাগণের সচেতন মন হইতে তাহাদের অবচেতন বা অচেতন মনে তাহাদের পূর্বজন্মের স্মৃতিকে নামাইয়া দেওয়ার যে ঐশ্বরিক ব্যবস্থা আছে, ইহাকেই সুব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। Hypnotism (হিপন্যাটিজম বা সম্মোহন বিদ্যার) সাহায্যে কেহ কেহ কখন কখন অন্য লোকের পূর্বজন্মের স্মৃতিকে তাহার সম্মোহিত অবস্থায় জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোন কোন যোগী নিজশক্তিবলে অন্য লোকের পূর্বজন্মের স্মৃতি সাময়িকভাবে জাগাইয়া দিতে পারেন—এই তথ্য তাঁহাদের জীবনী হইতে পাওয়া যায়।

কিন্তু জন্মগ্রহণের পর পূর্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও, পূর্বজন্মের প্রবণতা বা ঝোঁক, দক্ষতা, মানসিক শক্তি প্রভৃতি ইহজন্মে প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। দেখা গেল একটি বালক বা বালিকা অতি অল্প বয়সে সুন্দর গান করিতে পারে। কোন গান শুনিলেই সে ঐ গানের সুরটি ধরিয়া লয় এবং সুন্দরভাবে ঐ গানের পুনরাবৃত্তি করে। তাহাকে সঙ্গীতশিক্ষা দেওয়া হয় নাই, তথাপি সে সঙ্গীতে পারদর্শী। এই ভাবে বাল্যকালে কবিত্বশক্তি, চিত্রাঙ্কনশক্তি প্রভৃতি প্রকাশ লাভ

রূপে। কেহ বাল্যকালে বিনা শিক্ষায় কোন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখাইলে, সাধারণ লোকে কখন কখন বলে যে সে মার পেট (অর্থাৎ মাতৃগর্ভ) হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তাহারা কোনো গভীর চিন্তা না করিয়া ইহা বলিলেও, ইহার ভিতর গভীর সত্য নিহিত আছে। কোন প্রয়াতাত্মা যখন পৃথিবীতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই তাহার ভিতর কোন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল। সেই পূর্বজন্মার্জিত দক্ষতা ইহলোকে জন্মগ্রহণের অল্প কয়েক বৎসর পরেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এইভাবে বাল্যকালে দুষ্টবুদ্ধি প্রভৃতিও প্রকাশ পায়। ইহলোকে আমরা মানুষে মানুষে যে দোষ গুণ দক্ষতা প্রভৃতির অনেক পার্থক্য দেখিতে পাই, ইহাকেও আমরা পূর্বজন্মার্জিত দোষগুণ দক্ষতা প্রভৃতির সম্প্রসারণ বলিতে পারি।

গীতাতেও এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে। মুক্তিপ্রয়াসী হইয়া অথবা উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, কেহ যোগসাধনা আরম্ভ করিল। কিন্তু সে নানা কারণে তাহার অবহেলা বশতঃ ঐ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইল অর্থাৎ ঐ পথে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ প্রকার ব্যক্তির কী অবস্থা হইবে?"। কৃষ্ণ বলিলেন, "হে অর্জুন, ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার বিনাশ (অর্থাৎ দুরবস্থা) ঘটে না; কারণ কল্যাণ কর্মকারী কেহ দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি (মৃত্যুর পর) পুণ্যকর্মকারীগণ যে লোকে বাস করে সেই লোকে বহুবৎসর বাস করিয়া শুচিসম্পন্ন ও শ্রীমান ব্যক্তির গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন; অথবা কোন জ্ঞাননিষ্ঠ যোগীর গৃহে জন্মলাভ করেন। পৃথিবীতে এই প্রকার জন্ম অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। সেই গৃহে বাস করিবার সময় তিনি তাঁহার পূর্বদেহে অর্জিত যোগবুদ্ধি পুনরায় লাভ করেন এবং সেই অবস্থা হইতে তিনি পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হন। পূর্বের সেই অভ্যাসবশতঃ তিনি যেন অবশ হইয়াই যোগের দিকে আকৃষ্ট হন। গীতা ৬।৪০-৪৪। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কোন লোক সাধনার দ্বারা যে উন্নত অবস্থা লাভ করে,

তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায় না। বিভিন্ন বিষয়ে, দক্ষতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটে ইহা মনে রাখিতে হইবে। পূর্বজন্মার্জিত দোষ গুণ দক্ষতা প্রভৃতি মানুষের সঙ্গী হইয়া পরলোকে যায় এবং প্রয়াতাত্মাগণ যখন পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, এই-গুলি সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। এইভাবে মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য ঘটে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রভেদ অনুসারেও মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য ঘটে ইহাও গীতায় বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির সময় কোন ব্যক্তি দেহত্যাগ করিলে, সে জ্ঞানী প্রয়াতাত্মাগণের নির্মললোকসমূহে গমন করে। রজোগুণের বৃদ্ধির সময় কেহ দেহত্যাগ করিলে, সে শীঘ্রই কর্মাসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে এই পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তমোগুণের বৃদ্ধির সময় কেহ দেহত্যাগ করিলে, সে শীঘ্রই এই পৃথিবীতে মূঢ়যোনিতে জন্মলাভ করে (গীতা ১৪।১৪-১৫)। গীতার কোন কোন ব্যাখ্যাকার মূঢ়যোনির অর্থ করিয়াছেন "পশুযোনি"। গীতায় মূঢ় শব্দ কয়েক বার ব্যবহৃত হইয়াছে। মোহাচ্ছন্ন বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বুঝাইবার জন্যই এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের ফলে স্থূলদেহধারী জীব পশুর স্তর হইতে মানুষের স্তরে উঠিয়াছে। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পুনরায় প্রতিক্ষেত্রে পশুদেহ লাভ করিবে ইহা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নহে। পৃথিবীতে পশুর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। অতএব কোন তমোভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর শীঘ্রই এই পৃথিবীতে পুনরায় কোন তমোভাবাপন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে—এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিবার উল্লিখিত কারণসমূহ থাকিলেও, ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য নানাভাবে আরও বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

(৪) মানুষের মুক্তি ও মুক্তিলাভের উপায় (ধর্ম ও মুক্তির মধ্যে পার্থক্য) :—পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ন্যায় মানুষের মুক্তি সম্বন্ধীয় ধারণাও

প্রতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। সাংখ্য-দর্শন, যোগদর্শন, বেদান্তদর্শন প্রভৃতিতে মানুষের মুক্তিকে তাহার জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই মুক্তির অর্থ কী? এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ চতুষ্টয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক মানুষের (১) ধর্ম, (২) অর্থ, (৩) কাম ও (৪) মোক্ষ এই চারটি প্রয়োজন আছে। অর্থ যে অত্যাবশ্যক ইহা সকলেই জানে। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানুষের মনে যে নানাপ্রকার সুখভোগ কামনা আছে, তাহাও আমরা জানি এবং এই কামনা-সমূহের অন্ততঃ সংযত তৃপ্তি সাধন আবশ্যক। ধর্ম সম্বন্ধেও বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন প্রকার ধারণা আছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্মপালনও আবশ্যক ইহাও অধিকাংশ লোক মনে করে। কিন্তু হিন্দুধর্মের ভিতর কেন মোক্ষ বা মুক্তিকে চতুর্থ প্রয়োজন বলা হইয়াছে এবং ধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়?

কোন মানুষ দুঃখকষ্ট চায় না। প্রত্যেক মানুষই নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল সুখলাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে ইহা কি সম্ভব? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমরা পাঁচ প্রকার সুখ লাভ করি। নানাপ্রকার সুন্দর দ্রব্যাদি চক্ষুকে আনন্দ দান করে; কিন্তু কেবল সুন্দর দ্রব্যাদি লইয়া আমরা সব সময় সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারি না; বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই আমাদিগকে নানাপ্রকার কাজ করিতে হয়। গান বাজনা আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু সব সময় ইহা ভাল লাগে না। আতর, ধূপ প্রভৃতির সুগন্ধ অতি অল্পসময়ের জন্য নাসিকার সুখকর হয়। নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রায় সকলেই চায়; কিন্তু জিহ্বার যথেষ্ট পরিতৃপ্তির পর ইহা আর ভাল লাগে না। ত্বকের যে আরাম তাহাও সাময়িকভাবেই ভাল লাগে। অতএব ইন্দ্রিয়সুখ অত্যন্ত সাময়িক এবং ইহাতে আসক্ত হইয়া জীবনের বিভিন্নপ্রকার কর্তব্যের প্রতি

অবহেলা করিলে, জীবনে নানাপ্রকার দুর্ভোগ বা দুঃখকষ্ট আসিতে পারে ও আসে। সেই জন্য গীতায় বলা হইয়াছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ যোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥—গীতা ৫।২২

—হে অর্জুন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়সমূহের সংস্পর্শ বা যোগ হইতে যে সুখভোগ হয়, সেই সুখের আদি ও অন্ত আছে এবং এই প্রকার সুখ হইতে দুঃখ কষ্টও আসে। সেই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ইহাতে অনুরক্ত বা আসক্ত হন না (গীতা ৫।২২)।

এতদ্ব্যতীত গীতার ১৩।৭-১১ শ্লোকে অসম্মানে উপেক্ষা, দম্ভহীনতা. অহিংসা প্রভৃতি কতকগুলি গুণের উল্লেখ করিয়া এই-গুলিকে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক বলা হইয়াছে এবং জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু ও দুঃখের উল্লেখ করিয়া এইগুলিকে পার্থিব জীবনের বিশেষ দোষরূপে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে।

(১) জন্ম— শিশুর জন্ম হইল, কিন্তু সে সম্পূর্ণ অসহায়। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও দয়ার উপর সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাহাদের অবস্থা সচ্ছল না হইলে, তাহাকে যথাযথভাবে খাদ্যাদি দেওয়া, রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাহার সুচিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং বড় হইলে তাহার ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সম্ভব হয় না।

(২) ব্যাধি—নানাপ্রকার রোগ বিভিন্ন বয়সে মানুষের স্থূলদেহকে আক্রমণ করে এবং মানুষকে যন্ত্রণা ও কষ্টভোগ করিতে হয়। ইহারা অবশেষে মৃত্যুর দূতরূপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

(৩) জরা—কেহ দীর্ঘজীবী হইলে বার্ধক্যে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও বিভিন্নপ্রকার রোগ দেখা দেয়। ইহাও অত্যন্ত অসুখকর অবস্থা।

(৪) মৃত্যু—অবশেষে একদিন মৃত্যু আসিয়া কোন ব্যক্তির সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাকে পৃথিবী

হইতে টানিয়া লইয়া যায়। তাহার দেহ যতই সুন্দর হউক না কেন, তখন ইহাতে পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহাকে দগ্ধ করিলে, ইহা কয়েকমুষ্টি ভস্মে পরিণত হয়। এই মৃত্যু যে কখন কীভাবে কাহার ঘটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই।

(৫) দুঃখ—পার্থিব জীবনের উল্লিখিত দোষগুলি ব্যতীত আরও নানাপ্রকার দোষ আছে। প্রায় সকলকেই আরও নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়, যথা বহুলোকের অর্থাভাবজনিত কষ্ট, কিছুলোকের অর্থনাশজনিত কষ্ট, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হইতে কষ্ট, কখন কখন তাহাদের সহিত মনোমালিন্য হইতে কষ্ট, নানাপ্রকার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হইতে কষ্ট, অন্যের শত্রুতা হইতে কষ্ট, অন্যের কুকার্য হইতে কষ্ট, পদমর্যাদার হ্রাস বা বিলুপ্তি হইতে কষ্ট ইত্যাদি।

কেহ হয়ত এই জন্মে সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তম পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু প্রতিজন্মে এইরূপ নাও হইতে পারে। পরে কোন দুস্থ পরিবারে তাহার জন্ম হইতে পারে এবং সে অসৎ সঙ্গে পড়িতে পারে। তখন তাহার অধোগতি ঘটিতে পারে এবং দুঃখকষ্ট আরও বাড়িতে পারে।

পৃথিবীতে নানাভাবে নানাপ্রকার সুখের ব্যবস্থা থাকিলেও, সর্বপ্রকার সুখই সাময়িক এবং ইহার সহিত (১) বিভিন্নভাবে দৈহিক কষ্ট ও যন্ত্রণা ও (২) নানাপ্রকার মানসিক দুঃখকষ্ট কম বা বেশী পরিমাণে সকলকেই ভোগ করিতে হয়।

পৃথিবীতে যে দৈহিক কষ্ট ও যন্ত্রণা এবং মানসিক দুঃখকষ্ট মানুষকে ভোগ করিতে হয়, চিরকালের জন্য তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহার উপায় কী—এই দুইটি প্রশ্ন প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিগণের মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টের (১) হ্রাসসাধন এবং (২) আত্যন্তিক নিবৃত্তি উভয়ই সম্ভব। দুঃখকষ্টের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন মোক্ষ। মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স ও অপবর্গ এই শব্দগুলি

একই প্রকার অবস্থা বোঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মোক্ষ বা মুক্তির অর্থ সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি বা নিষ্কৃতি। ইহা নিশ্চয়ই প্রত্যেক বুদ্ধিমান বা বিচক্ষণ লোকের কাম্য; সেইজন্য ইহাকে মানুষের চতুর্থ পুরুষার্থ বা প্রয়োজন বলা হইয়াছে।

মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধেও ভারতে প্রাচীনকাল হইতে চিন্তা করা হইয়াছে। কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য কঠোর পন্থা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া অল্প লোক ঐ পথে অগ্রসর হয়।

ধর্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ধর্মের প্রথম লক্ষ্য অভ্যুদয় অর্থাৎ সার্বজনীন উন্নতি এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি। সুতরাং ধর্মের পথই মুক্তিরও পথ। সার্বজনীন উন্নতি ধর্মের প্রথম উদ্দেশ্য হইলেও নানাকারণে এই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সিদ্ধ হইতেছে না। যে কোন প্রকার ধর্মাচরণের দ্বারা মুক্তির পথেও অগ্রসর হওয়া যায় না।

বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইটি বিভাগ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডকে বেদান্ত বলা হয়। বেদের এই দুইটি বিভাগ অনুসারে ধর্মাচরণ সম্বন্ধেও দুই প্রকার মত প্রাচীনকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বেদের কর্মকাণ্ড অনুসারে যে প্রকার ধর্মাচরণ আবশ্যক হয়, তাহা বৈদিক ধর্ম এবং বেদের জ্ঞানকাণ্ড অনুসারে যে প্রকার ধর্মাচরণ আবশ্যক হয়, তাহা বৈদান্তিক ধর্ম বা বেদান্তধর্ম।

পার্থিব জীবন যে নানাপ্রকার দোষযুক্ত ইহা গীতায় বলা হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। পৃথিবীতে যেমন নানাপ্রকার সুখ আছে, ঐভাবে নানাপ্রকার দুঃখকষ্টও আছে। এই দুঃখকষ্ট হ্রাসের জন্য কিছু লোকে মাদকদ্রব্য সেবন, জুয়াখেলা প্রভৃতির আশ্রয়গ্রহণ করে; কিন্তু ইহাতে দুঃখকষ্ট না কমিয়া বরং অন্যভাবে আরও বাড়িয়া যায়। মুক্তিকামী ব্যক্তির লক্ষ্য সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টের আত্যন্তিক বা যতদূর সম্ভব নিবৃত্তি।

কিন্তু পার্থিব জীবনে ইহা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্য মুক্তিকামী ব্যক্তির প্রথম লক্ষ্য পুনর্জন্ম নিবারণ। কিন্তু পার্থিব সুখভোগকামনা মনোমধ্যে থাকিলে, তাহা প্রয়াতাত্মাকে পুনরায় পৃথিবীতে টানিয়া আনিবে। সুতরাং মুক্তিলাভ করিতে হইলে, সমস্ত পার্থিব সুখভোগ কামনাকে মন হইতে দূরীভূত করিতে হইবে।

বেদের কর্মকাণ্ডে যে ভাবে ধর্মাচরণ করিতে বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা পুনর্জন্ম নিবারণ সম্ভব নহে। দেবতাগণের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ ও তাঁহাদের স্তবস্তুতি করাই ধর্ম—বেদের কর্মকাণ্ডের যুগে এই প্রকার ধারণা প্রচলিত ছিল। ইহার দ্বারা মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে পরলোকে সুখকর অবস্থা লাভ হইতে পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা যে পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না এবং পুনঃ পুনঃ পার্থিব দুঃখকষ্ট ভোগও চলিতে থাকে, তাহা নিম্নলিখিতভাবে গীতায় বলা হইয়াছে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে॥
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

—গীতা ৯।২০

—(ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদের কর্মকাণ্ড অনুসারে) যজ্ঞকারী ব্যক্তিগণ যজ্ঞের দ্বারা (পরোক্ষভাবে) ঈশ্বরের পূজার পর সোমরস পান করিয়া ও পাপহীন হইয়া স্বর্গলাভের জন্য প্রার্থনা করে। তাহারা (মৃত্যুর পর) পুণ্যময় ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া স্বর্গে দেবতাগণের জন্য বিহিত ভোগ্য বস্তুসকল ভোগ করে (গীতা—৯।২০)।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশান্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকা[illegible] লভন্তে॥ —গীতা ৯।২১

—(তারপর) তাহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ের পর পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তিন বেদের কর্মকাণ্ডের

অনুসরণকারী ভোগ্যবস্তু প্রার্থিগণ এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যাতায়াত করে (গীতা—৯।২১)।

অতএব বেদের কর্মকাণ্ড মুক্তির পথে সহায়ক নহে। এই কর্মকাণ্ড অনুসারে যাগযজ্ঞ প্রভৃতির যে বিশেষ সার্থকতা নাই, তাহাও ভারতের হিন্দুসমাজের লোক ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেইজন্য বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞ পরিত্যক্ত হইলেও, হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে স্থূলমূর্তি বা অন্যপ্রকার প্রতীক এবং নানাপ্রকার বাহ্য উপকরণ ও মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির সহিত বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা এখনও চলিতেছে। ইহাকে আমরা রূপান্তরিত বৈদিক ধর্ম বলিতে পারি। ইহাকে লৌকিক হিন্দুধর্মও (অর্থাৎ সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম) বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই রূপান্তরিত বৈদিকধর্ম বা লৌকিক হিন্দুধর্মও মুক্তির পথে সহায়ক নহে। ইহাকে উচ্চস্তরের ধর্মও বলা যায় না। কিন্তু ধর্মহীন হওয়া অপেক্ষা এই ধর্মও ভাল—কেবল ইহাই এই ধর্মসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। গীতার শিক্ষাও এইরূপ বলিয়া মনে হয়।

কেবল বেদান্তধর্মই মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যায় এবং কেবল ইহাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সকলকে দেখাইয়া দেয়।

লৌকিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্তধর্মের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) লৌকিক হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহার জন্য বিভিন্নপ্রকার স্থূলমূর্তি বা কোন প্রকার প্রতীক, নানাপ্রকার স্থূল উপকরণ, পুরোহিত ও মন্ত্রপাঠ, এবং বিভিন্নপ্রকার ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি আবশ্যক হয়।

কিন্তু বেদান্তধর্মে এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। ইহার জন্য কোন মূর্তি বা প্রতীক, কোন স্থূল উপকরণ, কোন পুরোহিত বা মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি আবশ্যক হয় না। যে কোন স্থানে বসিয়া যে কোন সময় জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক বালক বালিকা, প্রত্যেক

পুরুষ ও স্ত্রীলোক ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারে। এইভাবে প্রত্যেকে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ বা বেদান্তের যুগ হইতে এই এক ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা ভারতের সন্ন্যাসী ও যোগিগণের মধ্যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যে এবং অন্যান্য কিছু কিছু লোকের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে।

(২) লৌকিক হিন্দুধর্ম অনুসারে ধর্মাচরণ করিতে থাকিলেও অনেকের স্বভাব চরিত্রের ভিতর কোন উন্নতি লক্ষিত হয় না। তাহারা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা ও কামনা দ্বারা চালিত হইয়া সমাজের পক্ষে অহিতকর নানাপ্রকার কার্য করিয়া যায়। ইহাতে কেবল যে তাহাদের নিজেদের দুর্ভোগ ঘটে তাহা নহে, তাহারা সমাজের অনেক লোকেরও অমঙ্গল ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ যাহারা খাদ্যদ্রব্যে, ঔষধে ও অন্যান্য দ্রব্যে ভেজাল দেয়, তাহাদের কথা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বেদান্তধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব চরিত্রের ভিতর আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে চায়। প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধনই ইহার লক্ষ্য। এই পুস্তকে প্রধানতঃ বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনার কথা বলা হইয়াছে।

বিদ্যাশ্রমে (ক) আত্মসংযম, (খ) সমদর্শন, (গ) প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা, (ঘ) নিষ্কাম কর্ম ও দান, (ঙ) দৈবীসম্পদলাভের চেষ্টা —এই পাঁচটিকে বিদ্যাশ্রমীর পক্ষে আবশ্যক পঞ্চাঙ্গসাধনা বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমীর জন্য উল্লিখিত পাঁচটি সাধনার সহিত আর একটি সাধনা (চ) মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টাকে যুক্ত করা হইয়াছে।

উল্লিখিত ছয়টি সাধনা প্রকৃত ধর্মের সাধনা এবং এই প্রকার ধর্ম সাধনাই মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

সাধনাশ্রমে উল্লিখিত ছয়টি সাধনার সহিত (ছ) অনাসক্তির সাধনা এবং সন্ন্যাসাশ্রমে আবার তাহাদের সহিত (জ) (সর্বপ্রকার

পার্থিব কামনা) ত্যাগের সাধনাকে যুক্ত করিতে হয়। বেদান্তধর্মের প্রথম ছয়টি সাধনাকে প্রকৃত ধর্মসাধনা বুঝিতে হইবে এবং ইহার সহিত পরবর্তী দুইটি সাধনা করিলে বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনা পূর্ণ হয়। বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনায় সিদ্ধ বা কৃতকার্য হইলে মানুষ (অর্থাৎ সাধক বা সাধিকা) জীবন্মুক্তি (অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় বা পার্থিব জীবনেই মুক্তি) লাভ করে; কিন্তু তখনও তাঁহার স্থূলদেহ থাকায় কিছু দৈহিক কষ্ট আসিতে পারে। জীবন্মুক্ত পুরুষ বা নারী স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া যখন পরলোকে চলিয়া যান তখন তিনি পূর্ণমুক্তি লাভ করেন। পার্থিব জীবনে সাময়িক সুখের সহিত যে দুঃখকষ্ট থাকে, তাহার কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার নিজের মনকে পার্থিব সুখকামনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অতএব মোক্ষ বা মুক্তি শব্দের দ্বারা প্রথমত পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি বুঝিতে হইবে। মুক্ত পুরুষ বা নারী প্রলয়কাল পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহে পরলোকে থাকেন; প্রলয়কালে তাঁহার আত্মা ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। পরলোকে মুক্তপুরুষের বা নারীর স্থূলদেহ কখনও না থাকায়, তাঁহাকে কখনও দৈহিক কষ্ট বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। তিনি তাঁহার সাধনার দ্বারা তাঁহার মনকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে পরলোকে তাঁহাকে কখনও কোনপ্রকার মানসিক দুঃখকষ্টও ভোগ করিতে হয় না। তিনি "অনপেক্ষ" (গীতা ১২।১৬) হইবার শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মানসিক সুখ অন্য কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে না অর্থাৎ অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তিনি জানেন যে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরেরই সনাতন অংশ; সুতরাং ঈশ্বরের যেমন কোনপ্রকার ভোক্তার রূপ নাই, কিন্তু দ্রষ্টার রূপ আছে, সেইভাবে তিনিও ভোক্তার রূপ ত্যাগ করিয়া দ্রষ্টার রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং দ্রষ্টাভাবে তিনি আনন্দলাভ করেন। আত্মসংস্থ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি (অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি) (গীতা ২।৭২) লাভ করায়, তাঁহার মনে সর্বদা স্থির ও নির্মল

আনন্দের ভাব চলিতে থাকে। তাঁহার নিজের আত্মার ভিতর হইতেই এই আত্মিক আনন্দের স্ফুরণ হয়। ঐশ্বরিক ব্যবস্থা অনুসারে তিনি সূক্ষ্মদেহে বিভিন্নলোকে গমন করেন। তিনি সর্বভূতহিতে রত (গীতা ৫।২৫, ১২।৪) থাকিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং সমস্ত জীবের মঙ্গলকামনা করিয়াও তিনি আনন্দ লাভ করেন। অতএব মুক্ত পুরুষ বা নারী পরলোকে প্রথমতঃ দৈহিক কষ্ট হইতে মুক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ সর্বপ্রকার মানসিক দুঃখকষ্ট হইতেও সর্বকালীন বা চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ করিয়া স্থির ও নির্মল আনন্দের অধিকারী হন। মুক্ত পুরুষের বা নারীর অবস্থালাভের জন্য যে প্রকার সাধনা আবশ্যক হয়, তাহা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু কিছু লোক ঐ প্রকার অবস্থালাভকে পরম কাম্য মনে করে; সেইজন্য মোক্ষ বা মুক্তিকে চতুর্থ পুরুষার্থ বা পরম পুরুষার্থও বলা হয়।

মুক্তিলাভের জন্য যে যোগসাধনা আবশ্যক হয়, গীতার ৬।৪০ শ্লোকে তাহাকে কল্যাণকর কর্ম বলা হইয়াছে এবং "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"—অর্থাৎ হে অর্জুন, এই প্রকার কল্যাণকরকর্মকারী কোন ব্যক্তি কখনও দুর্গতি বা দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না—ইহাও বলা হইয়াছে। তাহার পর বলা হইয়াছে "যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি (মৃত্যুর পর) পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিগণের (প্র..তাত্মা-সমূহের) জন্য নির্ধারিত লোকসমূহে বহুবৎসর বাস করিয়া পৃথিবীতে পবিত্রস্বভাব ও শ্রীসম্পন্ন (অর্থাৎ সঙ্গতিসম্পন্ন) লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; অথবা জ্ঞানবান যোগীর গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। পৃথিবীতে এই প্রকার জন্মও খুবই দুর্লভ। পূর্বজন্মে অর্জিত যোগসম্বন্ধীয় বুদ্ধি তিনি ইহজন্মে লাভ করেন এবং সেই অবস্থা হইতে পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান হন। পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ তিনি যেন অবশ হইয়াই যোগের দিকে আকৃষ্ট হন। যোগের জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও বেদের কর্মকাণ্ডকে অতিক্রম করেন (অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের কোন আবশ্যকতা তাঁহার থাকে না)। যত্নবান যোগী প্রকৃষ্ট যত্নের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মের সাধনার

দ্বারা অগ্রসর হইয়া পরাগতি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গতি বা মুক্তি) লাভ করেন"—গীতা ৬।৪১-৪৫

অতএব যোগসাধনা করিয়া ও ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া যে কোন ব্যক্তি (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) ক্রমশঃ মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে।

ধর্ম ও মোক্ষ বা মুক্তির ভিতর যে পার্থক্য আছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বলা যাইতে পারে। ধর্ম ইহলোকে প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র সমাজের দুঃখকষ্ট হ্রাসের চেষ্টা করে এবং পরলোকেও ইহা ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখকষ্টের হ্রাস সাধন করে। ধার্মিক ব্যক্তিরও পুনর্জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে কিছু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু মুক্ত পুরুষের ও নারীর পুনর্জন্ম হয় না এবং তিনি প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত সূক্ষ্ম দেহে বিভিন্ন লোকে বাস করিতে পারেন এবং স্থির ও নির্মল আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন। ধার্মিক লোকের জীবনে দুঃখকষ্টের সাময়িক ও আংশিক নিবৃত্তি হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সাধনা অনুসারে বিভিন্ন জীবনে এই নিবৃত্তির তারতম্যও ঘটে। কিন্তু মুক্ত পুরুষের পারলৌকিক জীবনে চিরকালের জন্য সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্টের আত্যন্তিক (অর্থাৎ যতদূর সম্ভব) নিবৃত্তি হয়।

পরলোকে প্রয়াতাত্মা সূক্ষ্মদেহে সক্রিয়ভাবে থাকে ইহাই গীতার শিক্ষা এবং বর্তমান সময়ে নির্ণীত তথ্য ইহারই সমর্থন করে। কিন্তু খ্রীষ্টানগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্থূলদেহপাতের পর তাহার আত্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বহু সহস্র বৎসর পরে যখন পৃথিবীর ধ্বংসের কাল আসিবে, তখন জোর শব্দ হইতে থাকিবে। তখন সমস্ত সুপ্ত আত্মা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাদের বিচার হইবে। যাঁহারা পৃথিবীতে ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাদের সুকৃতির জন্য স্বর্গে তাহাদের স্থান হইবে। যাহারা পৃথিবীতে নানাপ্রকার কুকার্য করিয়াছে, দুষ্কৃতির জন্য তাহাদের নরকে স্থান হইবে। হিন্দুধর্ম উল্লিখিত প্রকারের মতবাদ সমর্থন করে না। প্রকৃতির ভিতর

বিরামহীনভাবে কার্যকারণের নিয়ম চলিতেছে। সুতরাং কাহারও কোন শেষ বিচার আবশ্যক হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে লোকের কর্মফল ফলে। এই কর্মফল শীঘ্রই ঘটিতে পারে অথবা কিছু পরে অথবা বহু পরে ইহা ঘটিতে পারে। বিষপানের ফল অথবা বিষপ্রয়োগের ফল শীঘ্র ফলে; কিন্তু মিথ্যা, প্রতারণা প্রভৃতির ফল অনেক পরে ফলে। মানুষ নিজেও কুকর্মকারীকে শাস্তি দিয়া কুকার্য নিবারণের চেষ্টা করে। ধর্মশিক্ষাদ্বারাও কুকার্য নিবারণের চেষ্টা করা হয়।

অনন্তকালের তুলনায় মানুষের পার্থিব জীবনের সময় অতি অল্প। এই অল্প সময়ের কুকার্যের জন্য কাহারও অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা ঈশ্বর করেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। হিন্দুধর্ম এইপ্রকার ধারণাকেও সমর্থন করে না। ইহাতে ঈশ্বরের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়। লৌকিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্তধর্ম উভয় ধর্ম মতেই ঈশ্বর ঐ প্রকার নিষ্ঠুর নহেন। পাপ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ও ব্যবস্থা এবং ঐশ্বরিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রার্থক্য আছে।

সপ্তম অধ্যায়

দ্বন্দ্ব ও মায়া

বেদান্তধর্মের আলোচনায় দ্বন্দ্ব ও মায়া সমন্ধে কিছু আলোচনা থাকে এবং গীতাতেও এই দুইটি শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই জন্য এই অধ্যায়ে দ্বন্দ্ব ও মায়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

১। দ্বন্দ্ব :—

দুইটি বিপরীত ভাবের বা অবস্থার সমাবেশকে সংক্ষেপে এক কথায় দ্বন্দ্ব বলা হয়; যথা—শীত ও গ্রীষ্ম, আলোক ও অন্ধকার, রোগ ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও ধনশালিতা, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি। পৃথিবীতে এই প্রকার শত শত দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষকে এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রত্যেক দ্বন্দ্বের ভিতর কিন্তু নানা প্রকার তারতম্য বা ন্যূনাধিক্য থাকে; যথা উত্তাপ কমিয়া গিয়া অতি সামান্য শীতের ভাব আসিল; ঐ শীত ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে অত্যন্ত শীত পড়িল। তাহার পর এই শীত আবার ক্রমশঃ কমিতে লাগিল এবং পরে এই শীত একেবারে চলিয়া গেল। কিন্তু তখনও গরম পড়ে নাই। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী কালকে আমরা বসন্ত কাল বলি এবং সাধারণতঃ এই ঋতুটিই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। কিন্তু তাহার পর ক্রমশঃ গরমের ভাব আসে এবং পরে অত্যন্ত গরম পড়ে। পরে বর্ষাকাল আসে। এই বর্ষাকালে কিছু গরম কমিয়া যায়, কিন্তু বাহিরে যাতায়াত ও কাজকর্মের পক্ষে বর্ষাকাল অনেক মানুষের কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাহা হইলেও যে শস্যের উপর মানুষের জীবন ধারণ নির্ভর করে, বৃষ্টি ব্যতীত সেই শস্যোৎপাদন সম্ভব নহে বলিয়া মানুষ বর্ষাকালকে অভ্যর্থনা জানায়। তাহার পর শরৎ ও হেমন্ত কাল আসে; এই সময় ক্রমশঃ গরম কমিয়া যায় এবং কিছুদিন গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যবর্তী অবস্থা থাকে। পরে আবার ক্রমশঃ শীত আসে।

অতএব প্রতিবৎসর মানুষকে শীত ও গ্রীষ্মের যে দ্বন্দ্ব তাহার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রতি বৎসর পৃথিবী একবার সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিয়া আসে। তাহার ফলে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ষড় ঋতুর আবর্তন চলিতে থাকে। শীত ও গ্রীষ্মের দ্বন্দ্ব প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব। ইহার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ শক্তি নাই। পশুগণের গায়ের লোম ও পক্ষিগণের পালক তাহাদিগের শরীরকে শীতগ্রীষ্ম হইতে কতকটা রক্ষা করে। বুদ্ধিমান মানুষ শীতকালে গরম পোশাক পরিয়া এবং ঘরকে গরম করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া অনেকটা শীত নিবারণ করে; আবার গ্রীষ্ম কালে হাতপাখা, টানাপাখা, বা বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে বায়ু সঞ্চালিত করিয়া এবং ঘরকে ঠাণ্ডা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সে অনেকটা গরম নিবারণ করে।

শীতগ্রীষ্মের দ্বন্দ্ব বাৎসরিক দ্বন্দ্ব, কিন্তু আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব। সূর্যোদয়ে চতুর্দিক আলোকিত হইয়া গেল; কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। তখন মানুষকে নানাভাবে আলোকের ব্যবস্থা করিতে হইল।

শীতগ্রীষ্ম এবং আলোক-অন্ধকারের ন্যায় অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টিও প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব। বায়ুপ্রবাহহীনতা এবং ঝড়ও প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব। এইগুলি মানুষের অসুবিধা বা অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

রোগ ও সুস্থতা এবং দেহের সবলতা-দুর্বলতা মানুষের দেহের বিপরীত অবস্থাদ্বয়ের দ্বন্দ্ব।

যাহা মানুষের পক্ষে সুখদায়ক হয়, তাহার প্রতি মানুষের রাগ বা অনুরাগ থাকে। (সংস্কৃত ভাষায় রাগ শব্দ অনুরাগ, প্রীতি বা ভালবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলায় ইহা ক্রোধ অর্থে ব্যবহৃত হয়।) মানুষের পক্ষে যাহা অসুখকর হয়, তাহার প্রতি তাহার দ্বেষ, বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণার ভাব থাকে। সুতরাং মানুষের মধ্যে রাগদ্বেষরূপ মানসিক দ্বন্দ্ব চলে।

জন্ম মৃত্যুও মানুষের মনে সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব ঘটাইয়া দেয়।

কিন্তু যে দ্বন্দ্ব মনুষ্যকৃত দ্বন্দ্ব এবং মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায়

যে দ্বন্দ্ব হইতে জাত দুর্ভোগের হ্রাস সাধন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য ভারতে যথাযথভাবে চেষ্টা করা হইতেছে না। এই দ্বন্দ্ব দারিদ্র্য ও ধনবত্তার দ্বন্দ্ব। সমস্ত মানুষের মধ্যে অর্থের সমবণ্টন ও সমতারক্ষা স্বপ্নবিলাসীর অবাস্তব স্বপ্নমাত্র। কিন্তু আর্থিক বৈষম্যহ্রাস খুবই সম্ভব। ভারতের নিকটবর্তী কোন কোন দেশে ইহাকে বহুল পরিমাণে বাস্তবে পরিণত করা হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া চলিব তাহা নহে। ভারতবর্ষকে তাহার নিজের আদর্শ অনুসারে চলিয়া তাহার ভিতর দিয়াই আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা ভারতের বহুকোটি নরনারীর মঙ্গল সাধন সম্ভব হইবে।

বেদান্তধর্ম সমস্ত মানুষের দুঃখকষ্টের যতদূর সম্ভব হ্রাসসাধন করিতে চায়। সেই জন্য বেদান্তিগণ সমাজব্যবস্থায় আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের সমর্থক কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ইহা সম্ভব নহে।

ইহার জন্য রাজশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। কিন্তু ভারতে যে ভাবে গণতান্ত্রিক শাসন চলিতেছে, তাহার দ্বারা আর্থিক বৈষম্যহ্রাস কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিছু লোক বিপ্লবের কথা বলে। কিন্তু ভারতের সংবিধানে লিখিত বিধানসমূহের ভিতর দিয়া স্থায়ী বিপ্লব সম্ভব নহে। কেন্দ্রীয় শক্তিতে সর্বজনহিতৈষী যৌথ নেতৃত্ব অধিষ্ঠিত হইলে, তাহার দ্বারা ভারতে বিপ্লবসংঘটন হইতে পারে, কিন্তু ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য তখন সংবিধানের ভিতর বিশেষ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। স্বার্থান্বেষী নেতৃবৃন্দ কিংবা কোন স্বার্থান্বেষী স্বৈরতন্ত্রী নেতা কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদের দ্বারা বিপ্লবসংঘটন সম্ভব হইবে না। সর্বজনহিতৈষী যৌথ নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, নেতাগণের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও বুদ্ধিবলে অপেক্ষাকৃত সহজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হইবে। তখন অন্যায় ও অত্যাচার করিবার স্বাধীনতা এবং কোটি কোটি মানুষকে তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবার স্বাধীনতা কাহারও থাকিবে না। সমাজহিতৈষী সকল ব্যক্তিকে

তখন সর্বজনহিতৈষী সরকারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্যপালনের চেষ্টা করিতে হইবে। সুস্থভাবে জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিলে, জাতিধর্ম ও নরনারী নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হইবে।

কিন্তু ইহার জন্য বহুলোকের সততা আবশ্যক। সুতরাং সমাজে আর্থিক বিপ্লব ঘটাইবার পূর্বে ভারতের মানুষের মধ্যে অন্ততঃ কতকটা মানসিক বিপ্লব ও চারিত্রিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতে উপযুক্ত নেতৃবৃন্দের অভাব ঘটিয়াছে। যতদিন এই অভাব থাকিবে, ততদিন কেবল যে বর্তমান সময়ের ন্যায় দুঃখকষ্ট চালতে থাকিবে, তাহা নহে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃখকষ্ট আরও বাড়িবে। দলের কথা না ভাবিয়া, নিঃস্বার্থভাবে সকলের মঙ্গলচিন্তা করিবে এই প্রকার নেতৃবৃন্দের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

বিভিন্ন দ্বন্দ্বের উপকারিতা এই যে তাহা মানুষকে সক্রিয় করিয়া রাখে। দ্বন্দ্বজনিত দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য মানুষকে নানাভাবে চেষ্টা করিতে হয় এবং বুদ্ধি খাটাইতে হয়। তাহার ফলে মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটিতেছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহার কষ্টের কিছু লাঘব হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টের সম্পূর্ণ নিবারণ কখনও সম্ভব হইবে না।

সেইজন্য কতকটা দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে হইবে—ইহা গীতায় বলা হইয়াছে।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥—গীতা ২।১৪

—হে অর্জুন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়সমূহের সংযোগ হইতে যে শীত বা গরম এবং সুখ বা দুঃখ বোধ হয়, তাহারা আসে এবং চলিয়া যায় ও অস্থায়ী। এইগুলিকে সহ্য কর।—২।১৪

আবার গীতার ২।৪৫ শ্লোকে সকলকে নির্দ্বন্দ্ব হইতে (অর্থাৎ

শীতগ্রীষ্ম বা সুখদুঃখাদির দ্বারা বিচলিত না হইবার কথা) বলা হইয়াছে। গীতার ৫।৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে "যাঁহার কোন লোক বা দ্রব্যের প্রতি দ্বেষভাব নাই এবং কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষাও নাই, তাঁহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও; তিনি নির্দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত) হইয়া অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।" গীতার ৪।২২ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "আপনা হইতেই যাহা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট, যিনি দ্বন্দ্বাতীত (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিহীন ও সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বারা বিচলিত হন না)। যিনি কাহারও অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করেন না এবং কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম করিয়াও তাহার দ্বারা আবদ্ধ হন না।" গীতার ৭।২৭-২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "সমস্ত প্রাণী জন্মের সময় ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দ্বন্দ্বসমূহের দ্বারা মোহগ্রস্ত হইয়া কর্তব্যবুদ্ধি হারাইয়া ফেলে। কিন্তু যে সমস্ত পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তির পাপক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারা দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন।" দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিলে কী অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়, সেই সম্বন্ধে গীতার ১৫।৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "যাঁহারা মান অপমান বোধ ও মোহশূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সর্বপ্রকার আসক্তিহীন হইয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের মন হইতে সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়াছে, এইরূপ মোহমুক্ত ব্যক্তিগণ সুখদুঃখ নামক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া, সেই অব্যয়পদ (অর্থাৎ ঈশ্বর সারূপ্য) লাভ করেন।"

অতএব মুক্তিলাভ করিতে হইলে বা দুঃখকষ্টের লাঘব করিতে হইলে, সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া দ্বন্দ্বাতীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডিউল্যাম বা দোলক যেমন সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর বৎসরের পর বৎসর এদিক ওদিক চলে, মানুষের শারীরিক বা মানসিক অবস্থাও সেইভাবে দ্বন্দ্বের মধ্যে এদিক ওদিক চলে। কোন কোন দ্বন্দ্বের দুইটি দিকই অসুখকর হয়, যথা শীতগ্রীষ্ম, অনাবৃষ্টি-

অতিবৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহহীনতা-ঝড় প্রভৃতি। কোন কোন দ্বন্দ্বের একটি দিক সুখকর এবং অন্যদিকটি অসুখকর হয়, যথা সুস্থতা ও রোগ, জন্ম ও মৃত্যু, অর্থাগম ও অর্থাভাব প্রভৃতি। অসুখকর অবস্থা নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু যাহা অনিবার্য তাহা সহ্য করিতেই হইবে। কোন স্থলে কি করা উচিত, তাহা লইয়াও কখন কখন মানুষের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

২। **মায়া :—**

মায়া শব্দটির অর্থ ইন্দ্রজাল বা জাদু বা ভোজবাজি। ঐন্দ্রজালিক বা জাদুকর বা ভোজবাজিকর ২।৩ ঘণ্টা বা ৪ ঘণ্টা ধরিয়া কত রকমের বিস্ময়কর কার্য দেখায়। দর্শকগণের সম্মুখে ও জাদুকরের পশ্চাতে একটি মজবুত পর্দা ঝুলিতেছে। ইহার কোন স্থানে কোন ছিন্নভাব নাই। কিন্তু জাদুকর পর্দার যে কোন স্থান তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সেই স্থান হইতে এক একখানি তাস তাহার দক্ষিণ হস্তে চলিয়া আসে। অথচ ইহার পূর্বে তাহার কোন হাতে বা পর্দার কোন স্থানে একখানিও তাস ছিল না।

তাহার পর জাদুকর একটি ফাঁপা নল বা চোঙা লইয়া কোন কোন দর্শককে দেখাইয়া দিল যে ফাঁপা নলটির ভিতর কিছুই নাই এবং ইহার দুই মুখও খোলা। কোন দর্শক তাহাকে একখানি সাদা রুমাল দিলে, সে ঐ রুমালখানি চোঙেব ভিতর পুরিয়া দিল এবং বলিল যে তাহার মন্ত্রবলে ঐ চোঙের ভিতর ১০।১২ খানি বিভিন্ন রং এর রুমাল উৎপন্ন হইবে। অন্য কোন কোন জাদু দেখাইবার পর সে টেবিলের উপর হইতে চোঙাটি লইয়া তাহার ভিতর হইতে বিভিন্ন রংএর ১০।১২ খানি রুমাল টানিয়া বাহির করিল এবং সাদা রুমালটি তাহার মালিককে ফেরত দিল। সাধারণ জাদুকর এইপ্রকার জাদু দেখায়; সুদক্ষ জাদুকর ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্ময়কর নানাপ্রকার জাদু দেখায়।

বিরাট বিশ্বে প্রকৃতিই সর্বাপেক্ষা বিরাট জাদুকর। সৃষ্টির প্রারম্ভ

হইতে সে কতপ্রকার বিস্ময়কর কার্য করিয়া চলিয়াছে। আমরা এখন চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছি, সৃষ্টির পূর্বে তাহার কিছুই ছিল না। তখন ছিল বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তি সমন্বিত একাকার সূক্ষ্ম জড়শক্তি। চিৎশক্তির প্রেরণায় জড়শক্তিরূপা প্রকৃতি সূর্য চন্দ্র পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদি উৎপন্ন করিল। পরে পৃথিবীর উপরিভাগ প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশের উপযোগী হইলে, প্রকৃতি জলে জীবাণু ও জলচর প্রাণী প্রভৃতি এবং স্থলে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষলতাদি, কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষী প্রভৃতি সৃষ্টি করিল। অবশেষে প্রকৃতি তাহার নিজদেহের উপাদনসমূহ দিয়া মানুষের দেহনির্মাণ আরম্ভ করিল এবং ঈশ্বরেচ্ছায় ঐশ্বরিক চিৎশক্তির একটা ক্ষীণ অংশ দেহনির্মাণের প্রারম্ভ হইতে ইহার সহিত যুক্ত হইল। ইহাকেই আমরা জীবাত্মা বলি এবং জীবাত্মা পশ্চাতে থাকায় মন, বুদ্ধি ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দিকে রহিয়াছে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ু আমাদিগের জীবনধারণে সাহায্য করিতেছে। পৃথিবী লাটিম বা লাট্টুর ন্যায় ঘুরিতে থাকায়, বৃক্ষলতাদি ও প্রাণিগণের জীবনধারণের জন্য যে আলোক ও উত্তাপ আবশ্যক, তাহা আমরা প্রত্যহ সূর্যের নিকট হইতে পাইতেছি। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী আবার সূর্যের চতুর্দিকে সুনির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে বাধ্য হইতেছে এবং তাহার ফলে ষড়ঋতুর আবর্তন চলিতেছে। বর্ষাকালে পুকুর, ডোবা, খাল, বিল প্রভৃতি জলমগ্ন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু পরে আবার আমাদের অলক্ষ্যে সমুদ্র, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি হইতে জলীয় বাষ্পরাশি আকাশে উঠিয়া যাইতেছে এবং ইহা বৃষ্টিরূপে পুনরায় স্থলভাগের উপর পতিত হওয়ায়, স্থলভাগ শস্যশালী হইতেছে। এই শস্য ও ফল প্রভৃতির সাহায্যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জীবনধারণ করিতেছে। প্রকৃতির কার্যাবলী বিস্ময়কর এবং ইহাদের মধ্যে আমরা শৃঙ্খলাও দেখিতে পাইতেছি।

প্রকৃতি পাঞ্চভৌতিক (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই

পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত) জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীতে সুখে জীবন ধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, ঔষধ, পথ্য, যানবাহন প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমস্ত দ্রব্য বা তাহাদের উপাদানসমূহ আমরা পাঞ্চভৌতিক জগৎ হইতে পাইতেছি। ধান ও গম হইতে আমরা আমাদের প্রধান খাদ্য পাই। যেখানে যত মাটি আমরা খুঁড়ি না কেন, কোন জায়গায় আমরা ধান বা গম দেখিতে পাইব না। কিন্তু সুকৌশলে চাষ করিতে পারিলে, সামান্য ধান ও গম হইতে প্রকৃতি তাহার বহুগুণ ধান ও গম উৎপন্ন করিয়া আমাদিগকে দেয়। মাটির ভিতর তুলো পাওয়া যাইবে না। কিন্তু মাটিতে তুলোর বীজ বপন করিলে, প্রকৃতিই আমাদিগকে বাঞ্ছিত তুলো প্রদান করে। তাহা হইতে আমরা আমাদের পোশাক প্রভৃতি তৈরি করি। প্রকৃতি পঞ্চভূত হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি এবং সর্বপ্রকার প্রাণিদেহ ও আমাদের দেহও উৎপন্ন করে। অতএব প্রকৃতি নিজশক্তি হইতে কেবল যে সূর্যচন্দ্র পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে। সে পৃথিবীতে পঞ্চভূত হইতে সহস্র সহস্র প্রকার দ্রব্য, বৃক্ষলতাদি এবং প্রাণিদেহও সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই তাহার মায়া, বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি বা জাদুকরী শক্তি।

সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥ ৪।১০

—প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিও, এবং যিনি মহান্ ঈশ্বর, তিনিই মায়ী (অর্থাৎ এই মায়াযুক্ত)। এই সমস্ত জগৎ তাঁহার অঙ্গস্বরূপ সত্ত্বা দ্বারা ব্যাপ্ত। ৪।১০

ঈশ্বরের জড়রূপা শক্তি প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনটি জিনিস মনে রাখিতে হইবে।

(১) প্রকৃতি নিজ শক্তি হইতে স্থূল বা সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার পদার্থের এবং প্রাণিদেহের সৃষ্টি করে।

(২) প্রকৃতি যাহা কিছু সৃষ্টি করে, তাহা পরিবর্তনশীল এবং তাহার ভিতর নামরূপের পরিবর্তন চলে।

(৩) প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট সমস্তই বিনাশশীল এবং কালক্রমে সমস্তই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই তিনপ্রকার কাজ করিবার শক্তিকে প্রকৃতির মায়াশক্তি বলা হয়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥—গীতা ৯।১০

—ঈশ্বরের অধ্যক্ষতায় (অর্থাৎ ইচ্ছায় বা পরিচালনায়) প্রকৃতি প্রাণী অপ্রাণী সমস্তই সৃষ্টি করে; সেইজন্য জগৎ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়।—৯।১০

উপরে একটি সাধারণ জাদুকরের দুইটি জাদুর কথা (একটি পর্দা স্পর্শ করা মাত্র তাহা হইতে তাসের পর তাস বাহির হইয়া আসা এবং একটি নলের ভিতর একটি সাদা রুমাল হইতে কয়েকটি বিভিন্ন রংএর রুমাল উৎপাদনের কথা) বলা হইয়াছে। কিন্তু জাদুকর মানুষ ও জাদুকর প্রকৃতির ভিতর দুইটি বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ মানুষ জাদুকর নানাপ্রকার কৌশল আয়ত্ত করিয়া সাধারণতঃ দর্শকগণের দৃষ্টিভ্রম উৎপন্ন করে। কিন্তু প্রকৃতি ঐরূপ করে না। সূর্যকিরণের ভিতর অবস্থিত ঝিনুকের ভিতরের কিছু পরিষ্কার অংশ দেখিয়া যদি কেহ তাহাকে রূপো মনে করে অথবা অন্ধকারে কতকটা দড়ি দেখিয়া যদি কেহ তাহাকে সাপ মনে করে, তাহা হইলে ইহার জন্য প্রকৃতি দায়ী নহে। রোদে ঝিনুক ও রূপো এবং অন্ধকারে দড়ি ও সাপ অনেকটা একই রকম দেখায় বলিয়া, কোনও লোকের ভ্রম হইতে পারে। ভালভাবে দেখিলে এই ভ্রম চলিয়া যায়। কিন্তু মানুষ জাদুকর তাহার কার্য কাহাকেও নিকটে গিয়া ভালভাবে দেখিতে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ মানুষ জাদুকরের সময় সীমাবদ্ধ। সে দুই তিন ঘণ্টার ভিতর কিছু জাদু দেখাইয়া কিছু উপার্জন করিতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির সময় অফুরন্ত।

সে তাহার সময় অনুসারে উৎপন্ন করে, পরিবর্তন করে ও ধ্বংস করে। কয়েক মাসের মধ্যে প্রকৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনেক ধান ও গম উৎপন্ন করিয়া দেয় এবং ধানগাছ ও গমগাছ শুকাইয়া যায়। একটি আমের আঁঠি হইতে প্রকৃতি শত শত আম উৎপন্ন করিয়া দিতে পারে। কিন্তু আঁঠি হইতে গাছ হইয়া, গাছ বড় হইলে প্রকৃতি তখন ইহা হইতে আম উৎপন্ন করে। শুকনো ধান ও গম এক বৎসর রাখা যায় কিন্তু পাকা আম সাধারণতঃ কয়েকদিন পরে পচিতে আরম্ভ করে। প্রথমে একটি আঁঠি কোন লোকের হাতে ছিল। সে ইহাকে মাটিতে পুঁতিবার পর কিছুদিন পরে ইহার নামরূপের পরিবর্তন হইল, ইহা একটি ছোট আমগাছের রূপ ধারণ করিল। কয়েকবৎসর পরে গাছটি বড় হইলে, ইহাতে মুকুল দেখা গেল এবং পরে কিছু আম হইল। ইহাও নামরূপের পরিবর্তন। কিছু বৎসর পরে গাছটি মরিয়া গেল ও কাঠে পরিণত হইল। তখন ডালপালা কাটিয়া তাহাকে জ্বালানী কাঠ করা হইল এবং ঐগুলি ভস্মে পরিণত হইল। এইভাবে প্রকৃতির ভিতর নামরূপের পরিবর্তন চলিয়াছে। সুতরাং সমস্ত প্রকৃতি মায়াময় এবং আমরা সমস্ত মানুষ মায়াময় জগতে বাস করিতেছি। আমাদের আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্বন্ধও এই মায়ার অন্তর্গত। এই মায়া সাময়িকভাবে সত্য; কিন্তু আমরা ইহাকে চিরন্তন সত্য মনে করিয়াই ভুল করি।

গীতার ১৮।৬১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

—ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রচালিতের ন্যায় মায়াদ্বারা চালিত করিয়া সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন।—গীতা ১৮।৬১

ঈশ্বর জীবাত্মারূপে সমস্ত প্রাণীর ভিতর বর্তমান। কিন্তু প্রাণিগণের দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির মায়ার ভিতর (অর্থাৎ নামরূপের পরিবর্তনের ভিতর) অবস্থিত থাকায়, তাহারা সাধারণতঃ মায়ার

দ্বারা চালিত হয়। তাহারা সাময়িক সত্যকে চিরন্তন সত্য মনে করিয়াই ভুল করে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥—গীতা ৭।১৫

—স্থূলবুদ্ধি কুকর্মকারী অধমপ্রকৃতির মানুষেরা মায়ার প্রভাবে জ্ঞানশূন্য হইয়া আসুরিক ভাবকে আশ্রয় করায়, তাহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় না।—গীতা ৭।১৫

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥—গীতা ৭।১৪

—ঈশ্বরের এই গুণময়ী (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত) দৈবী (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরণায় কার্যকরী এই প্রাকৃতিক) মায়া দুরতিক্রম্য (অর্থাৎ অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়)। যাহারা (চিরসত্য) ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহারা এই (পরিবর্তনময়) মায়াকে অতিক্রম করে।—গীতা ৭।১৪

জগৎ মায়াময় এবং সমগ্র বিশ্বে প্রকৃতির মায়ার খেলা চলিতেছে। পূর্বে যে নানাপ্রকার দ্বন্দ্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা এই মায়ার ভিতর অবস্থিত। শীত-গ্রীষ্ম, আলোক-অন্ধকার, রোগ ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও আর্থিক সঙ্গতি, জন্মমৃত্যু ইত্যাদি সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বই মায়ার অঙ্গ। দ্বন্দ্বের দুইটি বিপরীত অবস্থাই যদি অসুখকর হয়, তাহা হইলে লোকে দুইটিই পরিহার করিতে চায়; যথা শীত ও গ্রীষ্ম। কিন্তু যদি একটি অবস্থা অসুখকর হয়, যথা রোগ, দারিদ্র্য প্রভৃতি, তাহা হইলে লোকে ইহাকে পরিহার করিয়া, দ্বিতীয় সুখকর অবস্থাটি লাভ করিতে ও রক্ষা করিতে চায়, যথা সুস্থতা, আর্থিক সঙ্গতি প্রভৃতি।

মানুষ স্থায়ীভাবে সুখশান্তি লাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে যে ইহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নহে, তাহা গীতায় পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে এবং এই পুস্তকেও এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে। অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া ধর্মের পথে চলিলে এবং দ্বন্দ্ব ও মায়ার ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিলে, পৃথিবীর অনেক দুঃখকষ্ট

এড়ান যাইতে পারে এবং পরলোকেও সুখশান্তির অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য বিভিন্ন আশ্রমে যে সাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা আবশ্যক। মুক্তি লাভের জন্য সাধনাশ্রমে যে বিশেষ সাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই মায়া ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠিবার সাধনা এবং আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা।

অধিকাংশ লোক মায়ার অধীন হইয়া পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকে এবং পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা দেওয়াল ঘড়ির দোলকের ন্যায় একবার দ্বন্দ্বের একদিকে এবং পরে দ্বন্দ্বের বিপরীত দিকে যায় এবং এইভাবে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে এদিক ওদিক করিতে থাকে।

বিশ্বে কোন অনন্ত সরলরেখা নাই। সেইজন্য সকলেরই অগ্রপশ্চাৎ গতি, অথবা বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে (বা ডিম্বাকারে) গতি চলে। অন্য প্রকার বক্র পথেও গমন-প্রত্যাগমন ঘটিতে পারে। কেবল এইপ্রকার গতিই সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে পারে। পৃথিবী উপবৃত্তাকারে সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া তাহার গতি কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া চলিতেছে ও চলিবে। দেওয়াল ঘড়ির দোলকের অগ্রপশ্চাৎ গতি হওয়ায়, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর ইহারও অগ্রপশ্চাৎ গতির কোন অসুবিধা হয় না এবং যতদিন ঘড়িটি ঠিক থাকে, ততদিন দোলকের গতিও চলে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে প্রকৃতির মায়ার (বা নামরূপের পরিবর্তনের) খেলা চলিতে থাকে। কেবল যতদিন প্রলয়ের অবস্থা থাকে, ততদিন প্রকৃতি সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মে প্রলীন হইয়া থাকায়, তাহার খেলা বন্ধ থাকে।

পরলোকেও মায়ার খেলা চলে। কিন্তু সেখানে মানুষের স্থূলদেহ না থাকায়, তাহার দৈহিক রোগজনিত কষ্ট থাকে না। পরলোকে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মভাবে বা ঈশ্বর সারূপ্যে স্থিতিলাভ করেন বলিয়া, মায়ার কার্যকলাপ দ্রষ্টারূপে দেখিতে থাকিলেও, তিনি মায়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হন না। ইহলোকেও যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাধনার দ্বারা বহুল পরিমাণে ঐরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

(ক) জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ

(খ) অমঙ্গল সমস্যা

(ক) জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ :—

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম (বা ঈশ্বর)—এই তিনটির প্রকৃত স্বরূপ এবং ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং ভারতে প্রাচীনকালে যে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে। (১) বৈশেষিক, (২) ন্যায়, (৩) সাংখ্য (৪) পাতঞ্জল, (৫) পূর্বমীমাংসা, (৬) উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত—এই ছয়টি ভারতের ষড়দর্শন নামে পরিচিত।

সমস্ত মানুষের ভিতর চিৎশক্তি (বা চেতনাশক্তি) কাজ করিতেছে —ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি এবং এই সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। কোন দেহে প্রাণশক্তি নিষ্ক্রিয় হইলে, সেই দেহে চিৎশক্তিও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় এবং তখন সেই দেহ শবদেহে (বা মৃত-দেহে) পরিণত হয়। অতএব প্রাণশক্তিকে ভিত্তি করিয়া তাহারই উপর চিৎশক্তি বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রাণশক্তিকে আমরা চিৎশক্তির প্রাথমিক ও পূর্বপ্রকাশ বলিতে পারি। মানবদেহে প্রাণশক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইলে, তাহার ভিতর যে চিৎশক্তি থাকে, তাহার ক্রিয়াও কি চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়? ভারতের সমস্ত দর্শনের শিক্ষা এই যে মানুষের মৃত্যুর অর্থ তাহার স্থূলদেহের বিনাশ। মৃত্যুর পর তাহার আত্মা বর্তমান থাকে এবং সূক্ষ্ম দেহে এই আত্মা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, আমিত্ববোধ ও বুদ্ধিকে লইয়া পরলোকে চলিয়া যায়। এই সম্বন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে এবং গীতার শিক্ষা কী তাহাও বলা হইয়াছে।

মানুষ ইহলোকে দীর্ঘদিন সুখে বাঁচিয়া থাকিতে চায় এবং পরলোকেও সে সুখে শান্তিতে থাকিতে চায়। ইহার জন্য মানুষের কী করা আবশ্যক ? প্রত্যেক দর্শনে বলা হইয়াছে যে ইহা তাহার কর্মের উপর নির্ভর করিবে। কর্মফলের নিয়ম অনুসারে যে যেমন কর্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে—অর্থাৎ কোন কোন কর্মের ফল হইবে তাহার দুঃখ কষ্ট। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে অন্যান্য মানুষের কার্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের কার্য তাহার নিজের কার্যের সহিত যুক্ত হইয়া ফলাফল নির্ধারণ করে।

জীবকে (অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে) ও বৃক্ষলতাদিকে এবং আমাদের চতুর্দিকে অবস্থিত জড় জগৎকে আমরা চোখে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নামে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর অন্য কোন কিছু আছেন কি ? বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসা দর্শনের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা নাই। কর্মফলের নিয়ম অনুসারে সুকর্ম করিয়া এবং আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ পূর্ণসুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে। ইহা ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য ঐ চারিটি দর্শনে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাই। পরে কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকে সামান্যভাবে যুক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম কতকটা সাংখ্য দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ইহাতেও ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা নাই। ইহা নানাপ্রকার উচ্চ সুনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

[ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত হওয়ায় এবং সাধারণ লোকের পক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা কষ্টকর হওয়ায়, বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উচ্চ সুনীতিসমূহের সহিত বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ যুক্ত করিলে বৌদ্ধধর্ম পূর্ণতা লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের উচ্চ সুনীতিসমূহ এবং বেদান্তধর্মের উচ্চ সুনীতিসমূহ—উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদ, গীতা ও এই পুস্তকে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না, তাহারা

বেদান্তধর্মের উচ্চ সুনীতিসমূহ মানিয়া চলিলে, তাহার দ্বারা তাহাদের নিজেদের ও সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। কারণ সুনীতি-হীন ও অসচ্চরিত্র ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি অপেক্ষা সুনীতিপরায়ণ ও সচ্চরিত্র নিরীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাসহীন ব্যক্তি অনেক ভাল।]

পাতঞ্জল বা যোগ দর্শনে ঈশ্বরকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মানুষ যদি সুনীতিসমূহ অবলম্বন করিয়া মনকে পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার নিজ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে ও ঈশ্বরচিন্তা করিতে পারে, তাহা হইলে সে বাঞ্ছিত সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারে। শেষ দর্শন বেদান্তে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে মুখ্য (বা প্রধান) স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং গীতায় আবার ঈশ্বরকে সাধনার কেন্দ্রস্থানে বসান হইয়াছে। এইভাবে ভারতে ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বেদের কর্মকাণ্ডে বহুদেবদেবীর তুষ্টি সাধনের জন্য যাগযজ্ঞ ও স্তবস্তুতির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরে যখন উপনিষদের যুগ আরম্ভ হইল এবং গভীর চিন্তাশীল ঋষিগণ এই শৃঙ্খলাযুক্ত বিরাট বিশ্বের ভিতর কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করিতেছেন কিনা সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে এক অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য চিৎশক্তি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি প্রাণী-অপ্রাণী সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাদের ভিতর তাহার নিয়ম অনুসারে নামরূপের পরিবর্তন সাধন করিতেছে, এবং যাহার বিনাশের জন্য যে কাল নির্দিষ্ট আছে, সেই সময় আসিলে তাহার বিনাশসাধন করিতেছে। প্রকৃতি তাহার এই সমস্ত কাজ তাহার সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করে, খামখেয়ালি-ভাবে নহে। মানুষের মনোবুদ্ধির সীমাবদ্ধ শক্তি প্রকৃতির জটিল ও সূক্ষ্ম নিয়মাবলী বুঝিতে না পারিয়া প্রকৃতির কোন কোন কাজকে খামখেয়ালির কাজ ও বিশৃঙ্খল কাজ মনে করে। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে যে এক সূক্ষ্ম বিরাট বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তি রহিয়াছে এই ধারণা

পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের কোন কোন ঋষির মনে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে ভারতে এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ও এক শ্রেণীর সাধক ইহাকে যথার্থ ও প্রকৃত সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া এই মহান সত্যের ধারক ও বাহকরূপে কার্য করিয়া আসিতেছেন।

সুপ্রাচীন ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা উল্লিখিত ধারণার লিখিত প্রকাশ দেখিতে পাই।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।—৬।২।১

—হে সৌম্য, অগ্রে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) এই বিশ্ব এক ও অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্তমান ছিল।

(সংস্কৃত অস্ ধাতু হইতে অস্তি এই ক্রিয়াপদের উৎপত্তি হয়। অস্তির অর্থ আছে। অস্ ধাতুর শতৃ প্রত্যয় করিলে সৎ শব্দের উৎপত্তি হয় ; সুতরাং সৎ শব্দের অর্থ যাহা আছে, ছিল, ও থাকিবে)

তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।—৬।২।৩

—সেই সৎ দেখিলেন বা সংকল্প করিলেন "আমি বহু হই, উৎপন্ন হই।"

অতএব সৃষ্টির পূর্বে যে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা ছিল, তাহা চিৎশক্তি সমন্বিত ছিল ; কারণ চেতনাশক্তি না থাকিলে, ঈক্ষণশক্তি (অর্থাৎ সংকল্প শক্তি) আসিতে পারে না।

তত্তেজোঽসৃজত।—৬।২।৩

—সেই সৎ তেজ সৃষ্টি করিল।

তেজ বা তাপকে আমরা অচেতন শক্তি বলিয়া জানি। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে যে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা ছিল, তাহার ভিতর চিৎশক্তির সহিত জড়শক্তি তাপ প্রভৃতিও ছিল কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্য হেতু তাহারা অব্যক্ত আকারে ছিল। পরিদৃশ্যমান জগতের সূক্ষ্ম অবস্থাকেই মূল প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি স্থূলভাব ধারণ করিলে, তাহাকে আমরা জগৎ বলি। বিশ্বে ব্যাপকভাবে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তির নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মের কোন প্রকার

স্থূলরূপ নাই। কিন্তু প্রকৃতি অতি সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলরূপ—উভয় রূপই ধারণ করিতে পারে। সেইজন্য প্রকৃতিকে মহৎ ব্রহ্ম বলা হয়। প্রলয় কালে ব্রহ্মের অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তির ন্যায় প্রকৃতিও অতি সূক্ষ্ম অচিৎ শক্তির রূপ ধারণ করে এবং উভয় শক্তি একাকার হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। প্রলয়কে বিশ্বশক্তির নিদ্রাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই নিদ্রা চির নিদ্রা হইলে, ইহা মৃত্যুরই অবস্থা হইত, কিন্তু ইহা এইরূপ হয় না। মানুষের যথাসময়ে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় বিশ্বশক্তিরও নিদ্রাভঙ্গ যথাসময়ে হয় এবং তাহার আবার লীলা বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। তখন প্রলয় কালের সেই একাকার শক্তি হইতে নানাপ্রকার জড়শক্তির এবং নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দ্রব্যের উদ্ভব হয়। পরে ব্রহ্মের চিৎশক্তি প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিলে তাহাকে জীব বলা হয়। প্রলয়াবস্থা যতদিন চলিতে থাকে ততদিন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন। ঐ সময় তাঁহার কোন গুণের প্রকাশ না থাকায়, তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়। প্রলয় কালের অবসানে ব্রহ্মের প্রেরণায় প্রকৃতি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্ম দ্রষ্টা, প্রেরয়িতা ও নিয়ন্তার কার্য করেন। তখন ব্রহ্মের ঐ প্রকার গুণের প্রকাশ হওয়ায় ব্রহ্মকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলা হয়। অতএব ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তিরূপে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। প্রলয়কালে অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তি ও অতি সূক্ষ্ম অচিৎশক্তি একাকার হইয়া যায় এবং এই ভেদহীন, একাকার ও বিনাশহীন সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে "সৃষ্টির পূর্বে সৎ এক ও অদ্বিতীয় রূপে বর্তমান ছিল।" চিৎশক্তিরূপ ব্রহ্ম যেমন নিজের বিনাশ সাধন করিতে পারেন না, সেইভাবে অচিৎ শক্তির বিনাশ সাধনও তাঁহার সাধ্যাতীত। এই অচিৎশক্তিই প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরিয়া নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ অবস্থায় না থাকিয়া ব্রহ্মের পুনরায় লীলা বা খেলা করিবার ইচ্ছা হইলে, সূক্ষ্ম চিৎশক্তিতে প্রলীন সূক্ষ্ম অচিৎশক্তির সত্ত্বরজস্তমো গুণের সাম্যভাব নষ্ট হইয়া

যায় এবং অচিৎশক্তি চিৎশক্তি হইতে পৃথকভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, "সেই সৎ তেজ সৃষ্টি করিল।" এই তেজই অচিৎশক্তি বা প্রকৃতির একটি রূপ। উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এক ও অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্ম কিভাবে দুইটি সত্তার (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও প্রকৃতির) রূপ ধারণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। অতএব সৃষ্টির অর্থ—ব্রহ্মের প্রথমতঃ একরূপ হইতে দুইটি রূপ ধারণ এবং পরে দুই রূপ হইতে বহুরূপ ধারণ। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র, বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র প্রভৃতি এবং বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, অন্যান্য জীবজন্তু ও মনুষ্যগণের স্থূলদেহ—ইহারা সকলেই প্রকৃতির স্থূলরূপ।

ঈশ্বর প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিতে (অর্থাৎ ইহাকে শূন্যে পরিণত করিতে) অক্ষম বলিয়া; গীতায় বলা হইয়াছে, "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" (১৩।১৯)—প্রকৃতি ও পুরুষ (অর্থাৎ পরম পুরুষ ঈশ্বর) উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিও। যাহার আদি (অর্থাৎ জন্ম বা উৎপত্তি) নাই, তাহার অন্ত (অর্থাৎ বিনাশও) নাই। অতএব ব্রহ্মের ন্যায় প্রকৃতিও অবিনশ্বর। প্রকৃতির ভিতর বিরামহীনভাবে কেবল নামরূপের পরিবর্তন চলিতে থাকে। আজ যাহারা মৎস্যরূপে জলাশয়ে সঞ্চরণ করিতেছে অথবা ছাগরূপে চরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষ তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল ও তাহাদিগের ভক্ষণোপযোগী অংশ রন্ধন করিয়া আহার করিল। ইহা মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত হইল। ইহা কেবল নামরূপের পরিবর্তন। ইহাকেই প্রকৃতির ইন্দ্রজাল বা মায়া বলা হয়। পিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতির কত সুন্দর ও আদরের দেহ ধ্বংস হইয়া যায় এবং মৃতদেহকে দগ্ধ করিলে ইহা কয়েক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হয়। ইহাও প্রকৃতির ভিতর নামরূপের পরিবর্তন ও প্রকৃতির মায়া।

কিন্তু বিশ্বে যে কেবল প্রকৃতির লীলা বা খেলা চলিতেছে, তাহা নহে। ঈশ্বরও এই খেলায় যোগদান করেন। গীতায়

ঈশ্বরকে পুরুষরূপে এবং প্রকৃতিকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভংদধাম্যহম্
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাংব্রহ্মমহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪।৪

—মহৎ ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) আমার (অর্থাৎ ঈশ্বরের) যোনি (অর্থাৎ জীবোৎপাদন স্থান)। আমি সেই স্থানে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে) গর্ভসঞ্চার করি। তাহা হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। ১৪।৩

সমস্ত জীবোৎপত্তিস্থানে যে সমস্ত মূর্তির (অর্থাৎ স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, মহৎব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতিই) তাহাদের উৎপত্তিস্থান এবং আমিই (অর্থাৎ ঈশ্বরই) তাহাদের বীজপ্রদানকারী পিতা। ১৪।৪

পুরুষ পুত্রকন্যা লাভ করিবার জন্য অভিলাষী হইলে, যেমন তাহাকে তার স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সেইভাবে ঈশ্বরেরও জীবরূপে খেলা করিবার ইচ্ছা হইলে, তাঁহাকে প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বর তখন প্রকৃতির অতিক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া নিজের চিৎশক্তিজাত চিদণু বা চিৎকণাসমূহের আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই চিদণু বা চিৎকণাসমূহকে জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মাগণের যে এক অক্ষর (অর্থাৎ অব্যয় বা অবিকারী বা পরিবর্তনহীন) ভাব আছে, ও একটি ক্ষর (অর্থাৎ বিকারী বা পরিবর্তনশীল) ভাব আছে, সেই সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বানি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬

—এই জগতে ক্ষর ও অক্ষর এই দুইপ্রকার পুরুষ আছে। সমস্ত ভূত (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, আমিত্ববোধ ও বুদ্ধি—নূতনভাবে উৎপন্ন এই সমস্ত) ক্ষর পুরুষ এবং যিনি কূটস্থ (অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের অংশরূপ চিদণু বা চিৎকণা) তিনি অক্ষর পুরুষ। ১৫।১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ গীতা ১৫।১৭

—(ঐ দুইটি পুরুষ হইতে) অন্য যে উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়; সেই অব্যয় (অর্থাৎ অবিকারী ও বিনাশহীন) ঈশ্বর ত্রিলোকে ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলের ভরণপোষণ করিতেছেন। গীতা ১৫।১৮ (ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতিই এই ভরণপোষণ কার্য সম্পন্ন করে)।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ গীতা ১৫।১৮

—যেহেতু আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, জগতে ও বেদে আমি (অর্থাৎ ঈশ্বর) পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।—গীতা ১৫।১৮

উল্লিখিত অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ গীতা ১৫।৭

—আমারই (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সনাতন (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বা অমর) অংশ জীবলোকে জীবরূপ ধারণ করিয়া প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে (অর্থাৎ মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক —এই ছয়টিকে) (বিষয় ভোগের জন্য) আকর্ষণ করিয়া থাকে। গীতা ১৫।৭

অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা দেহমধ্যে থাকায়, ক্ষর পুরুষ (অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, আমিত্ববোধ ও বুদ্ধি) সক্রিয় হয় এবং এই ক্ষর পুরুষই সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্বন্দ্বের অধীন ও মায়ার অধীন হয়। অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা অমর হওয়ায় মৃত্যুর (অর্থাৎ স্থূল দেহপাতের) পর ইহা পরলোকে চলিয়া যায়।

(সূক্ষ্ম দেহে জীবাত্মা যখন পরলোকে যায়, সে সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে, আমিত্ববোধ, মন ও বুদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া যায়—ইহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে)।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ গীতা ১৩।২১

—পুরুষ (অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ) প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত থাকিয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করে। গুণসমূহের প্রতি আসক্তিবশতঃ সে সৎ বা অসৎ মানুষ মানুষীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। গীতা ১৩।২১ (নিকৃষ্ট গুণসমূহে আসক্ত হইলে, অর্থাৎ নানাপ্রকার দোষে স্বভাব দূষিত হইলে, অধমলোকের গৃহে এবং উৎকৃষ্ট গুণসমূহে আসক্ত হইলে, উত্তম লোকের গৃহে জীবাত্মার জন্ম হয়)।

(গীতার ১৩।২১ শ্লোকে অসদ্যোনি এবং ১৪।১৫ শ্লোকে মূঢ়যোনি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতার অনেক ব্যাখ্যাকার ইহা মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীর যোনি—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অধম প্রকৃতির মানুষ পুনরায় পশুপক্ষী সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে—ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা হইতে পারে না—এমন নহে)।

(১) ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, (২) প্রকৃতি ও জগৎ এবং (৩) জীব সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে এবং এই পুস্তকের অন্য কোন কোন স্থানেও এই সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা বোধ হয় বিশেষ কষ্টকর হইবে না। উপনিষদসমূহই প্রকৃত বেদান্ত এবং গীতা তাহার অনুগামী। সুতরাং উপনিষদ ও গীতার শিক্ষাই বেদান্তের শিক্ষা এবং উপরে তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্তের আচার্যগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে—যথা দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (বা ভেদাভেদবাদ) প্রভৃতি।

অদ্বৈতবাদিগণের প্রধান মত নিম্নলিখিত শ্লোকার্ধের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ব্রহ্ম যে সত্য অর্থাৎ ছিলেন, আছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবেন—এই বিষয়ে বেদান্তিগণের মধ্যে দ্বিমত নাই। কিন্তু জগৎ

অর্থাৎ সূর্যচন্দ্র পৃথিবী ও নক্ষত্রাদি, সমুদ্রপর্বত ঝড়বৃষ্টি, বৃক্ষলতাদি ও অগণিত পশুপক্ষিদেহ ও নরনারীদেহ—এ সমস্তই কি মিথ্যা? অদ্বৈতবাদী বলেন, "হ্যাঁ, এ সমস্তই মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য; আমরা অবিদ্যা বা অজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া লোকে যে ভাবে রজ্জুকে সর্প মনে করে, সূর্যালোকে শুক্তি বা ঝিনুককে রজত বা রৌপ্য মনে করে, সেই ভাবে ব্রহ্মকে আমরা ঐ সমস্ত দ্রব্যের রূপে দেখিতেছি। যখন আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞতা দূরীভূত হইবে এবং আমরা ব্রহ্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইব, তখন আমরা দেখিব যে একমাত্র সত্য ব্রহ্মই আছেন। আমরা এখন একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে এই স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে এবং তখন আমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখিতে থাকিব।"

কাহারও কাহারও নিকট ইহা আপাততঃ কতকটা সত্য মনে হইতে পারে; কিন্তু জগৎকে ঐ ভাবে দেখা ঠিক নহে। মানুষের দেহমনবুদ্ধি যদি মিথ্যা ও স্বপ্নের ন্যায় হয়, এই মিথ্যাও স্বপ্নের আবার অবিদ্যা ঘটিল কীভাবে? যাহারা অদ্বৈতবাদী নহে, তাহাদের মতে মানুষের মন সাময়িকভাবে সত্য ও ইহার দৃঢ় ভিত্তি আছে; নিদ্রিতা-বস্থায় মানুষের মনের বিকৃতিই স্বপ্ন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে মানুষের মনই যখন মিথ্যা অর্থাৎ নাই, তাহার কোন বিকৃতি বা স্বপ্ন ঘটিতে পারে না।

যদি কোন অদ্বৈতবাদী অসহ্য ক্ষুধা বা রোগযন্ত্রণায় অস্থির হন, এবং আমরা তাঁহাকে বলি, "আপনি যে দারুণ ক্ষুধাবোধ বা রোগ-যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন, ইহা মিথ্যা ও মায়ামাত্র, আপনি একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছেন," আমাদের এই কথা কি তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও নিরস্ত করিবে? না, যদি তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি না ঘটিয়া থাকে, তিনি সন্তুষ্ট বা নিরস্ত হইবেন না। ক্ষুধার যন্ত্রণা বা রোগযন্ত্রণা বাস্তবজগতের অখণ্ডনীয় সত্য; এই অলঙ্ঘ্য সত্যের সম্মুখীন হইয়া অদ্বৈতবাদী বলেন, "এই যন্ত্রণা মিথ্যা হইলেও ইহাকে সত্যের ন্যায় মনে করিও এবং সেইভাবে ব্যবহার করিও।" অতএব যাহা মিথ্যা বা শূন্যের

নামান্তর, তাহার ব্যবহারিক সত্যতা আছে—অদ্বৈতবাদী এই শিক্ষাই দেন। কিন্তু ইহা কুশিক্ষা, সুতরাং ইহা গ্রহণীয় নহে।

জগতে যাহা কিছু আছে বা ঘটিতেছে, তাহাকে অন্যপ্রকার সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। সত্যের দুইটি রূপ আছে: এক—চিরন্তন সত্য ও দুই—সাময়িক সত্য।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর চিরন্তন সত্য; তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন—অনাদিকাল হইতে আছেন ও অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবেন। তিনি-এক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বের কোন স্থানে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় থাকিলে, সেই স্থানে তাঁহার নির্গুণভাব চলিতেছে বুঝিতে হইবে; কিন্তু বিশ্বের কোন স্থানে ব্রহ্ম সক্রিয় হইলে (অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেরয়িতাভাবে কার্য আরম্ভ করিলে), তিনি সেই স্থানে সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রূপ ধারণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্ম নির্গুণ ভাবে থাকেন। খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়—এই দুই প্রকার প্রলয়ের কথা বলা হয়। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তিমাত্র এবং তাঁহার এই সূক্ষ্মরূপটি চিরন্তন। তাঁহার কোন স্থূলরূপ নাই, বা কোন সময় ইহা হয় না। (ঈশ্বরভাবে ব্রহ্মের কার্য গুণের প্রকাশক হইলেও, এই গুণ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ হইতে পৃথক)।

প্রকৃতির স্বরূপ কিন্তু অন্য প্রকার; প্রকৃতি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ন্যায় সূক্ষ্মরূপে চিরন্তন সত্য নহে। প্রকৃতি ছিল, আছে ও থাকিবে। প্রকৃতির এই চিরন্তন অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিয়া ইহাকে শূন্যে পরিণত করা ঈশ্বরের ক্ষমতাতীত। কিন্তু যেখানে অতিসূক্ষ্ম বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির তিনটিমাত্র রূপ—নির্গুণ (বা নিষ্ক্রিয়) রূপ, সগুণ (বা সক্রিয়) রূপ ও (জীবাত্মা ভাবে) চিদণুরূপ; সেখানে প্রকৃতি বহুরূপা এবং এই রূপগুলির কোনটিই চিরন্তন সত্য নহে; সমস্তই সাময়িক সত্য। প্রলয়কালে প্রকৃতির রূপ হয় একাকার ও সূক্ষ্ম; কিন্তু চিরকাল প্রকৃতি ঐভাবে থাকে না; সৃষ্টির পর তাহার কতকগুলি রূপ হয় সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য এবং কতকগুলি রূপ হয় স্থূল ও দৃশ্য। অদ্বৈতবাদী প্রকৃতির

রূপগুলিকে মিথ্যা কিন্তু ব্যবহারিকভাবে সত্য বলিয়া গুরুতর ভুল করিয়া থাকে।

একটি বালিকা একখানি মূল্যবান ও সুন্দর শাড়ী পরিয়া মনে মনে সুখ ও গর্ব বোধ করিত। একদিন ঘটনাচক্রে তাহার ঐ শাড়ীতে আগুন লাগিয়া গেল এবং ইহা ভস্মে পরিণত হইল। ইহাতে বালিকাটি মনে গভীর দুঃখ বোধ করিল। বালিকাটির ঐ শাড়ীটা কি মিথ্যা ছিল এবং সে ও অন্যান্য যাহারা ঐ শাড়ীটা দেখিত, তাহারা কি একপ্রকার স্বপ্ন দেখিত? না, ঐ প্রকার চিন্তা করাই মহাভ্রম। শাড়ীটা যতদিন শাড়ীরূপে ছিল, ততদিন ইহার শাড়ীরূপই ইহার সত্য বা যথার্থরূপ ছিল, কিন্তু ইহা সাময়িক সত্য ছিল। কিন্তু ইহা এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং শাড়ীটার ভস্মরূপই এখন ইহার সাময়িকভাবে সত্যরূপ। এই ভস্ম যেখানে মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইল, সেখানে একজন লোক পেঁয়াজ বসাইল। তখন ঐ ভস্মের কিছু অংশ টানিয়া লইয়া পেঁয়াজ তাহার নিজ দেহের সামান্য অংশ গঠনে ব্যবহার করিল। পরে কোন লোক এই পেঁয়াজ খাইল এবং ইহা তাহার শরীরে জড়শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করিল। প্রকৃতির ভিতর এইভাবে কেবল নামরূপের পরিবর্তন চলিয়াছে।

প্রকৃতির ভিতর আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু আছে, তাহার অভ্যন্তরে তাহার একটি চিরন্তন ও অবিনাশী সত্তা আছে। প্রলয়কালে ইহা অতিসূক্ষ্ম অচিৎশক্তির রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মের অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তিতে বিলীন হইয়া তাহার সহিত একীভূত হইয়া যায়। প্রলয়কালের অবসানে ব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্তি (অর্থাৎ প্রকৃতি আবার লীলা করিতে আরম্ভ করুক—এইপ্রকার ইচ্ছা) উদিত ও সক্রিয় হইলে, প্রকৃতি আবার নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। সেইজন্য প্রকৃতির ভিতর যাহা কিছু আছে, তাহার অন্তঃস্থলে বা অভ্যন্তরে একটা চিরন্তন ও অবিনাশী সত্তা থাকায়, প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা চলে না। প্রকৃতির অন্তর্গত কোন অংশ কোনও রূপ

ধারণ করিলে, ইহাকে মিথ্যা কিন্তু ব্যবহারিকভাবে সত্য মনে না করিয়া, ইহাকে সাময়িকভাবে সত্য, সুতরাং ব্যবহারিকভাবেও সত্য, মনে করিতে হইবে। যে বালিকার শাড়ীর কথা উপরে বলা হইয়াছে, সে যদি তাহার শাড়ীর সাময়িক সত্যতার কথা যথাযথভাবে মনে রাখিত, সে ইহাকে আগুন হইতে আরও সযত্নে রাখিবার চেষ্টা করিত এবং ইহা ভস্মে পরিণত হইবার পর ইহার জন্য গভীর দুঃখবোধ করিত না। আমাদের স্থূলদেহ মিথ্যা নহে, ইহা আছে মনে করিয়া, আমরা একপ্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি—তাহাও নহে। ইহা সাময়িক সত্য; সেইজন্য ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ইহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা না যায়, তখন মৃত্যুকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান মনে করিয়া অবিচলিতভাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূলদেহ সাময়িক সত্য ছিল, চিরন্তন সত্য ছিল না। সুতরাং ইহাকে চিরকাল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা এবং ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শোকে অভিভূত হইয়া হা-হুতাশ করা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥—গীতা ২।১১

—যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, (তাহারা মারা যাইবে ভাবিয়া) তুমি তাহাদের জন্য গভীর দুঃখবোধ করিতেছ, অথচ পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। যাহারা মারা গিয়াছে, কিংবা যাহারা মারা যাইবে, তাহাদের কথা ভাবিয়া পণ্ডিতগণ দুঃখিত হন না।
—গীতা ২।১১

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।—গীতা ১৮।৫৪

—ব্রহ্মভাবাপন্ন প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্য শোক করেন না এবং কোন কিছু পাইবার আকাঙ্ক্ষাও করেন না।—১৮।৫৪

জীব ও ব্রহ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন—

• জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ—জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। ইহা

আংশিকভাবে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। একটি উপমা দ্বারা ইহা সহজে বোঝা যাইবে।

সমুদ্রতীরে একটি উচ্চ তরঙ্গ বা ঢেউ উঠিয়া বলিল, "আমি সমুদ্র" তাহার পশ্চাতেও একটি উচ্চ তরঙ্গ তীরের দিকে আসিতেছিল। সে সেই পশ্চাদবর্তী তরঙ্গকে বলিল, "তুমিও তাহাই (অর্থাৎ তুমিও সমুদ্র)"। ঐ সমুদ্রতীরে দূরে কয়েকটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মধ্যে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ দুইপ্রকার লোকই ছিল। দুই একটি অজ্ঞ লোক বলিল, "তরঙ্গটি ঠিকই বলিতেছে, সমুদ্রই তীরের উপর উঠিয়া আসিয়াছে।" বিজ্ঞ লোকগুলি বলিলেন, "না, সে ঠিক বলিতেছে না। সমস্ত সমুদ্র তীরের উপর উঠিয়া আসে নাই। সমুদ্রের একটি অতীব সামান্য অংশমাত্র তীরের উপর উঠিয়া আসিয়াছে।" কিন্তু অগ্রবর্তী তরঙ্গটি যাহা বলিয়াছে, তাহার ভিতর আংশিক সত্য আছে। সমুদ্র বিরাট জলরাশি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তরঙ্গটি তাহার অতিসামান্য অংশ মাত্র। সমুদ্রের জল যেরূপ লবণাক্ত ও অন্যান্য দোষগুণ যুক্ত, তরঙ্গের জলও সেইরূপ; তাহাদের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য বিশেষ নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরিমাণগত ও শক্তিগত পার্থক্য এত অধিক যে একটি তরঙ্গকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা যায় না বলা যাইতে পারে। কোন কোন বেদান্তী "সোঽহম্"—আমি সেই (ব্রহ্ম) এবং "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই (ব্রহ্ম) এই দুইটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করেন। এই দুইটি বাক্যের ভিতর কতটুকু সত্য কিভাবে আছে তাহা উপরের উপমা হইতে বোঝা যাইবে।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥—২।১।১

—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির রূপযুক্ত সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ

নির্গত হয়, হে সৌম্য, সেইভাবে অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, এবং কালক্রমে তাঁহাতেই বিলীন হয়।—২।১।১

সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে নির্গত হইলেও, তাহাদের কাহারও তাপ যেমন মূল অগ্নির তাপের সমান নহে, সেইরূপ কোটি কোটি জীব ব্রহ্মের নিকট হইতে তাহাদের চিৎশক্তি লাভ করিলেও, কোনও জীব ব্রহ্মের ন্যায় শক্তিবিশিষ্ট নহে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মকে জ্ঞ (অর্থাৎ অসীম জ্ঞানসম্পন্ন) এবং জীবকে অজ্ঞ (অর্থাৎ অল্পজ্ঞানসম্পন্ন), ব্রহ্মকে ঈশ (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অসীম শক্তিসম্পন্ন) এবং জীবকে অনীশ (অর্থাৎ অল্পশক্তি-সম্পন্ন), কিন্তু উভয়কেই অজ (অর্থাৎ জন্মরহিত) বলা হইয়াছে। জীব তাহার চিৎশক্তি ব্রহ্মের চিৎশক্তি হইতে লাভ করিয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের চিৎশক্তি যেমন জন্মহীন, জীবের চিৎশক্তিও (অর্থাৎ জীবাত্মাও) সেইভাবে জন্মহীন।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥—১।৯

(জ্ঞ + অজ্ঞ = জ্ঞাজ্ঞ, তৌ-জ্ঞাজ্ঞৌ। দ্বৌ + অজৌ = দ্বাবজৌ ; ঈশ + অনীশ = ঈশানীশ, তৌ ঈশানীশৌ। দ্বাবজৌ + ঈশানীশৌ + অজ = দ্বাবজাবীশানীশাবজা)।

অসীম জ্ঞানসম্পন্ন ও অসীম শক্তিসম্পন্ন (ঈশ্বর) এবং অল্পজ্ঞান-সম্পন্ন ও অল্প শক্তিসম্পন্ন (জীবাত্মা) দুইটিই আছেন এবং উভয়েই জন্মরহিত। ভোক্তাজীবের ভোগ্যবিষয় যুক্ত হইয়া এক অজা (অর্থাৎ জন্মরহিতা প্রকৃতিও) আছে। অনন্ত পরমাত্মা (জগৎ ও জীবরূপে) বিশ্বরূপ ধারণ করিলেও তিনি অকর্তা (অর্থাৎ কেবল প্রকৃতিই কাজ করিয়া যায় এবং জীবও এই কর্মে যোগদান করে)। মানুষ যখন এই তিনটিকে (অর্থাৎ জীব, জগৎ ও ঈশ্বরকে)

বুঝিতে পারে, তখন সে ব্রহ্মকে (অর্থাৎ ব্রহ্মের পূর্ণরূপকে) বুঝিতে পারে। —শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্—১।৯

মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জীব ও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের পার্থক্য ভালভাবেই বোঝা যাইতেছে। (অধিকন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে, কোনও জীবের ইচ্ছায় ঠিক ঐরূপ হওয়া অসম্ভব)।

অতএব জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে—অদ্বৈতবাদিগণের এই শিক্ষাকে বেদান্তের অপব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। যদি সূর্য চন্দ্র পৃথিবী, ন্যায় অন্যায়, ধর্মাধর্ম, মানুষের সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু, পুনর্জন্ম ও মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মানুষের নানাপ্রকার চেষ্টা ও সাধনার কী সার্থকতা আছে?

গীতার শিক্ষাও জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থন করে না।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥

—গীতা ১৬।৭

—যাহারা আসুরিক ভাবাপন্ন লোক তাহারা কোন্ প্রকার কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কোন্ প্রকার কার্য হইতে নিবৃত্তি হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদের মধ্যে শুচিতাবোধ, সদাচারবোধ এবং সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই।—গীতা ১৬।৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥—গীতা ১৬।৮

—তাহারা (অর্থাৎ আসুরিকভাবাপন্ন লোকেরা) জগৎকে মিথ্যা প্রতিষ্ঠাহীন, ঈশ্বরহীন, স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন এবং কামমূলক বলে। —গীতা ১৬।৮

অতএব অদ্বৈতবাদিগণ যখন জগৎকে মিথ্যা ও প্রতিষ্ঠাহীন বলে, তখন গীতার মতে তাহারা আসুরিক ভাবাপন্ন লোকের ন্যায় কথা বলে।

মানুষের জীবাত্মার অমরত্বের কথা উপনিষদ ও গীতায় পুনঃপুনঃ

বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রলয়কালে জীবাত্মাগণও ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন অতিসূক্ষ্ম অচিৎশক্তির রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মের চিৎশক্তির সহিত একীভূত হইয়া যায়, বহু জীবাত্মাভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের চিদণুসমূহও ঐভাবে ব্রহ্মের চিৎশক্তির সহিত একীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলেও জীবাত্মার আপেক্ষিক অমরত্ব আছে বলা যাইতে পারে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতির তুলনায় মানুষের জীবাত্মা অমর। অন্যান্য জীবের আত্মা তাহাদের দেহপাতের পর কোথায় কীভাবে কতদিন থাকে, অথবা পৃথকভাবে থাকে কিনা, তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। সর্বভূতের (অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রাণী অপ্রাণীর) স্থায়িত্বকালের আপেক্ষিকতার কথাও আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। সূর্য কোটি কোটি বৎসর থাকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষের স্থূলদেহ পৃথিবীতে একশত বৎসরেরও কম থাকে এবং তাহাদের দেহপাতের পর তাহাদের জীবাত্মাগণ কোথায় কীভাবে কতদিন থাকে, তাহা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি না।

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সারাংশ অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর চিরন্তন সত্য, কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত যাহা কিছু আছে এবং যাহাকে আমরা জগৎ বলি, তাহারা সাময়িকভাবে সত্য ও তাহাদের স্থায়িত্বকাল আপেক্ষিক। জীবও সাময়িকভাবে সত্য ; সে তাহার চিৎশক্তি ঈশ্বর হইতে এবং দেহ প্রকৃতি হইতে লাভ করে, কিন্তু মানুষের জীবাত্মা আপেক্ষিকভাবে অমর। প্রলয়কাল ব্যতীত অন্য সময় ইহার পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে।

ইহাকে বেদান্তের একদ্বিবাদ বলা যাইতে পারে। প্রলয়কালে একটিমাত্র একাকার অতিসূক্ষ্ম চরম সত্তা থাকে। ইহার ভিতর চিৎশক্তি ও অচিৎশক্তি একীভূত হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। পরে চিৎশক্তির ইচ্ছাক্রমে অচিৎশক্তি সক্রিয় হয় এবং নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে। তখন ইহাকে আমরা জগৎ বলি। পরে চিৎশক্তি প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত অংশসমূহের ভিতর দিয়া

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করিলে, বহুপ্রকার বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী এবং অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হয়। একাৎ দ্বি, (এক হইতে দুই) অথবা একীভূত দ্বি (একভাবাপন্ন দুই)=একদ্বি। এই একদ্বি (প্রলয়কালের) নির্গুণ ব্রহ্ম এবং ইহা হইতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের এবং বহুরূপা প্রকৃতির প্রকাশ হয়। পরে অগণিত প্রকারের জীব এবং অবশেষে মানুষের আবির্ভাব হয়।

জীব, জগৎ, ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত ধারণা প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (বা ভেদাভেদবাদ) প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়। ঐ সম্বন্ধে উপনিষদ ও গীতার শিক্ষা কী তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। ইহাকে যিনি যে নাম দিতে চান, তাহা তিনি দিতে পারেন; কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদ নহে। অদ্বৈতবাদী কেন জগৎকে মিথ্যা বলেন তাহা দুর্বোধ্য নহে। অনন্তকালের দিক্ হইতে দেখিলে জগৎ মিথ্যা। জগতের কোন কিছু অনন্তকাল থাকে না, সেই জন্য অদ্বৈতবাদীর মতে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু কাল নামে কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল পদার্থ নাই। জগতে পর পর যে সমস্ত পরিবর্তন হয়, তাহারাই আমাদের মনে কালের ধারণা উৎপন্ন করে এবং কালের ক্রমাভিমুখী ভাবকেই আমরা অনন্ত কাল বলি। ঐশ্বরিক চিৎশক্তি যেমন অবিনশ্বর (অর্থাৎ ইহাকে যেমন শূন্যে পরিণত করা যায় না), সেইভাবে প্রকৃতি (অর্থাৎ অচিৎ শক্তি ও চৈতন্যহীন পদার্থ—যাহা জগৎরূপ ধারণ করে), তাহাও অবিনশ্বর (অর্থাৎ তাহাকেও শূন্য পরিণত করা যায় না)। প্রকৃতি বহুরূপ ধারণ করে এবং ইহাদের মধ্যে পর পর পরিবর্তন চলে। প্রকৃতি অবিনশ্বর হওয়ায়, প্রকৃতির কোন রূপই ভিত্তিহীন বা শূন্যের ন্যায় নহে এবং ইহার প্রত্যেক রূপই সাময়িকভাবে সত্য (অর্থাৎ সাময়িকভাবে বর্তমান থাকে)। ক্রমাগত পরিবর্তনই জগৎকে সচল ও সজীব করিয়া রাখিয়াছে: ইহা না থাকিলে বিশ্বশক্তির মৃতবৎ অবস্থা ঘটিত। এক ঈশ্বর যে বহুজীবরূপে লীলা করেন, তাহা তাঁহাকে প্রকৃতির পরিবর্তনসমূহের মধ্য দিয়াই করিতে হয়। যদি

প্রকৃতির ভিতর পরিবর্তনসমূহ বন্ধ হইয়া যায়, ঈশ্বরের জীবলীলাও বন্ধ হইয়া যাইবে এবং জীবের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে না। প্রলয়কালে ইহাই ঘটে। অদ্বৈতবাদী সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিবর্তন, এবং প্রলয় বা বিনাশকে মিথ্যা বলিয়া যদি সুখী হইতে চান, এইভাবে সুখলাভ করিবার অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ন্যায় অন্যায় বা ধর্মাধর্মও মিথ্যা হইয়া যাইবে এবং যাহার যাহা করিবার ইচ্ছা হইবে, সে তাহা করিবার অধিকার লাভ করিবে। কিন্তু ধর্মাধর্ম নামে কিছুই নাই, ইহা বেদান্ত বা গীতার শিক্ষা নহে। সুতরাং অদ্বৈতবাদী যে শিক্ষা দেন, তাহা বেদান্ত বা গীতার শিক্ষা নহে। ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বের সমস্তই সাময়িক বা অস্থায়ী; তাহা হইলেও ইহাদের একটা সূক্ষ্ম চিরস্থায়ী রূপ আছে এবং ইহাই বিভিন্ন অস্থায়ী রূপ ধারণ করে। অস্থায়ী রূপকে স্থায়ীরূপ মনে করিয়া ও তাহাতে অত্যধিক আসক্ত হইয়া মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। জগতে প্রকৃতিজাত যাহা কিছু আছে তাহাদের অনিত্যতার কথা সর্বদা মনে রাখিয়া মনকে তাহাদের প্রতি আসক্তি হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং মনকে আত্মায় ও ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিতে হইবে। তাহার সহিত জাগতিক এবং সামাজিক কর্তব্যও করিতে হইবে। কেবল এই পন্থাই মানুষের দুঃখকষ্টকে যতদূর সম্ভব নিবারণ করিতে পারে এবং ইহাই বেদান্ত ও গীতার প্রকৃত শিক্ষা। অদ্বৈতবাদিগণ মানুষের দুঃখকষ্টকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাহা উড়িয়া যাইবে না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা এবং মানুষের দুঃখকষ্টও মিথ্যা—এইরূপ শিক্ষা কেহ দিলে, তাহা কুশিক্ষাই হইবে।

(খ) অমঙ্গল সমস্যা :—

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত মানুষের সর্বপ্রধান দ্বন্দ্ব হইয়া দাঁড়ায়। সে অমঙ্গলকে পরিহার করিয়া কেবল মঙ্গলকেই বরণ করিতে চায়। জগতে যদি প্রকৃতির প্রেরয়িতা বা নিয়ামকভাবে

কোন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে মানুষের অমঙ্গল কোথা হইতে আসে? এই চিন্তা কখন কখন তাহার মনকে আলোড়িত করে।

অমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচ্য অন্ততঃ পাঁচটি প্রশ্ন উঠিতে পারে।

(১) যে অমঙ্গল ঘটিয়াছে বা যে প্রকার অমঙ্গল প্রায় ঘটে, তাহা সামান্য অথবা গুরুতর?

(২) ইহা নিবার্য কিংবা অনিবার্য?

(৩) ইহা একজন বা কয়েকজন লোকের পক্ষে অথবা বহু লোকের পক্ষে অমঙ্গলজনক?

(৪) কাহা হইতে এই অমঙ্গল ঘটিয়াছে বা ঘটে অর্থাৎ ইহা প্রকৃতিজাত, অন্যান্য মনুষ্য বা অন্যান্য প্রাণীকৃত, অথবা স্বয়ংকৃত?

(৫) এই অমঙ্গল হইতে অন্য কাহারও মঙ্গল হয় কি?

একজন লোক যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তখন একটি দ্রুতগামী মোটরগাড়ির চাকা হইতে জলকাদা ছিটকাইয়া আসিয়া তাহার কাপড়ে ও জামায় পড়িল এবং পরে ঐ গাড়ির ধাক্কায় একটি বালক পড়িয়া যাওয়ার তাহার বাঁহাত ভাঙিয়া গেল। ইহাতে লোকটির সামান্য অমঙ্গল কিন্তু বালকটির গুরুতর অমঙ্গল ঘটিল। ইহা দুইটি মানুষের পক্ষে মনুষ্যকৃত নিবার্য অমঙ্গল ছিল; কারণ গাড়ির চালক সাবধান হইলে, ইহা নিবারণ করা যাইতে পারিত। এই অমঙ্গল হইতে অন্য কাহারও কোন মঙ্গল হইল না।

শীতগ্রীষ্মকে অধিকাংশ লোকই কতকটা অমঙ্গল মনে করে। ইহা প্রকৃতিজাত অনিবার্য অমঙ্গল। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবলে ইহার অনেকটা প্রতিকার করে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার শস্য ও ফল উৎপন্ন হয়। এইভাবে এবং অন্য কোন কোন ভাবে শীত গ্রীষ্মের কিছু অমঙ্গল হইতে মানুষের কিছু মঙ্গলও হয়।

রাত্রির অন্ধকার অধিকাংশ লোকের পক্ষে কতকটা অমঙ্গলকর হয়। ইহা প্রকৃতিজাত অনিবার্য অমঙ্গল। মানুষ নানাপ্রকার আলোকের সাহায্যে ইহার কতকটা প্রতিকার করে। চোর ডাকাত

ও অন্যান্য কুকার্যকারী ব্যক্তিগণ এই অন্ধকারকে মঙ্গলজনক মনে করে এবং পৃথিবীর যে দিকে অন্ধকার থাকে, তাহার বিপরীত দিকে ঐ সময় সূর্যালোক থাকায়, এই দিকের অন্ধকার অপ্রত্যক্ষভাবে বিপরীত দিকের লোকের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়।

ভারতের অধিকাংশ লোকের নিকট দারিদ্র্য একটা বিরাট অমঙ্গল। ইহা মনুষ্যকৃত ও নিবার্য অমঙ্গল। ভারতের বহুকোটি লোকের এই অমঙ্গল অল্প সংখ্যক লোভী ও স্বার্থপর লোকের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় সর্বজনহিতৈষী, স্বার্থ-চিন্তামুক্ত ও বুদ্ধিমান কোন নেতৃবৃন্দ এখনও অধিষ্ঠিত হন নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অনুকরণে ভারতের অনভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ মনে করিয়াছেন যে তাঁহারা ইহা দ্বারা ভারতের মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে বিভিন্ন অমঙ্গলযুক্ত দলীয় রাজনীতি এবং এই প্রকার রাজনীতির দ্বারা যে সমস্ত লোকের মঙ্গলসাধন সম্ভব নহে, তাহা আমরা একত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। জনসাধারণ ভোটের দ্বারা সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা লাভ করায়, তাহারা মনে করে যে তাহারা বেশ লাভবান হইয়াছে। তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা এই পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কতকটা হ্রাস না করিলে যে আর্থিক বৈষম্যহ্রাস সম্ভব নহে (অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকেই গণতন্ত্রের উপরে স্থান দেওয়া অত্যাবশ্যক), এ শিক্ষা এখনও তাহাদের হয় নাই। কবে তাহাদের এ শিক্ষা হইবে এবং সর্বভারতীয় মর্যাদাসম্পন্ন, স্বার্থচিন্তাহীন সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবেন—তাহা ভবিষ্যতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। অধিকাংশ লোক তাহাদের কর্তব্যের কথা চিন্তা না করিয়া, কেবল তাহাদের অধিকারের কথা ও স্বার্থের কথা চিন্তা করে। মনের ভিতর বিপ্লব না আসিলে, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" বা এইরূপ অন্য কোন চীৎকারের দ্বারা বিপ্লব আসিবে না এবং আসিলেও তাহা স্থায়ী হইবে না। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে গীতায় মানুষকে

"সর্বভূতাত্মভূতাত্মা" হইতে (অর্থাৎ অন্য সকলের আত্মাকে নিজের আত্মার ন্যায় দেখিতে) বলা হইয়াছে (গীতা ৫।৭), কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের নিকট অর্থহীন হইয়া রহিয়াছে। আমাদের নিকটবর্তী কোন কোন দেশ কি ভাবে আর্থিক বৈষম্যহ্রাসের চেষ্টা করিয়া তাহাতে বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছে না বা ইহা হইতে কোনরূপ শিক্ষালাভ করিতেছি না।

উপরে যে কয়েকটি অমঙ্গলের কথা বলা হইয়াছে, সেইগুলি ব্যতীত আরও অনেক অমঙ্গলের সম্মুখীন মানুষকে হইতে হয়। কিন্তু মানুষ মৃত্যুকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ও গুরুতর অমঙ্গল মনে করে। যাহারা এইরূপ মনে করে, তাহারা গুরুতর ভুল করে।

পৃথিবীতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে। আবার সহস্র সহস্র লোক মারাও যাইতেছে। কিন্তু জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী বলিয়া প্রতিদিনই পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। যখন হইতে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে পৃথিবীতে যত লোক জন্মিয়াছিল, তাহাদের কাহারও যদি মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে তাহাদের সকলকে যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া সম্ভব হইত কি? সকলকে যথেষ্ট খাদ্য দেওয়া দূরে থাক, সকলকে বসিবার ও শুইবার জন্যও যথেষ্ট স্থান দেওয়া সম্ভব হইত না। তখন সকলকে বাঁচাইয়া রাখিবার যথেষ্ট খাদ্য শস্য কোথায় উৎপন্ন হইত? আমরা কখন কখন বলি, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে," কিন্তু ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক সুব্যবস্থায় এই আকাঙ্ক্ষার শেষ পর্যন্ত কোন স্থান নাই। যে পরে ক্রমশঃ সতেজ ও সুন্দর হইয়া উঠিবে, সেই প্রকার নূতনের জন্ম দিয়া এবং সযত্ন স্নেহের মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব ও শক্তি বিকাশের ব্যবস্থা ঈশ্বর প্রকৃতির মাধ্যমে জীর্ণ পুরাতনের ধ্বংস বা মৃত্যু সংঘটন করেন। আমরা কেবল নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিই বলিয়া, মৃত্যু আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ও গুরুতর অমঙ্গল মনে হয়। কিন্তু আবহমান কাল হইতে পৃথিবীতে মৃত্যুর ব্যবস্থা না থাকিলে, মানুষের কি দুরবস্থা ঘটিত,

তাহা যে কোন লোক সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তখন সে দেখিবে যে নিজের অতি ক্ষুদ্র সাময়িক স্বার্থের দিক হইতে দেখিয়া সে যে মৃত্যুকে চরম অমঙ্গল মনে করিয়াছিল, তাহারই ভিতর সমগ্র মানবসমাজের পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে এবং সেও সেই মঙ্গলের অংশীদার, ফলভাগী ও ফলভোগী হইতেছে।

প্রত্যেক মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং পরে ক্রমাগত হ্রাস—ইহাই প্রকৃতির সুনিয়ম। সুতরাং যখন কাহারও অধিক বয়স হয়, তখন তাহার শরীর জরাগ্রস্ত ও দুর্বল হয় এবং কখন কখন রোগাক্রান্তও হয়। ঐ অবস্থায় স্থূল দেহের ধ্বংসই মঙ্গলজনক হয়। অল্পবয়সে মৃত্যুরও নানাপ্রকার কারণ থাকে। এই কারণগুলির বুঝিতে না পারিয়া, আমরা অনেক সময় ইহাকে প্রকৃতির জুলুম মনে করি। মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া ও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া, জরাজনিত কষ্টের ও অকাল মৃত্যুর নিবারণের চেষ্টা করে।

আমরা অনেক সময় নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব দেখিতে পাই। প্রবীণগণকে অনেক সময় রক্ষণশীল হইতে দেখা যায়। তাঁহাদের অনেকের মতে পূর্বে যে প্রকার চিন্তাধারা ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল, তাহাই ভাল ছিল। নবীনগণের অনেককে আবার অত্যধিক প্রগতিশীল হইতে দেখা যায়। তাহারা সমস্ত পুরাতনকে বাতিল করিয়া তাহার স্থানে নূতনকে বসাইতে চায়। এই দুইটি মনোভাবের কোনটিই ঠিক নহে। পুরাতনের মধ্যে যাহা কিছু ভাল ছিল বা আছে, তাহার সংরক্ষণ করিয়া, নূতনের ভিতর যাহা কিছু ভাল আছে, তাহাকেও আলিঙ্গন ও গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইবে বুদ্ধিমান মানুষের সুসঙ্গত কাজ। মৃত্যু রক্ষণশীল প্রবীণগণকে টানিয়া লইয়া নবীনের অভিযানে সাহায্য করে। সমাজের অগ্রগতিতে এইভাবে সাহায্য করিয়া মৃত্যু মানুষের মঙ্গল সাধন করে।

উপরে যে মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে, ইহা ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। সেইজন্য গীতায় বলা হইয়াছে—

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।—গীতা ১০।৩৪

আমি (অর্থাৎ ঈশ্বরই) সর্বহরণকারী বা সর্বসংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে আমি (অর্থাৎ ঈশ্বরই) তাহাদের জন্মগ্রহণের কারণ।—গীতা ১০।৩৪

ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতি যেমন প্রাণী অপ্রাণিগণের উৎপত্তি করে, ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতি আবার তাহাদের ধ্বংস করে। মৃত্যুর আগমনে বিলম্ব ঘটাইবার চেষ্টা মানুষের সুসঙ্গত চেষ্টা এবং সুস্থ দেহ ও মন লইয়া যতদিন সম্ভব বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু যখন ইহার আগমন অনিবার্য (অর্থাৎ মানুষের ক্ষমতার অতীত) হইবে, তখন ইহাকে ঐশ্বরিক বিধান মনে করিয়া অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

মৃত্যুকে প্রথম ও সর্বপ্রধান অমঙ্গল মনে করিবার পর, আমরা রোগযন্ত্রণাকে দ্বিতীয় গুরুতর অমঙ্গল মনে করি।

শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বা যন্ত্রণাকে প্রকৃতির সতর্কবাণী বলা যাইতে পারে। শরীরের উপরিভাগে কোন স্থানে কাটিয়া গেলে অথবা অন্য কোন অনিষ্ট ঘটিলে, আমরা তাহা দেখিতে পাই ও তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করি। কিন্তু শরীরের ভিতর কোন স্থানে কোন অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিলে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তখন যন্ত্রণা প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকৃতি শরীরের ভিতর কোথায় কী প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেয়। সুতরাং রোগকে প্রকৃতির মঙ্গলময় সতর্কবাণী বলা যাইতে পারে। কোন সামান্য অসুখ হইলে তাহা বিশ্রাম, উপবাস প্রভৃতির দ্বারা সারিয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। তাহা না করিলে, রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অধিক কষ্টকর হইতে পারে এবং কোন কোন স্থলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। কখন কখন বিজ্ঞ চিকিৎসকও রোগের কারণ নির্ণয়

করিতে পারেন না। তখন আমরা ইহাকে আপাততঃ দুর্বোধ্য রোগ বলিতে পারি। শৈশবে পিতামাতা প্রভৃতির যত্নের অভাবে কখন কখন বালিক বালিকাগণের যে রোগ হয়, তাহা মনুষ্যকৃত রোগ। একই খাদ্যগ্রহণের পর বিষক্রিয়ার ফলে কিছু লোক একইভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িল। ইহা মনুষ্যকৃত রোগ। নানাভাবে মনুষ্যকৃত রোগ লোকের ঘটে। কিন্তু স্বয়ংকৃত রোগের সংখ্যাও কম নহে। অত্যধিক ভোজন, দুষ্পাচ্য বস্তুভক্ষণ, বিশ্রামের স্বল্পতা ও অত্যধিক পরিশ্রম, কিংবা শারীরিক পরিশ্রমের একান্ত অভাব, অত্যধিক ধূমপান বা মাদক দ্রব্য সেবন, মানসিক উদ্বেগ, শীতকালীন অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডালাগা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন নানাপ্রকার রোগ স্বয়ংকৃত রোগ। কোন লোক কখন কখন রোগাক্রান্ত হইলেও, সে যদি আহারবিহার প্রভৃতিতে সংযত হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম মানিয়া চলে, সে দীর্ঘজীবী হইতে পারে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় সুস্থভাবে কাটাইতে পারে। যোগব্যায়ামের শিক্ষকগণ বলেন যে যোগ-ব্যায়ামের দ্বারা নানাপ্রকার রোগের উপশম করা যাইতে পারে এবং তাহাদের নিবারণও সম্ভব। ছাত্রছাত্রীগণ এবং অন্যান্য লোকে এই দিকে মনোযোগ দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা নানাপ্রকার ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। অস্ত্রচিকিৎসায়ও অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। একপ্রকার চিকিৎসাপ্রণালী দ্বারা কেহ রোগমুক্ত হইতে না পারিলে, সে অন্যপ্রকার চিকিৎসাপ্রণালী দ্বারা উপকৃত হইতেছে। মানুষের এই প্রকার ক্রমাগত চেষ্টার ফলে, রোগযন্ত্রণার লাঘব বা উপশম ঘটিতেছে, নানাপ্রকার রোগ নিবারিত হইতেছে বা তাহার প্রতিবিধান হইতেছে। কিন্তু সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কোন রোগ কাহারও নিকট তাহার মৃত্যুর দূতরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যেহেতু মৃত্যু সমগ্র সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক, অতএব ঐ রোগকেও শুভকর মনে করা যাইতে পারে।

দেশের উপর বৈদেশিক আক্রমণ অন্যতম গুরুতর অমঙ্গল।

ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ন্যায়, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক দলের দলীয় স্বার্থপরতার এবং কোন জাতির জাতীয় স্বার্থপরতা অমঙ্গল-জনক। প্রতি দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন কোন জাতি তাহাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। যে বিজ্ঞান মানুষের দুঃখকষ্ট নিবারণের জন্য অবিরত চেষ্টা করিতেছে, সেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিয়া কোন কোন দেশের নেতাগণ লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিবার ও পঙ্গু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পৃথিবীর লোক-সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আধুনিকতম মারণাস্ত্র-সমূহের ব্যবহারের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে ভূ-ভারহরণ হইবে; কিন্তু ইহা ভূ-ভারহরণের (অর্থাৎ লোকসংখ্যা হ্রাসের) প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার সঙ্গতি অনুসারে তাহার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তাহাই হইবে ভূ-ভার হরণের উত্তম পন্থা। তাহার পর প্রত্যেক জাতিকে একটি বিরাট পরিবার মনে করিয়া সমস্ত জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র ধর্মসঙ্গত পথ এবং ব্যতীত পৃথিবীতে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু ইহা "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"—এই একটি প্রবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং কোন দেশের ধনলোভী ও ক্ষমতার গর্বে গর্বিত দেশনায়ক ধর্মের কাহিনী শুনিবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দুইটি চক্ষুর সম্মুখে চীন ও পাকিস্তান ভারত আক্রমণের দুইটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। তাহারা পুনরায় ভারত আক্রমণ করিতে পারে না এমন নহে। অন্য কোন দেশও তাহাদের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণের চেষ্টা করিতে পারে। আন্তর্জাতিক দস্যুগণ অন্য দেশ বা তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া ও সেই দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহার সম্পদ লুণ্ঠনের দ্বারা নিজেদের দেশের সম্পদের বৃদ্ধিসাধন করিতে চায়। ভারতকে দুর্বল দেখিলেই, কোন দস্যু তাহার ঘোর অমঙ্গল ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং ভারতকে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া থকিতে হইবে এবং ইহার জন্য

তাহার (১) জনবল, (২) বিদ্যাবল, (৩) অস্ত্রবল, (৪) অর্থবল, (৫) মনোবল ও (৬) ধর্মবল—এই ষড়বল আবশ্যক হইবে। ভারত পৃথিবীর সমস্ত দেশকে তাহার বন্ধুভাবে লাভ করিতে চায়; সে কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় করিবে না—ইহাই হইবে তাহার ধর্মবল। জাতীয় সংহতি ও অদম্য মনোবল প্রভৃতি থাকায়, ভিয়েতনামকে প্রবলপ্রতাপান্বিত আমেরিকার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয় নাই; সেইজন্য ভিয়েতনামের সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া রহিবে।

ভারতকে যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়, ইহা হইবে তাহার সম্পদ, স্বাধীনতা, দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিবার জন্য ধর্মযুদ্ধ। যাহা হইতে লোকের দুঃখকষ্ট বাড়ে তাহাই পাপ। ভারত যদি উল্লিখিত প্রকারের যুদ্ধ না করে বা তাহাতে পরাজিত হয়, তাহা হইলে ভারতের কোটি কোটি লোকের দুঃখকষ্টের সীমা থাকিবে না। তাহাই হইবে ভারতের পাপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ ছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥—গীতা ২।৩৪

—যদি তুমি এই ধর্ম্যযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে (ক্ষত্রিয়ভাবে) স্বকর্তব্য ও কীর্তি পরিত্যাগ করিয়া তুমি পাপ প্রাপ্ত হইবে।—২।৩৪

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যুদ্ধ করা উচিত কিনা সেই সম্বন্ধে অর্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥—গীতা ২।৩
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥—গীতা ২।৩৭

—হে অর্জুন, দুর্বলভাব প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত হয় না। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।—২।৩

যদি যুদ্ধে নিহত হও, স্বর্গলাভ করিবে (অর্থাৎ পৃথিবীতে ন্যায়ের

প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে জীবন দান করিয়া আসিয়াছ চিন্তা করিয়া পরলোকে সর্বদা মনের সুখকর অবস্থা বজায় রাখিতে পারিবে); আর যদি জয়ী হও (এবং জীবিত থাক) তাহা হইলে রাজ্য ভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়া উত্থিত হও।—২।৩৭

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিলেও, ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তাঁহার অমোঘবাণী এবং ইহা যেন আমাদের কানে অহরহ ধ্বনিত হয়। যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া, ভারতের ব্যাপক অমঙ্গল নিবারণ ভারতবাসিগণকেই করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্য সর্বদা ভালভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, যুদ্ধ করা আবশ্যক নাও হইতে পারে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি যুদ্ধ নিবারণের (অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ নিবারণের) প্রকৃষ্ট উপায়।

মানুষের নানাপ্রকার অমঙ্গলের জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে দায়ী মনে করে। তাহারা বলে যে ঈশ্বর আনন্দে লীলা করেন, কিন্তু দুর্ভোগ বা দুঃখকষ্ট চলিতে থাকে মানুষের। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান বা পরম করুণাময় হন, তাহা হইলে কেন এইরূপ ঘটে?

যাহারা এইরূপ মনে করে বা বলে, তাহারা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ মানুষের জন্মের ব্যাপারে ঈশ্বরের লীলা এক হিসাবে গৌণ বা অপ্রধান। সর্বক্ষেত্রে প্রধানতঃ লীলা করে প্রকৃতি ও জীব (বিশেষতঃ মানুষ)। নরনারীর (বা স্ত্রীপুরুষের বা স্বামীস্ত্রীর) সংযোগ হইতে শিশুদেহের জন্ম হয়। স্বামীস্ত্রী পুত্রকন্যালাভের জন্য আগ্রহান্বিত হয় বলিয়াই, ঈশ্বরের চিৎশক্তির অতিক্ষুদ্র অংশ চিদণুরূপে পুরুষের দেহ হইতে স্ত্রীর দেহে প্রবেশ করে। এই চিদণুসমূহকে গীতার ৭।১০ শ্লোকে "প্রাণিসমূহের সনাতন বীজ," ৯।১৮ শ্লোকে "অব্যয়বীজ," ১০।৩৯ শ্লোকে পুনরায় "সমস্ত প্রাণীর বীজ" এবং ১৪।৪ শ্লোকে ঈশ্বরকে "বীজপ্রদ পিতা" বলা হইয়াছে। সরস মাটিতে একটি আম্রবীজ প্রোথিত হইলে, ঐ বীজ মাটি হইতে বিভিন্ন উপাদান টানিয়া লইয়া পরে একটি ছোট আমগাছরূপে দেখা দেয়।

মানবশিশু ও অন্য জীবশিশুর জন্ম ঐ ভাবে মাতৃদেহ হইতে হয়। যদি কোন স্ত্রীপুরুষ মনে করে যে পৃথিবী অমঙ্গলময়, তাহারা কেন মানবশিশুকে এই অমঙ্গলময় পৃথিবীতে লইয়া আসে? না, পৃথিবী কেবল অমঙ্গলময় নহে। পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইই আছে—ইহাই ঠিক কথা। অমঙ্গল প্রকৃতিজাত, অন্য মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকৃত, অথবা স্বয়ংকৃত হইতে পারে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই—ঐ তিন প্রকার কার্যাবলীর উপর নির্ভর করে—(১) প্রকৃতির কার্যাবলী, (২) অন্যান্য মানুষের ও প্রাণীর কার্যাবলী, (৩) তাহার স্বয়ংকৃত (অর্থাৎ নিজের) কার্যাবলী। (১) সুবৃষ্টি, সূর্যালোক ও পরিমিত সূর্যতাপ প্রভৃতি মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, কিন্তু অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি অমঙ্গলজনক বলিয়া, অন্যভাবে জলের ব্যবস্থা করিয়া অনাবৃষ্টিজনিত অমঙ্গলের প্রতিকার এবং অতিরিক্ত জলের বহির্গমনের ব্যবস্থা করিয়া অতিবৃষ্টিজনিত অমঙ্গলের প্রতিকার করিতে হয়। অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দুর্বল লোক যাহাকে প্রকৃতির কার্যাবলী হইতে জাত দুর্ভাগ্য মনে করে; বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী লোক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহার প্রতিকার করে। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার যে অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আমরা এখনও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই। বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তদনুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিয়া আমরা বন্যার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারি। এই বিষয়ে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণের জ্ঞানও আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। (২) সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন লোক জনহিতকর কার্য করিলে, অন্যান্য লোকে সেই মঙ্গলের ফলভাগী হয়; কিন্তু দুষ্টপ্রকৃতির লোক, বা স্বার্থপর লোক, বা নির্বোধ লোক অমঙ্গকর কার্য করিলে, সরকারকে ও শক্তিশালী লোকসমূহকে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়। (৩) সুপ্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া লোকে নিজের

ও অপরের পক্ষে মঙ্গলজনক কার্য করে; কিন্তু কিছু লোকে যখন তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া কুপ্রবৃত্তিসমূহের বশবর্তী হয়, তখন তাহারা নিজেদের পক্ষে ও অন্যান্য লোকের পক্ষে অমঙ্গলজনক নানাপ্রকার কার্য করে। এইভাবে পৃথিবীতে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই ঘটিতেছে। আমরা যথাযথভাবে চেষ্টা করিয়া নানাপ্রকার অমঙ্গলের হ্রাসসাধন করিতে পারি।

অমঙ্গলের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা অথবা ঈশ্বরকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা চিন্তাহীন ব্যক্তির কার্য। কেহ কেহ বলে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান ও পরমকরুণাময় হন, তিনি কেন জগতের অমঙ্গল নিবারণ করিতেছেন না।

ঈশ্বর কখনও কোন লোককে বলেন নাই যে তিনি সর্বশক্তিমান ও পরমকরুণাময়। আমাদের ক্ষমতার তুলনায় ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম মনে হইলেও ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন। প্রকৃতির বিনাশসাধন ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব নহে। প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকারে ঘোরে এবং ইহা নিজেও লাটিমের ন্যায় ঘোরে। মানুষের সুবিধা অসুবিধা ঘটিলেও, পৃথিবীর বৃক্ষলতাদির ও সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্য প্রকৃতি ঐশ্বরিক প্রেরণায় ঐভাবে কার্য করে। সমস্ত প্রাণীর সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক বলিয়া, ঈশ্বরের পক্ষে ইহার পরিবর্তন সম্ভব নহে। দুইটি একই প্রকার সাধারণ লোকের মধ্যে একটি লোক নিয়মিতভাবে আহার্য গ্রহণ করায়, তাহার দেহে শক্তিসঞ্চার হইতেছে। অন্য লোকটি কোন কারণে খাদ্যগ্রহণ না করিলেও তাহার দেহে ঐ প্রকার শক্তিসঞ্চার হইতে থাকিবে—ইহা ঈশ্বরও করিতে পারেন না। শূন্য হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব নহে। কোন কোন যোগী যে অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই তিনি সেই ক্ষমতা লাভ করেন। মাধ্যাকর্ষণের জন্য আমরা পৃথিবীর বুকে আবদ্ধ হইয়া আছি, আবার অন্য প্রাকৃতিক নিয়মে, আমরা ইহাকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে আকাশপথে গমনাগমন করিতেছি।

প্রকৃতি যে ভাবেই চলুক না কেন, সমস্ত মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যখন যেভাবে ইচ্ছা কাজ করুক না কেন, সব সময় প্রত্যেক মানুষের মঙ্গল সমানভাবে চলিতে থাকিবে, ইহার ব্যবস্থা করা ঈশ্বরের ক্ষমতাতীত। কোন স্থানে বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও চলিতে থাকিল। কৃষকগণ এই বৃষ্টিকে তাহাদের শস্যের পক্ষে বিশেষভাবে মঙ্গলজনক মনে করিল। ঐ সময় কিছু লোক উন্মুক্ত স্থানে একটা ভাল যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বৃষ্টির জন্য তাহাদের যাত্রা পণ্ড হইয়া গেল। অন্য একটি স্থানে বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বৃষ্টির জন্য সেখানেও অনেক লোকের অসুবিধা হইল। এইরূপ স্থলে কেবল কোন উন্মাদ ব্যক্তিই বলিতে পারে যে যেখানে যাত্রা বা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা কিছু লোকে করিয়াছিল, সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেওয়া ঈশ্বরের উচিত ছিল। প্রকৃতি তাহার নানা-প্রকার সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলে। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে যেগুলি তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক, তাহাদের সাহায্যে তাহার নিজের মঙ্গলের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য নিয়ম অনুসারে তাহার যে অমঙ্গল ঘটিতে পারে, সেই অমঙ্গল নিবারণের বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। এমন কোন সর্বশক্তিমান ও পরম-করুণাময় ঈশ্বর নাই, যিনি সর্বসময়ে সমস্ত মানুষের বা সমস্ত প্রাণীর কেবল মঙ্গল সাধন করিতে পারেন।

কোন লোকের শক্তি ও গুণ তাহার কাজের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান না হইলেও বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার বিরাট শক্তির পরিচয় পাই এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সুখযুক্ত জীবনধারণের জন্য যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহাকে পরমকরুণাময় না বলিলেও, তাঁহাকে করুণাময় বা দয়াময় বলা যাইতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তাহা হইতে ঈশ্বরকে মঙ্গলময়ও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের নিজের চিৎশক্তির সাহায্যে জীবসৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং জীবের অমঙ্গলের ইচ্ছা ঈশ্বরের থাকিতে পারে বলিয়া মনে

হয় না। কিন্তু সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য কিছু সাময়িক অমঙ্গল মানুষের ঘটিতে পারে ও ঘটে। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গলময় ভাব নষ্ট হয় না; ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, কেবল ইহাই ইহার দ্বারা সূচিত হয়। অতএব আমরা ঈশ্বরকে বিরাট শক্তিমান, দয়াময় ও মঙ্গলময় বলিতে পারি।

ঈশ্বরকে দয়াময় ও মঙ্গলময় ভাবিবার নিম্নলিখিত কারণসমূহও আছে। গীতার ১৬।২-৩ শ্লোকে দৈবী সম্পদের ভিতর যে ২৬টি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর (১) অহিংসা (অর্থাৎ কোন জীবকে কোনভাবে কষ্ট না দেওয়া), (২) দয়াভূতেষু (অর্থাৎ সমস্ত জীবের প্রতি দয়াপ্রদর্শন) এবং (৩) অদ্রোহ (অর্থাৎ কোন জীবের প্রতি মনের মধ্যে শত্রুতার ভাব না রাখা)—এই তিনটি গুণকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। দেবভাবাপন্ন মানুষের ভিতর এই গুণগুলি থাকে।কিন্তু ঈশ্বরের ভিতর এই গুণগুলি নাই—ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং কোন জীবের প্রতি শত্রুতার ভাব লইয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া—এই প্রকার দোষ ঈশ্বরের ভিতর থাকিতে পারে না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সর্বদা সদয়ভাব পোষণ করেন। গীতার ১২।১৩-১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি. মস্ত প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন (অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং) এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব ও দয়ার ভাব পোষণ করেন (মৈত্রঃ করুণ এব চ), তিনি ঈশ্বরের প্রিয়। ঈশ্বরভক্ত ও ঈশ্বরের প্রিয় ব্যক্তির ভিতর যে গুণগুলি থাকে। ঈশ্বরের ভিতর সেই গুণের ভাব নাই, ইহা সম্ভব নহে। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা সংশয়াতীতভাবে বলিতে পারি যে তিনি দয়াময়। প্রকৃতির লীলার ভিতর দিয়া ঈশ্বরও জীবভাবে লীলা করেন—ইহা বলা যাইতে পারে। কেঃ ইচ্ছা করিয়া নিজের প্রতি শত্রুতা বা নিষ্ঠুরতা করে না সুতরাং ঈশ্বরও ইহা করেন না।

গীতার ৫।২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে সংযতচিত্ত (যতাত্মানঃ), দোষমুক্ত (ক্ষীণকল্মষাঃ) ও সর্বপ্রাণীর মঙ্গলচিন্তায় রত (সর্বভূতহিতে রতাঃ) হইয়া ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ (অর্থাৎ মুক্তি) লাভ করেন। পুনরায়

১২।৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া (সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং), সকলকে সমানভাবে দেখিয়া (সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ), সর্বপ্রাণীর মঙ্গলচিন্তায় রত (সর্বভূতহিতে রতাঃ) হন, তাঁহারা আমাকেই (অর্থাৎ ঈশ্বরকেই) লাভ করেন (তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব)। মানুষ সমস্ত জীবের মঙ্গলচিন্তার ভিতর দিয়া ঈশ্বর ভাবাপন্ন হয় ও মুক্তিলাভ করে, কিন্তু জীবসমূহের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়ভাব নাই—ইহাও সম্ভব নহে। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা সংশয়াতীতভাবে ইহাও বলিতে পারি তিনি মঙ্গলময়।

বিজ্ঞানের সাহায্যে ও বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ অধিক শক্তিমান হইতেছে এবং তাহাকেও ঈশ্বরের ন্যায় দয়াময় ও মঙ্গলময় হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পৃথিবীতে ও বিশেষতঃ ভারতে মানুষের যে দুঃখকষ্ট দেখিতেছি, তাহা বহুল-পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মানুষের দুঃখকষ্ট পৃথিবী হইতে কখনও সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইতে পারে না ও হইবে না। প্রকৃতিজাত, অন্য মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকৃত, অথবা স্বয়ংকৃত অমঙ্গল সাময়িকভাবে কিছু না কিছু থাকিবে। মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি আপেক্ষিক অবস্থা বোঝায়। অমঙ্গল না থাকিলে মঙ্গলকে, দুঃখ না থাকিলে সুখকে ভালভাবে বোঝা যায় না এবং কিছু লোকের পক্ষে যাহা অমঙ্গলকর মনে হয়, অন্য অনেক লোকের পক্ষে তাহা আবার মঙ্গলকর হয়। মঙ্গলামঙ্গল, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব মানুষকে সক্রিয় করিয়া রাখে ও তাহার বুদ্ধির বিকাশসাধন করে এবং ইহারই মধ্যে তাহার সঞ্জীবতা রহিয়াছে। দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি-সমূহকে তাহারা উদ্বুদ্ধ করে। নিষ্কাম মনোভাবের সহিত দয়া দেখাইয়া পরোপকার প্রভৃতি করিয়া মানুষ নির্মল আনন্দ লাভ করে।

পৃথিবীতে অনেক অমঙ্গল থাকা সত্ত্বেও, লোকে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে চায় না। বিশেষ অমঙ্গল না থাকিলে, মানুষের পক্ষে পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়া কত কষ্টকর হইত!

নবম অধ্যায়

(ক) বহুরূপী ঈশ্বর ও বহু দেবদেবী
(খ) প্রতীকোপাসনা
(গ) দেশাত্মবোধজাগরণে প্রতীকের ব্যবহার

(ক) বহুরূপী ঈশ্বর ও বহু দেবদেবী।

জড়বাদিগণ বলে যে জড় পদার্থ ও শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে চেতনাশক্তির উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তিগণ এই ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত মনে করে ও ইহাকে বর্জন করে। ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তি মাত্র। আমাদের প্রত্যেকের মন থাকিলেও এবং ঐশী চিৎশক্তির তুলনায় ইহা অনেক কম সূক্ষ্ম হইলেও, ইহাকে যেমন দেখা যায় না, সেই ভাবে ঈশ্বরকেও দেখা যায় না। ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। তিনি সৎ (অর্থাৎ তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন—তাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই), তিনি চিৎ (অর্থাৎ বিশ্বে যে চেতনাশক্তি কাজ করে বা করিতেছে, তিনি তাহার মূল আধার) এবং তিনি আনন্দ (অর্থাৎ তাঁহার ভিতর কোন দুঃখের ভাব নাই; স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব তাঁহার ভিতর বর্তমান) তাঁহার চিৎশক্তির সহিত অচিৎশক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বদা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অচিৎশক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। ইহাকেই মূল প্রকৃতি বলা হয় এবং ইহাও অবিনশ্বর। ঈশ্বরের প্রেরণায় ও নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে; তখন আমরা ইহাকে জগৎ বলি। জগতে বিরামহীনভাবে নামরূপের পরিবর্তন চলে; কিন্তু ঈশ্বরের ভিতর ঐরূপ কোন পরিবর্তন হ . না। তিনি পরিবর্তনহীন ভাবে থাকিয়া প্রাকৃতিক পরিবর্তনসমূহের দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন এবং তাঁহার ভিতর স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব চলিতে থাকে। বিশ্বব্যাপী প্রকৃতির ভিতর দিয়া আমরা ঈশ্বরের বিরাট শক্তির পরিচয় পাই এবং পৃথিবীতে প্রাণিগণের সুখযুক্ত জীবন ধারণের জন্য যে ব্যবস্থা

আছে, তাহা ঈশ্বরের দয়াকে প্রকাশিত করে। সুতরাং ঈশ্বর বিরাট শক্তিমান ও দয়াময়। ঈশ্বরের চিৎশক্তির একটি অবিনশ্বর অংশ জীবাত্মারূপে মানুষের দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির পশ্চাতে থাকিয়া দ্রষ্টারূপে দেহের কষ্ট যন্ত্রণা ও ইন্দ্রিয়সমূহের সুখ এবং মনের সুখদুঃখ দেখে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার ঐশ্বরিক ইচ্ছা হইতেই নানাপ্রকার জীব ও শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং মানুষ ও অন্যান্য জীবকে ঈশ্বরের অতি ক্ষুদ্র ও খণ্ডিতরূপ বলা যাইতে পারে। কেহ ইচ্ছা করিয়া নিজের দুঃখ কষ্ট উৎপন্ন করে না। ঈশ্বরও ইচ্ছা করিয়া মানুষ বা অন্য জীবের দুঃখকষ্ট উৎপন্ন করেন না; কারণ মানুষ ও অন্য জীবের দুঃখ কষ্ট প্রকারান্তরে ঈশ্বরেরই দুঃখ কষ্ট। সকলের মঙ্গল হউক—এই প্রকার ইচ্ছাই ঈশ্বরের ইচ্ছা; সেই জন্য ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক মানুষ অন্যান্য মনুষ্যকৃত বা অন্যান্য প্রাণীকৃত ও স্বাধীন ইচ্ছায় স্বয়ংকৃত কর্মের ভাল মন্দ ফল ভোগ করে। ইহার জন্য ঈশ্বরকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যায় না। মানুষ মঙ্গলামঙ্গল বা সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের মধ্যে ভাল হইতে মন্দের দিকে, আবার মন্দ হইতে ভালর দিকে আসে; এই ভাবে দেওয়াল ঘড়ির দোলকের ন্যায় বিরামহীনভাবে তাহার অগ্র পশ্চাৎ গতি চলে। কিন্তু জগতে একই সময় একদিকে অগণিত জীবের সুখ এবং অন্যদিকে অগণিত জীবের দু.খকষ্ট চলিতে থাকায় এবং ঈশ্বর একই সময় এই সুখ দুঃখের দ্রষ্টা হওয়ায়, তাঁহার ভিতর কোন প্রকার দ্বন্দ্বের ভাব উপস্থিত হয় না; তিনি দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় থাকেন।

[কোন কোন বৈদান্তিক বলেন "ঈশ্বর দ্বন্দ্বাতীত" ইহাই প্রকৃত সত্য; সুতরাং ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ আখ্যা দিয়া তাঁহার সহিত আনন্দের ভাবকে জড়িত করা ঠিক নহে। যাঁহারা ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ আখ্যা দেন, তাঁহারা ইহার উত্তরে বলেন যে ঈশ্বরের ভিতর কোন প্রকার দুঃখের ভাব নাই—এই অবস্থাটিকে সকলের বোধগম্য করিবার জন্য তাঁহারা আনন্দ শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ঈশ্বরকে

সচ্চিদানন্দ বলেন। ঈশ্বর সর্বপ্রকার দুঃখের অতীত এবং সর্বপ্রকার সুখ ও আনন্দেরও অতীত—এইরূপ যে ভাবা যাইতে পারে না তাহা নহে। কিন্তু পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীবাত্মার পক্ষে আনন্দেরও অতীত অবস্থা লাভকরা সহজ নহে। সাধক ঈশ্বরচিন্তা করিয়া নির্মল, স্থির ও মৃদু আনন্দ লাভ করিতে চান। সাধকের অবস্থা নেতিবাচক নহে অর্থাৎ তিনি আনন্দহীন অবস্থায় যাইতে চান না। তিনি ইতিবাচক অবস্থা অর্থাৎ নির্মল, স্থির ও মৃদু আনন্দের ভাব লাভ করিতে চান এবং ইহাই তাঁহার সাধনার লক্ষ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। (৩।৬) অর্থাৎ আনন্দ হইতেই প্রাণিসমূহের জন্ম হয়, আনন্দের দ্বারা তাহারা জীবন-ধারণ করে এবং (মৃত্যুর পর) তাহারা আনন্দে ফিরিয়া যায় ও প্রবেশ করে (৩।৬)। অতএব নির্মল, স্থির ও মৃদু আনন্দকে পৃথক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন জীবাত্মা সাধকভাবে লাভ করিতে চায়; ইহা ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চতর স্তরের অনুভূতি। দ্রষ্টার আনন্দ, আত্মিক আনন্দ ও নিষ্কাম কর্মের আনন্দ—ইহারা উল্লিখিত প্রকারের আনন্দ এই পুস্তকে বলা হইয়াছে।]

সাধারণ মানুষ পৃথিবীতে নানাভাবে সুখলাভ করিতে চায়; তাহার সুখ যেমন বাড়িয়াছে, ঐভাবে তাহার দুঃখ কষ্টও কিছু কিছু বাড়িয়াছে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই পার্থিব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ নানাভাবে এই দুঃখকষ্টের হ্রাসসাধন করিতে পারে। ইহার জন্য জাগতিক বিদ্যা ও পরাবিদ্যা উভয় প্রকার বিদ্যার প্রয়োগ আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপরে কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বর ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি উপমা দেওয়া হয়; এই উপমাও মনে রাখা যাইতে পারে। কোন স্থানে দুইটি বন্ধু বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল পঙ্গু, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি ও ঠিক পথে চালিত করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। অন্যটি ছিল অন্ধ, কিন্তু তাহার দেহের, হস্তদ্বয়ের ও পদদ্বয়ের শক্তি ছিল অসাধারণ।

যখনই তাহাদের গমনাগমন ও কাজ করা আবশ্যক হইত, তখনই প্রথম চক্ষুষ্মান ব্যক্তিটি দ্বিতীয় অন্ধব্যক্তিটির স্কন্ধে উঠিয়া বসিত এবং সম্মিলিতভাবে গমনাগমন করিয়া উভয়ের প্রয়োজনীয় কার্যসমূহ করিত। সমগ্র বিশ্বে ঐ ভাবে চক্ষুষ্মান পঙ্গু ও শক্তিশালী অন্ধের কার্য চলিতেছে। ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় দ্রষ্টা এবং প্রকৃতির পরিচালক; প্রকৃতি বিশ্বব্যাপী বিরাট অচেতন জড়শক্তি। উভয়ের সহযোগিতায় বিশ্বের সমস্ত কার্য চলিতেছে। দার্শনিকগণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতিতত্ত্ব বা জগৎতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা বা জাগতিক বিদ্যা উভয়প্রকার বিদ্যার সমাবেশে মানুষের জ্ঞান কতকটা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। উভয় প্রকার বিদ্যা পৃথিবীতে সমানভাবে আবশ্যক।

ভারতের কল্পনাপ্রবণ হিন্দুগণ ঈশ্বর ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা-প্রকার কল্পনা করিয়াছে। গীতার ১৪।৩-৪ শ্লোকে ঈশ্বরকে বীজপ্রদ পিতা এবং প্রকৃতিকে গর্ভধারিণী মাতারূপে বর্ণনা করিয়া প্রকৃতি-যুক্ত ঈশ্বরকে নারীশ্বর (অর্থাৎ নারী যুক্ত ঈশ্বর এই প্রকার) রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ভিতর এই প্রকার কল্পনা থাকিলেও, ইহার ভিতর একটি গভীর সত্যও নিহিত আছে। সেই সত্যটি এই যে পৃথিবীর সমস্ত জীব তাহাদের বিভিন্ন স্তরের চেতনা—ক্ষীণতম স্তর হইতে মানুষের মধ্যে প্রকাশমান উচ্চতম স্তর পর্যন্ত—ঈশ্বরের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে এবং সকলেই তাহাদের দেহ প্রকৃতির নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে নারীশ্বররূপে কল্পনা করিলেও ইহা বেদান্ত ও গীতার একেশ্বরবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

বৈদান্তিক চিন্তাধারার অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতে বহুদেববাদ প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বেদের কর্মকাণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে ইহাতে তেত্রিশটি দেবতার (অর্থাৎ দেব ও দেবীর) নামোল্লেখ আছে। কোন কোন দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যময় যাগযজ্ঞ করা হইত এবং অন্য কোন কোন দেবতার উদ্দেশে স্তবস্তুতি করা

হইত। আর্যগণ বা হিন্দুগণ ক্রমশঃ দেখিল যে এই প্রকার কর্মবহুল যাগযজ্ঞের ও স্তবস্তুতির বিশেষ কোন মূল্য নাই। সেইজন্য এইগুলি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে তেত্রিশটি বৈদিকে দেবতার পূজা করা দূরে থাক, তাহাদের নাম মনে রাখিবার আবশ্যকতা কেহ বোধ করে না। আঠারটি পুরাণ আছে এবং কল্পনা-বিলাসী পুরাণকারগণ তাঁহাদের রচিত পুরাণসমূহে বহু দেবদেবীর কাহিনীসমূহ লিখিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা পুরাণসমূহ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে কোন কোন পুরাণকারের মতে দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটি মাত্র নহে, তাঁহাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। পুরাণসমূহের মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য, এবং ধর্ম ও সুনীতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা থাকিলেও, ইহারা ইতিহাস নহে কিংবা দর্শনশাস্ত্রও নহে। সুতরাং বর্তমান কালের লোকের নিকট ইহাদের অধিক মূল্য নাই। পুরাণ-কারগণ যে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলিয়াছেন, তাহার ভিতর এই প্রকার ইঙ্গিত থাকিতে পারে যে মহাকাশে পরলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত দেবলোকে যে সূক্ষ্মদেহধারী মুক্ত জীবাত্মাগণ আছেন এবং এই পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত দেবভাবাপন্ন নরনারী আছেন, তাঁহাদের সম্মিলিত সংখ্যা ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও, ইহা অন্ততঃ তেত্রিশ কোটি হইতে পারে।

বেদান্তের সত্যান্বেষী ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে বিশ্বের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া এবং চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এক ঈশ্বর ও এক প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কোন কিছু দেখিতে পান নাই। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে এই এক ঈশ্বর ও এক প্রকৃতি এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে বিশ্বের এই চরম সত্বাকে একও বলা যাইতে পারে। এই প্রকার ধারণা ক কেহ কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলেন, কারণ দ্বৈতযুক্ত যে অদ্বৈত তাহাই দ্বৈতাদ্বৈত। (নিম্বার্কাচার্য দ্বৈতাদ্বৈত বাদের সমর্থক ছিলেন)। এই পুস্তকের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহাকে একদ্বিবাদ বলা হইয়াছে; কারণ ইহার অর্থ এক হইতে দ্বি অথবা একীভূত দ্বি।

যদি প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বর বিশ্বের চরম সত্ত্বা হন, তাহা হইলে ইহার বাহিরে কোন দেবদেবী থাকা সম্ভব নহে। মানুষ কেবল এই প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে মনে মনে খণ্ড খণ্ড করিয়া এই খণ্ডিত শক্তিগুলিকে বিভিন্ন দেবদেবী বলিয়া অভিহিত করিতে পারে। ভারতে কিছু কিছু লোক সত্যই ইহা করিয়াছে। ঐশ্বরিক প্রেরণায় একই প্রকৃতি সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের কার্য করিতে থাকিলেও, তাহারা প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে মনে মনে ত্রিখণ্ডিত করিয়া, সৃষ্টিকার্যে রত প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে ব্রহ্মা, স্থিতিকার্যে ও পালনকার্যে রত প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে বিষ্ণু এবং ধ্বংস কার্যে রত প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরকে মহেশ্বর নাম দিয়াছে। এইভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহারা তিন জনই পুরুষ-দেবতা।

কেবল পুরুষ লইয়া জগৎ চলে না। মাতা, ভগ্নী ও কন্যারূপে নারী না থাকিলে জগৎ সুন্দর হয় না। ইহাদের মধ্যে আবার নারীর মাতৃরূপটি সর্বাপেক্ষা অধিক মধুর ও সুন্দর। জগতে প্রত্যেকের সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার মাতার সহিত। মাতা তাঁহার বুকের রক্ত দিয়া তাঁহার দেহের ভিতর তাঁহার শিশু পুত্রকন্যার দেহ গঠন করিয়াছেন এবং ইহার জন্য তাঁহাকে কিছু কষ্ট ভোগও করিতে হইয়াছে। তাহাদের জন্মের পর মাতার দেহের কিয়দংশ স্তন্যদুগ্ধ রূপে তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে অমৃতধারার ন্যায় ক্ষরিত হইয়া শিশু পুত্র কন্যার দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই স্থূলদেহের বৃদ্ধিসাধনে সাহায্য করিয়াছে। শিশু ভয় পাইলেই তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরে; কারণ সে জানে যে তাহার মাতাই তাহার সর্বপ্রধান রক্ষয়িত্রী। শিশু মাতার নিকট হইতেই জগতের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে।

স্থূলদেহধারী মানুষী মাতা অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ও হিতকারী কোন দেবী আছেন কিনা সেই চিন্তা কিছু কিছু কল্পনাপ্রিয় ভারতবাসীর মনে উদিত হইল। তাহারা দেখিল যে প্রকৃতি বিশ্বব্যাপী বিরাট শক্তি, এবং বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা এই

আদ্যাশক্তি প্রকৃতির দ্বারাই সংঘটিত হইতেছে। তাহারা যে শক্তিশালী দেবীর অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা আদ্যাশক্তি প্রকৃতির ভিতর তাঁহাকে দেখিতে পাইল ও তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। কিন্তু লোকে দেখিল যে এই দেবী বিভিন্নভাবে নানাপ্রকার কার্য করিতেছেন। তিনি জীবের স্থূলদেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্থূলদেহ-সমূহকে বিভিন্ন সময়ের জন্য রক্ষা করিতেছেন। জীবের বিশেষতঃ মানুষের সুখযুক্ত জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তিনি উৎপন্ন করিতেছেন এবং বিভিন্ন সময়ের জন্য রক্ষাও করিতেছেন, আবার কাল পূর্ণ হইলে তিনি জীবসমূহের ও অন্যান্য দ্রব্যের ধ্বংসও করিতেছেন। দেবীর কাজ অনুসারে দেবীর শক্তিকে খণ্ডিতভাবে দেখিয়া বিভিন্ন লোকে তাঁহার বিভিন্ন নাম দিল এবং সর্বভাবেই তিনি মাতৃরূপে কাজ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক নামের পূর্বে "মা" এই শব্দটি যোগ করিয়া দিল। এইভাবে একই দেবী মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, মা জগদ্ধাত্রী, মা চণ্ডী, মা কালী, মা তারা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া পুজিত হইতে লাগিলেন। মা ষষ্ঠী, মা মনসা, মা শীতলা, মা অন্নপূর্ণা, মা গঙ্গা প্রভৃতি কার্যের বিভিন্নতা অনুসারে ঐ একই দেবীর অন্যান্য নামও হইল। কল্পনাপ্রিয় পুরাণকারগণ মহেশ্বর বা শিবের সহিত দুর্গার বিবাহ দিলেন এবং তাহার ফলে কার্তিক ও গণেশের জন্ম হইল। একই দুর্গা গৌরী, পার্বতী, উমা, নারায়ণী, প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও পরিচিত হইতে লাগিলেন। পুরাণকারগণ যেমন শিবের সহিত দুর্গার বিবাহ দিলেন, ঐ ভাবে ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রীর এবং বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহও তাঁহারা দিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (বা শিব)। কার্তিক ও গণেশ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষ-দেবতার কল্পনাও পুরাণকারগণ করিলেন। জগন্নাথ, বিশ্বকর্মা, শনি, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি হিন্দুগণের অন্যান্য পুরুষ-দেবতা হইলেন। নারায়ণ বিষ্ণুর অন্য নাম হইল। মুসলমানগণের সত্যপীরের ন্যায় সত্যনারায়ণ হিন্দুগণের আরাধ্য হইলেন। তখন হইতে

শিন্নি বা শিন্নী (ফার্সী ভাষায় শিরনী বা শিরীনী) অর্থাৎ দুধ, কলা, ময়দা ও চিনির মিশ্রিত নৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইল।

একটি শিক্ষিত ব্যক্তি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন; তখন লোকে তাঁহাকে শিক্ষক বলে। তিনি খুব ভালভাবে গান করিতে পারেন এবং যখন বিভিন্ন গানের আসরে গিয়া সুন্দরভাবে গান করেন, তখন লোকে তাঁহাকে উত্তম গায়ক বলে। আবার তিনি ভালভাবে জাদুবিদ্যাও শিখিয়াছেন এবং বিভিন্ন স্থানে গিয়া তিনি যখন তাঁহার বিস্ময়কর জাদুবিদ্যা দেখান, লোকে তাঁকে উত্তম জাদুকর বলে।

কার্যের বিভিন্নতা অনুসারে যেমন একই ব্যক্তির বিভিন্ন নাম হয়, ঐভাবে ঐশ্বরিক প্রেরণায় প্রকৃতি বিভিন্নভাবে কার্য করে বলিয়া মানুষ প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করিয়াছে ও তাঁহার বিভিন্ন নাম দিয়াছে।

প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বর যেন পুরুষভাবে বিভিন্ন কাজ করিতেছেন, এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরকে বিভিন্ন পুরুষ-দেবতার রূপ ও বিভিন্ন নাম দেওয়া হইল। প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বর আবার যেন মাতৃভাবে বিভিন্ন কাজ করিতেছেন এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরকে বিভিন্ন দেবীর রূপ ও বিভিন্ন নাম দেওয়া হইল। কিছু মানুষই এইভাবে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বহুরূপী করিয়া তুলিয়াছে এবং বিভিন্ন দেবদেবী সম্বন্ধীয় ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু এই প্রকার কার্যকে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত বলা চলে না। যদি একই ব্যক্তিকে তাহার কার্য অনুসারে শিক্ষক, গায়ক ও জাদুকর এই তিনটি নাম দেওয়া সঙ্গত হয়, ঐশ্বরিক প্রেরণায় বিভিন্নভাবে কার্যকারী আদ্যাশক্তি প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এক ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম দেওয়া কেন সঙ্গত হইবে না ?

ঈশ্বর যখন সৃষ্টিকার্যের জন্য প্রকৃতির ভিতর প্রেরণাদান করেন এবং জড় জগৎ সৃষ্টির পর অতি ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত প্রাকৃতিক শক্তি ও পদার্থের ভিতর দিয়া জীবভাবে নিজের চিৎশক্তির প্রকাশের ব্যবস্থা

করেন, তখন তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মা। জীবসৃষ্টির কার্য অব্যাহতভাবে চলিতেছে; সুতরাং ব্রহ্মার কার্যও চলিতেছে।

জীবশিশুগণের জন্মের পর ব্রহ্মার কন্যা মা ষষ্ঠী তাহাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

জগৎ ও জীবগণের পশ্চাতে থাকিয়া ঈশ্বর তাহাদের স্থিতি ও জীবগণের পালনের দিকে লক্ষ্য রাখেন। তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী এই কার্যে বিষ্ণুকে সাহায্য করেন। জমিতে ধান, গম প্রভৃতি বপন করিলে মা লক্ষ্মী তাহার বহুগুণ ধান, গম প্রভৃতি আমাদিগকে দেন। জীবগণের সুখযুক্ত জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক মা লক্ষ্মী তাহা উৎপন্ন করিতেছেন। বিষ্ণু বিভিন্ন পদার্থ বা শক্তির জন্য এবং বিভিন্ন জীবের জন্য বিভিন্ন স্থিতিকাল নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। জীবের কর্মের উপরও ইহা কিছু কিছু নির্ভর করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সূর্য বহুকোটি বৎসর থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ স্থূলদেহ লইয়া একশত বৎসরের কম পৃথিবীতে থাকে। ইহা বিষ্ণুরূপী ঈশ্বরেরই কার্য।

সর্বসংহারক মহেশ্বর (বা শিব) বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উল্লিখিত কার্যে বাধা দেন না। শিব অনেক সময় ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকেন। শিবপ্রিয়া দুর্গা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর কাযকালে জীবের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন। সেইজন্য তাঁহার নামে পূর্বে বিবিধ বিশেষণ যোগ করিয়া লোকে তাঁহাকে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা, বিপত্তারিণী মা দুর্গা প্রভৃতি বলে। মা দুর্গা জানেন যে তিনি সর্বসংহারক মহেশ্বরের পত্নী এবং প্রত্যেক প্রাণী ও অপ্রাণীর কাল পূর্ণ হইলে, তাঁহাকেই মা কালীর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদের সংহার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কেবল সংহার করিয়া "হন্ত্রী মাতা কালী" এই অপবাদ লইতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং যতদিন সম্ভব রক্ষয়িত্রী মা দুর্গাভাবে কার্য করিবার পর অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে, তিনি সংহর্ত্রী মা কালীরূপে কার্যে প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু মা কালী প্রত্যেক মানুষকে বলেন যে পৃথিবীর মঙ্গলের

জন্য তাহার স্থূলদেহের বিনাশ আবশ্যক। যে মৃত্যুকে সে চরম অমঙ্গল মনে করিতেছে, তাহারই ভিতর পরম মঙ্গল নিহিত আছে। তাহার আত্মা অমর এবং সে সাধনাদ্বারা সুখশান্তিপূর্ণ দেবলোকের অধিবাসী হইতে পারে।

পুরুষ-দেবতা জগন্নাথ বিষ্ণু বা নারায়ণেরই অন্যরূপ এবং সেই ভাবে তিনি পূজিত হন। যাহারা যান্ত্রিক কার্য করে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাহাদের নিকট পূজ্য। শনি হইতে অমঙ্গল নিবারণের জন্য শনি দেবতা কখন কখন পূজিত হন। মানুষের পাপপুণ্যাদির লেখক হিসাবে চিত্রগুপ্তও কাহারও কাহারও নিকট পূজা পাইয়া থাকেন।

সর্বপ্রকার বিদ্যা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিশেষভাবে বিদ্যাশ্রমিগণের দ্বারা মা সরস্বতী পূজিত হন। মা দুর্গার অন্যরূপভাবে মা জগদ্ধাত্রীর পূজাও কেহ কেহ করে। মা দুর্গা চণ্ডীভাবে বা তারাভাবে বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়া পূজিত হন। আদ্যাশক্তি প্রকৃতি অন্নের দ্বারা জীবসমূহকে পালন করেন বলিয়া কখন কখন মা অন্নপূর্ণারূপে পূজার পাত্র হন। কেহ কেহ বসন্ত কলেরা প্রভৃতির প্রকোপ নিবারণের জন্য মা শীতলার পূজা এবং সর্পাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য মা মনসার পূজা করে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ স্থান হইতে নামিয়া আসিয়া গঙ্গানদী উত্তর ভারতের মধ্যদিয়া এবং পূর্বভারতের কিয়দংশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নানাভাবে বহুকোটি লোকের উপকার করিতেছে। সেই জন্য গঙ্গা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা গঙ্গাও পূজার্হ হইয়াছেন।

এইভাবে প্রকৃতিযুক্ত এক ঈশ্বর অনেক হিন্দুর মনোমধ্যে খণ্ডিত হইয়া বহুরূপী ঈশ্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বহু দেবদেবীভাবে পূজিত হইতেছেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে এই সম্বন্ধে গীতার যথার্থ ও মূল্যবান শিক্ষা মনে রাখা অত্যাবশ্যক।

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ গীতা ৯।২৩

—হে অর্জুন, যে সমস্ত ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবতার পূজা

করে, তাহারাও আমারই (অর্থাৎ ঈশ্বরেরই) পূজা করে, কিন্তু তাহারা ইহা অবিধিপূর্বক করে। গীতা ৯।২৩

ঈশ্বরকে খণ্ডিতভাবে দেখিয়া বহু দেবদেবীরূপে তাঁহার পূজা করিলে, ইহা ঠিক পূজা হয় না। ইহাতে ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র করা হয় ও তাঁহার মহিমাকে খর্ব করা হয়। সেইজন্য এইরূপ পূজা অবিধি-পূর্বক পূজা। ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তিমাত্র। তিনি বিরাট শক্তিমান, দয়াময় ও মঙ্গলময়। সমগ্র প্রকৃতির ভিতর অনুস্যূত বা অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া তিনি তাহার স্রষ্টা ও চালকরূপে কার্য করিতেছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রকার চিন্তা করিয়া এবং যতদূর সম্ভব গভীরভাবে তাঁহাতে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া পূজা করিলে তাহাই হইবে বিধিপূর্বক পূজা। **যে কোন দেব বা দেবীর পূজা করিবার সময় আমাদের প্রত্যেককে মনে রাখিতে হইবে যে আমরা সেই একই পরমেশ্বরেরই পূজা করিতেছি। আমরাই এক ঈশ্বরের বহুনাম দিয়াছি।**

(খ) প্রতীকোপাসনা :—

প্রতীক শব্দের অর্থ অবয়ব বা চিহ্ন। ইহা কোন মূর্তি, অথবা চিহ্ন (বা নিদর্শন) কিংবা কোন ছবি হইতে পারে। বুদ্ধের মূর্তি বা ছবি বুদ্ধের প্রতীক। ইহা তাঁহার মহান ত্যাগ ও উচ্চ নৈতিক ধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উপরে দেবদেবী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার যে কিছু ভিত্তি আছে, তাহা আমরা উপরের আলোচনা হইতে দেখিয়াছি। (১) অপ্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের জন্ম, (২) বিভিন্ন সময় ধরিয়া প্রাণি ও অপ্রাণিগণের স্থিতি এবং প্রাণিগণের সুখযুক্ত জীবন-ধারণ এবং (৩) অবশেষে প্রাণিগণের মৃত্যু ও অপ্রাণিগণের বিনাশ বা ধ্বংস—এই তিনপ্রকার কার্য যে জগতে চলিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যেকে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই তিনপ্রকার কার্যকে ভিত্তি করিয়া ভারতে কিছু লোকের মনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ধারণা আসিয়াছে। এক ঈশ্বর এই তিনপ্রকার কার্য করিতে থাকিলেও,

কিছু কিছু হিন্দু তাঁহাকে তিনটি পুরুষ-দেবতারূপে কল্পনা করিয়াছে। তাঁহাদের উল্লিখিত তিনপ্রকার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য অন্য কোন কোন পুরুষ-দেবতা এবং কিছু দেবীরও কল্পনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেবদেবীর কিছু কিছু পূজাও করা হয়। ইহা রূপান্তরিত বৈদিক ধর্ম।

কিন্তু ঈশ্বর বা দেবদেবী সম্বন্ধীয় চিন্তা অপেক্ষাকৃত অল্প কিছু লোকের মনোমধ্যে থাকে। কীভাবে জনসাধারণকে ইহাদের কথা যখন তখন মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং তাহাদের মনে স্বাভাবিকভাবে যে ভক্তির ভাব আছে, তাহাকে ভালভাবে জাগাইয়া দিয়া সকলকে তাঁহাদের পূজায় প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সূত্রপাত করা যাইতে পারে, এই চিন্তা কিছু লোকের মনে আসিল। তখন তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মন্দির বা সাময়িক পূজার ব্যবস্থা করিয়া প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা বা পূজা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাকেই সাধারণতঃ মূর্তিপূজা বলা হয় এবং কিছু লোকে ইহাকে হিন্দুগণের পৌত্তলিকতা বলে। কিন্তু তাহাদের এই সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান না থাকায়, তাহারা ইহাকে নিন্দনীয় কার্য মনে করে।

মূর্তিপূজা মূর্তির পূজা নহে এবং প্রতীকোপাসনা প্রতীকের উপাসনা নহে। মূর্তি সহ দেবদেবী বা ঈশ্বরের পূজাই মূর্তিপূজা এবং প্রতীক সহ দেবদেবী বা ঈশ্বরের উপাসনাই প্রতীকোপাসনা। মূর্তি ও প্রতীকের ভিতর পার্থক্য এই যে মূর্তি মানুষের ন্যায় মস্তকাদি বিশিষ্ট, কিন্তু প্রতীক চিহ্ন বা নিদর্শন মাত্র। মসৃণ, কৃষ্ণবর্ণ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও প্রায় গোলাকার একটি শালগ্রাম শিলা দেখাইয়া বলা হইল, "ইনি বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রতীক"। যাহারা ইহা দেখিল বা ইহার কথা শুনিল, তাহারা ভবিষ্যতে ইহাকে দেখিলে, ইহাকেই বিষ্ণু মনে করিবে না। ইহা তাহাদিগকে বিষ্ণুর কথা, অর্থাৎ প্রকৃতির সাহায্যে তাহাদের পালনকারী ঈশ্বরের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। আবার মা দুর্গার স্থূল মূর্তি (বা ছবি) তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে

তাহাদিগের কাল (অর্থাৎ পৃথিবীতে স্থূলদেহে স্থিতির কাল) পূর্ণ (বা শেষ) না হওয়া পর্যন্ত মহেশ্বর নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবেন এবং মা দুর্গা তাহাদের রক্ষণ কার্যে বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীকে সাহায্য করিবেন। মা দুর্গার মূর্তিও একপ্রকার প্রতীক। কারণ এই মূর্তি দুর্গা নহে; ইহা কেবল সর্বসংহারক মহেশ্বর ও সাময়িকভাবে রক্ষয়িত্রী মা দুর্গার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আলেখ্য বা ছবিও একপ্রকার প্রতীক।

শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিগণের মূর্তি বা ছবি প্রতীক ও স্মারকের কার্য করে। শ্রীচৈতন্যের মূর্তি বা ছবি ঈশ্বরে গভীর অভিনিবেশের ফলে, তাঁহার সর্বত্যাগী হইবার কথা, তাঁহার অযৌক্তিক জাতিভেদ বর্জনের কথা, যে কোন ব্যক্তি কামনা ক্রোধ লোভ প্রভৃতির উর্ধ্বে উঠিয়া শুদ্ধচিত্ত ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলেই তাহাকে তাঁহার সাদর আলিঙ্গনের কথা, জীবে দয়া-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নির্দেশের কথা, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণের গভীর আকুতি বা ব্যাকুলতার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি বা ছবি তাঁহার ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, ও গভীর ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা, পরাধীনতার পাপ হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত বৈদেশিক শাসকগণের সহিত তাঁহার অহিংস ও নৈতিক সংগ্রামের কথা, কোটি কোটি দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের দুঃখকষ্টমোচনের জন্য তাঁহার আগ্রহাতিশয্যের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি যাহারা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে, তাহারা তাঁহাদের মূর্তি বা ছবি দেখিয়া ঐ মূর্তি বা ছবির প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় না। ঐ মূর্তি বা ছবি যাঁহার প্রতীক বা নিদর্শন, সেই শ্রীচৈতন্য বা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিই তাহারা তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ঐ মূর্তি বা প্রতীক এমন একটি আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, যাহা সামান্যভাবে অনুসৃত হইলেও অনেক লোকের জীবন সার্থক হইয়া যাইতে পারে।

যখন কোন হিন্দু কোনস্থানে অবস্থিত কালীমন্দিরে গিয়া মা কালীর মূর্তি দর্শন করে, এবং মা কালীর প্রতি তাহার ভক্তি নিবেদন

করে অথবা তাঁহার নিকট তাহার অন্তরের আবেদন বা প্রার্থনা জানায়, সে অচেতন মৃন্ময় কালীমূর্তির নিকট ইহা করে না। তাহার বিশ্বাস যে মন্ত্রাদি যোগে কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিবার ফলে, অদৃশ্য দেবী মা কালীর অধিষ্ঠান (অর্থাৎ অবস্থিতি) ঐ মূর্তির ভিতর হইয়াছে এবং সে ঐ অদৃশ্য দেবী মা কালীকে তাহার অন্তরের ভক্তি ও প্রার্থনা জানাইতেছে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারে "মন্ত্রের কি এই প্রকার শক্তি আছে?" উল্লিখিত প্রকারের মন্ত্র শক্তিতে কিছু হিন্দু বিশ্বাস করে। কিছু হিন্দু করে না। যাহারা বিশ্বাস করে তাহারাই বাহ্যিক পূজা করে; যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারা ইহা করে না। নব্যভারতে স্বাধীন ও প্রগতিশীল চিন্তার অন্যতম অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় মন্ত্রশক্তিতে তাঁহার অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অনেক শিক্ষিত হিন্দু তাঁহাকে তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছিলেন। এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিবে, "যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি কোথায় আছেন এবং কোথায় নাই?" নিরীশ্বর জড়বাদিগণের নিকট এই প্রশ্ন নিরর্থক। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহারা এই প্রশ্নের কী উত্তর দিবে? ঈশ্বর কি স্বর্গে বা আকাশের অন্য কোন স্থানে আছেন, পৃথিবীতে নাই? যদি কেহ এইরূপ বলে, বৈদান্তিকগণের মতে সে অজ্ঞ ও ভ্রান্ত। বিশ্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তিভাবে ঈশ্বর সর্বত্র আছেন; সুতরাং কোন হিন্দু যে মূর্তি বা প্রতীকের সাহায্যে ঈশ্বর বা দেবদেবীর পূজা করে, তাহার ভিতরও ঈশ্বর আছেন। কিন্তু জীবের ভিতর, বিশেষতঃ মানুষের ভিতর, ঐশ্বরিক চিৎশক্তির যে প্রকার প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, কোন মন্ত্রের সাহায্যে কোন মূর্তি বা প্রতীকের ভিতর ইহার সেইরূপ প্রকাশ হয় না। এখন যে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারে, "তাহা হইলে কেন হিন্দুরা মূর্তি বা প্রতীকের ব্যবহার করে?"

মূর্তি বা প্রতীকের ব্যবহারের পঞ্চোদ্দেশ্য (অর্থাৎ পাঁচটি উদ্দেশ্য) আছে। প্রথম উদ্দেশ্য :—আমরা জাগতিক জীবনের কাজকর্ম লইয়া

সাধারণতঃ এত ব্যস্ত থাকি যে আমরা দেবদেবী বা ঈশ্বরের কথা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। তখন কোন দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতীক দেখিলে, তাহা তৎসংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর কথা অথবা ঈশ্বরের কথা মনে করাইয়া দেয়। যে হিন্দু জানে যে কোন দেবতার মূর্তি বা প্রতীক প্রকৃতিযুক্ত এক ঈশ্বরের চিহ্ন বা নিদর্শন মাত্র, সে সেই এক ঈশ্বরেরই চিন্তা করে। অতএব দেবতার মূর্তি বা প্রতীক দেবদেবীর বা ঈশ্বরের স্মারকরূপে কার্য করে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য :—মানুষের মনের ভিতর স্বাভাবিকভাবে ভক্তির ভাব থাকে। মূর্তি বা প্রতীক দেবদেবী বা ঈশ্বরের কথা মনে করাইয়া দেওয়ার পর তাহার ভিতর তাঁহাদের প্রতি ভক্তির ভাব জাগাইয়া দেয়। মূর্তি ও প্রতীক অপেক্ষাকৃত স্থায়ী জিনিস বলিয়া ইহারা অদৃশ্য দেবদেবী বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির ভাব জাগাইয়াও রাখে। মানুষ যেমন পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চায়, ঐ ভাবে সে দেবদেবী বা ঈশ্বরকে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। মূর্তি ও প্রতীক তাহাকে ঐ কাজে সাহায্য করে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য :—মূর্তি বা প্রতীক মনকে একাগ্র করিতে সাহায্য করে। অধিকাংশ মানুষের মন সাধারণতঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি একটি স্থূল মূর্তি বা প্রতীকের উপর তাহার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিয়া কেবল ঐ মূর্তি বা প্রতীকের চিন্তা করে, অথবা যে অদৃশ্য দেব বা দেবী বা ঈশ্বর ইহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া সে মনে করে, কেবল তাঁহারই কথা চিন্তা করে, তাহা হইলে প্রাত্যহিক অভ্যাসের ফলে তাহার মন ক্রমশঃ একাগ্রতা লাভ করিবে। এই একাগ্র মনের সাহায্যে সে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে এবং পরে ঈশ্বরে সমাধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ উদ্দেশ্য —বিভিন্ন মূর্তি বা প্রতীকের সহিত বিভিন্ন প্রকার চিন্তাধারা জড়িত বা যুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহারা বিভিন্ন প্রকার কর্তব্যের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। যথা সরস্বতীর মূর্তি

সর্বপ্রকার বিদ্যায় অগ্রগতির আবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আবার লক্ষ্মীর মূর্তি সর্বপ্রকার শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতার কথা মনে করাইয়া দেয়।

পঞ্চম উদ্দেশ্য :—কোন স্থানে একটি মন্দির, বা দালান বা মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহার ভিতর কোন দেবতার মূর্তি বা প্রতীকের প্রতিষ্ঠা করিলে এবং সেই স্থানে পূজার ব্যবস্থা করিলে, তাহা বহু বালক বালিকাকে এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোককে আকৃষ্ট করে এবং ইহা কতকটা ব্যাপক আকারে ধর্মভাব বিস্তারে সাহায্য করে।

হিন্দুসমাজের সমস্ত লোককে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা অন্ততঃ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা শিক্ষিত বলিতে পারি। অপরা বিদ্যা বা জাগতিক বিদ্যার দিক হইতে এই দুই ভাগ করা চলে। কিন্তু পরাবিদ্যার দিক হইতে আবার সমস্ত হিন্দুকে নিম্নাধিকারী ও উচ্চাধিকারী এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে উচ্চাধিকারী ও নিম্নাধিকারী ভেদ থাকায় এবং অশিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে ঐ দুই প্রকার ভেদ থাকায় সমস্ত হিন্দুসমাজ নিম্নলিখিত চারিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

(১) শিক্ষিত উচ্চাধিকারী—
(২) শিক্ষিত নিম্নাধিকারী
(৩) অশিক্ষিত উচ্চাধিকারী
(৪) অশিক্ষিত নিম্নাধিকারী

জাবালোপনিষদে বলা হইয়াছে—

শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
অজ্ঞানাং ভাবনার্থায় প্রতিমাঃ পরিকল্পিতাঃ॥

অর্থাৎ যোগীগণ নিজ আত্মার ভিতর শিবকে (অর্থাৎ ঈশ্বরকে) দেখেন, প্রতিমাসমূহের ভিতর নহে। অজ্ঞব্যক্তিগণের চিন্তার সুবিধার জন্য প্রতিমাসমূহ পরিকল্পিত হয়।

কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যা শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

অর্থাৎ কেবল সাধকগণের হিতসাধনের জন্য চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিগুণ, অশরীরী ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হয়।

ব্রহ্মের কোন শরীর নাই; প্রকৃতির ভিতর যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ আছে, এইগুলি ব্রহ্মের ভিতর নাই, সুতরাং তিনি নির্গুণ; তিনি অতিসূক্ষ্ম চিৎশক্তিমাত্র, সেইজন্য তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। ব্রহ্মের রূপকল্পনা করিয়া তদনুসারে মূর্তি প্রভৃতি গঠন করিলে, সাধক তাহাদের সাহায্যে মনকে স্থির ও একাগ্র করিতে পারেন। তখন দিনের পর দিন ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়। স্থূল মূর্তির ভিতর ঈশ্বরের কোন বিশেষ প্রকাশ নাই। জীবাত্মাই ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং জীবাত্মার ভিতরই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ ঘটে। সেইজন্য মনকে একাগ্র করিয়া বহির্জগতের সমস্ত কিছু হইতে ইহাকে টানিয়া আনিতে হয় ও নিজ আত্মায় ইহাকে স্থাপিত করিতে হয়। ইহাকেই যোগসাধনা বলা হয়। ক্রমাগত এই প্রকার চেষ্টার ফলে সাধক যখন ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইতে পারে, তখন সে ঐ ধ্যান মগ্ন অবস্থায় ঈশ্বরজ্ঞানের আভাস লাভ করিতে পারে। সেই জন্য জাবালোপনিষদে বলা হইয়াছে যে যোগিগণ নিজ আত্মায় ঈশ্বরকে দেখেন। কিন্তু সাধনার প্রথমাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি মূর্তি বা প্রতীক ব্যবহার করিতে পারে। ইহা কেন নিন্দনীয় কার্য নহে। আমরা মূর্তি বা প্রতীককে খঞ্জের (অর্থাৎ খোঁড়া লোকের) যষ্ঠি বা লাঠির সহিত তুলনা করিতে পারি। যদি কোন লোকের একটি পায় আঘাত লাগে, অথবা একটি পা বাত প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং সে কিছুদিন লাঠির সাহায্যে চলে, সে নিশ্চয়ই কোনপ্রকার নিন্দনীয় কার্য করে না। সেইভাবে নিম্নাধিকারীগণ সাময়িকভাবে মূর্তি বা প্রতীকের ব্যবহার করিয়া কোন নিন্দনীয় কার্য করে না।

আমরা মন্দিরসমূহকেও একপ্রকার প্রতীক বলিতে পারি।

কারণ এইগুলিও বিশ্বাসী হিন্দুগণকে দেবদেবী বা ঈশ্বরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহাদের মনে তাঁহাদের প্রতি ভক্তির ভাব জাগাইয়া দেয়। কোন কোন হিন্দু প্রকাশ্যভাবে দুই হস্ত তুলিয়া অদৃশ্য দেবদেবীকে নমস্কারও করে।

গীর্জাসমূহকেও মন্দিরসমূহের ন্যায় এক ঈশ্বরের প্রতীক বলা যাইতে পারে। কারণ ঐগুলিও মনে করাইয়া দেয় যে এই পবিত্র স্থানসমূহে যীশুখ্রীষ্টের অনুগামিগণ একেশ্বরের উপাসনার জন্য সমবেত হন। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে যাহাদের কিছু জ্ঞান আছে, গীর্জার উপরিস্থিত ক্রুশ তাহাদিগকে ধর্মের জন্য যীশুখ্রীষ্টের আত্মত্যাগের কথা, শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ হইবার জন্য এবং সকলকে নিজের ন্যায় ভালবাসিবার জন্য যীশুখ্রীষ্ট যে মহান শিক্ষা-সমূহ দিয়াছিলেন তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোন কোন খ্রীষ্টান ক্ষুদ্র ক্রুশ এবং যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি বা ছবিকে প্রতীকভাবে ব্যবহার করে। তাহারা যে যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার মনে করে, ঐ প্রতীকগুলি তাহাদিগকে সেই যীশুখ্রীষ্টের কথা এবং এক ঈশ্বরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

মসজিদসমূহও ইসলামধর্মের প্রবর্তক ঈশ্বরানুপ্রাণিত মহম্মদ কীভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী করিয়াছিলেন, সমস্ত মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য হিতকর নিয়মাবলী প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইভাবে মন্দিরসমূহ, গীর্জাসমূহ ও মসজিদসমূহ পবিত্রস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া এবং দেবদেবী ও এক ঈশ্বরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সুবৃহৎ প্রতীকের কার্য করে।

মন্দিরসমূহের ভিতরে এবং অন্যান্য পূজাস্থানসমূহে যে সমস্ত মূর্তি বা প্রতীকের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাদের অর্থ সম্বন্ধে যাহার যেমন ভাল লাগে, সে সেইরূপ ব্যাখ্যা করে। নিচেও কয়েকটি মূর্তি

বা প্রতীকের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত আশ্রমভেদ অনুসারে এইগুলির ব্যবহার হওয়া সঙ্গত বলিয়া জীবনের আশ্রমের সহিত ইহাদিগকে সংযোজিত করা হইল।

ব্রহ্মাকে প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তার রূপ দেওয়া হয়; সেই জন্য মানবশিশুর জন্মের পূর্বে ব্রহ্মাকে স্মরণ করাই সঙ্গত। ব্রহ্মার অনুগ্রহে সমস্ত মানবশিশুর জন্ম হয় ও তাহারা ভালভাবে থাকে বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রজাগণের (অর্থাৎ জন্মপ্রাপ্ত সমস্ত জীবের) পতি বা প্রজাপতি বলা হয়। প্রজাপতি শব্দের অন্য অর্থ পতঙ্গ প্রজাপতি। যাহারা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের উপর পতঙ্গ প্রজাপতির ছবি ছাপিয়া দেয়, তাহারা মারাত্মক ভুল করে। প্রজাপতি ব্রহ্মার ছবিই তাহাদের ছাপা উচিত। পুত্রকন্যালাভই বিবাহের উদ্দেশ্য। সুতরাং বিবাহের সময় প্রজাপতি ব্রহ্মাকে স্মরণ করা সুসঙ্গত কাজ। মা ষষ্ঠী ব্রহ্মার কন্যা এবং শিশুগণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন। সেইজন্য শিশুর জন্মের কয়েকদিন পরে কেহ কেহ তাঁহার পূজা করে।

পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত নানাপ্রকার জীব আছে। কিন্তু ঐশী শক্তির প্রেরণায় প্রকৃতি কেবল মানুষের ভিতরই তাহার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। এই প্রকার কার্যে রত ঈশ্বরের সহিত যুক্ত প্রকৃতিকে মা সরস্বতী বলা হয়। বিদ্যাশ্রমে ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন প্রকার বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়। সেই জন্য মা সরস্বতীর পূজা তাহাদেরই পূজা। কিন্তু কেবল "মা বিদ্যা দাও" বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিলে, বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই আসিবে না। ঐ প্রকার প্রার্থনা কেবল নির্বোধ ও অলসের প্রার্থনা। যথাযথভাবে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, ছাত্রছাত্রীগণকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া আন্তরিকভাবে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। এই কথা তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়ার জন্য প্রতিবৎসর একবার সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা করা হয়। জ্ঞান ও বুদ্ধির গভীরতা ব্যক্তিকে ও জাতিকে শক্তিশালী করে। সুতরাং পরা ও অপরা বিদ্যা—উভয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিবার

জন্য ও সমগ্র সমাজের সুখশান্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেক বিদ্যাশ্রমীকে চেষ্টা করিতে হইবে।

বিষ্ণুকে প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের পালন কর্তার রূপ দেওয়া হয় এবং মহেশ্বর ব্যতীত অন্যান্য পুরুষ-দেবতাগণ তাঁহার সহায়করূপে কার্য করেন। সুতরাং তাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রমের পূজনীয় দেবতা। দেবীগণের মধ্যে মা কালী সংহারিকা শক্তিরূপে সর্বসংহারক মহেশ্বরের সহিত যুক্ত। সুতরাং ষষ্ঠী, সরস্বতী ও কালী ব্যতীত অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিষ্ণুর সহায়করূপে কার্য করেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমের পূজনীয় দেবী। ঈশ্বরের কোন স্থূলরূপ নাই। সেই জন্য বিষ্ণু বা নারায়ণের সাধারণতঃ কোন স্থূল মূর্তি গঠন করা হয় না। শালগ্রামই ইহার প্রতীক এবং এই প্রতীক সহযোগে বিষ্ণু বা নারায়ণের পূজা করা হয়। গার্হস্থ্যাশ্রমে লক্ষ্মী ও দুর্গার পূজা বিশেষভাবে করা হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি পৃথিবীতে জীবের জন্মের পূর্ব হইতে ঐশ্বরিক প্রেরণায় জীবের সুখযুক্ত জীবনধারণের জন্য খাদ্য প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা উৎপন্ন করিয়া আসিতেছে, তাহাকেই লক্ষ্মী বলা হয়। সর্বপ্রকার শস্য ও ফলমূল প্রভৃতি এবং অন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা প্রকৃতি উৎপন্ন করিতেছে—ইহা আমরা প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং মা লক্ষ্মীর পূজা করিবার সঙ্গত ভিত্তি আছে। প্রতিগৃহে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণকেই সকলের আহারাদির ব্যবস্থা, ও এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। স্ত্রীলোকগণ লক্ষ্মীর সহায়কভাবে কার্য করেন বলিয়া মা-লক্ষ্মীর পূজা স্ত্রীলোকগণের পূজারূপে গণ্য হইতে পারে এবং তাঁহারাই নিজে নিজে ইহা করিতে পারেন। অর্থকামনা করিয়া কোন কোন ব্যবসায়ীও লক্ষ্মীপূজা করেন।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপূজা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে এইভাবে দুর্গাপূজা করা হয় না মা দুর্গা কীভাবে অসুর ও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত কাহিনী পুরাণকারগণ লিখিয়া

গিয়াছেন। এই সমস্ত কাহিনীর বিশেষ মূল্য বর্তমানযুগে নাই। পশ্চিমবঙ্গে অদৃশ্য রক্ষিকা শক্তি মা দুর্গার যে প্রকার মূর্তি গঠন করিয়া সেই মূর্তির সহযোগে তাঁহার পূজা করা হয়, তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে কিনা এখন সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইবে। ঐশ্বরিক প্রেরণায় আদ্যাশক্তি প্রকৃতি আমাদিগকে বিভিন্ন সময়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখেন এবং আমাদের স্থূল দেহসমূহকে ও দেহধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্যসমূহকে রক্ষা করেন। ঈশ্বরযুক্ত প্রকৃতির এই রক্ষিকা শক্তিকে দুর্গা বলা হয়। দুর্গ শব্দের একটি অর্থ বিপদ। উল্লিখিত শক্তি আমাদিগকে ও আমাদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদিকে দুর্গ বা বিপদ হইতে রক্ষা করেন বলিয়াই, ইঁহার নাম দুর্গা। উল্লিখিত কারণে আমরা ইঁহাকে বলি "বিপত্তারিণী মা দুর্গা"। ঐ শক্তি আমাদের দুর্গতি দূর করিয়া দেন বলিয়া আমরা ইঁহাকে বলি "দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা"। এইভাবে মা দুর্গা এই শব্দ দুইটির পূর্বে আমরা বিভিন্ন বিশেষণ যোগ করি। দুর্গামূর্তিতে দশটি সশস্ত্র বাহু যোগ করা হয়। ইহার অর্থ এই যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু, উধর্ব ও অধঃ*—এই দশদিক হইতে যে সমস্ত বিপদ আসিতে পারে, মা দুর্গা সেই সমস্ত বিপদকে তাঁহার সশস্ত্র দশটি বাহুর দ্বারা প্রতিহত করিয়া রাখেন। মা দুর্গা সিংহবাহিনী অর্থাৎ সিংহ তাঁহার বাহন এবং তিনি সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া পশু-শক্তিকে (অর্থাৎ সিংহের পাশবিক শক্তিকে) দমন করিয়া রাখিয়াছেন তিনি মহিষ মর্দিনী অর্থাৎ মহিষ নামক অসুরকে তিনি মর্দন (অর্থাৎ দলন বা দমন) করিতেছেন এবং সে নিস্তেজ হইয়া আছে। ভক্তগণ আসিয়া মা দুর্গাকে বলে, "মা, আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা কর"। মা তখন সকলকে তাঁহার দিকে তাকাইতে বলেন এবং বলেন, "দেখ, আমি দশদিকে আমার দশটি সশস্ত্র বাহু প্রসারিত

* উত্তর-পূর্ব কোণকে ঈশান কোণ, দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে অগ্নি কোণ, দক্ষি পশ্চিম কোণকে নৈঋর্ত কোণ এবং উত্তর-পশ্চিম কোণকে বায়ু কোণ বলা হয়।

করিয়া তোমাদিগকে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি চেষ্টা করিলে কি হইবে? তোমাদের ভিতরেই অন্তঃশত্রুসমূহ রহিয়াছে। তোমরা যদি তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে না পার, কীভাবে তোমাদের মঙ্গল হইতে পারে? সিংহকে দমন করিয়া রাখিয়া আমি তোমাদিগকে দেখাইতেছি যে তোমাদের ভিতর অত্যধিক কামনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি যে সমস্ত পাশবিক প্রবৃত্তি আছে, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমি মহিষাসুরকে দমন করিয়া রাখিয়া তোমাদিগকে দেখাইতেছি যে তোমাদের ভিতর যে দম্ভ, দর্প, মিথ্যাপ্রীতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি আসুরিক ভাবসমূহ রহিয়াছে তাহাদিগকেও দমন করিয়া রাখা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমি আদ্যাশক্তি প্রকৃতির একটি বৃহৎ রূপমাত্র। আমার একদিকে যে লক্ষ্মীমূর্তি ও অন্যদিকে যে সরস্বতী মূর্তি দেখিতেছ, এই লক্ষ্মী ও সরস্বতী সেই একই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ। সরস্বতী তোমাদিগকে যে বিদ্যাবুদ্ধি দিয়াছে, আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহাকে আরও সমৃদ্ধ কর। লক্ষ্মী তোমাদিগকে যে ধান্যাদিধন দান করে, বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার পরিমাণ বর্ধিত কর ও সকলের মধ্যে সুবন্টনের ব্যবস্থা কর। মহেশ্বর ও আমার কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিক দেবসেনাপতিভাবে আমার একদিকে প্রান্ত সীমায় রহিয়াছে। তোমরা দেবভাবাপন্ন হইলে, কার্তিক ও তাহার দেবসেনাগণের সাহায্য পাইবে। মহেশ্বর ও আমার জেষ্ঠ্য পুত্র গণেশ মহেশ্বরের অনুচরগণের ও বিঘ্নকারকগণের অধিপতি। সে আমার অন্যদিকে প্রান্তসীমায় রহিয়াছে। সে সিদ্ধিদাতা। সুতরাং তোমরা দেবভাবাপন্ন হইলে, তোমরা গণেশের ও তাহার অনুগামিগণেরও সাহায্য পাইবে। আমার কথা অনুসারে কাজ করিলে, তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গে তিনচারদিন ধরিয়া উল্লিখিত অদৃশ্য পঞ্চদেবতার পঞ্চ স্থূলমূর্তি লোকসমক্ষে রাখা হয় এবং লোকে ইহাকে দুর্গাপূজা বলিয়া জানে। যাহাদের চোখ আছে, তাহারা ঠিকভাবে সমস্ত দেখে।

যাহাদের কান আছে, তাহারা মা দুর্গার সমস্ত কথা ঠিকভাবে শোনে; কারণ মার নীরব বাণী মানুষের বাগাড়ম্বর অপেক্ষা অনেক বেশী বাঙ্ময়। যাহাদের আন্তরিকতা আছে, তাহারা মার নির্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া নিজেদের দুর্গতিনাশের ব্যবস্থা করে ও সুখশান্তির অধিকারী হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মা কালীর পূজাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। মা কালীর পূজা ও মহেশ্বরের পূজাকে আশ্রমভেদে অধিক বয়সের উপযোগী পূজা বলা যাইতে পারে। কিন্তু কে এই মা কালী এবং কেনই বা তাঁহার নাম কালী হইল? আমরা দেখিয়াছি যে বিভিন্ন কালের (বা সময়ের) জন্য স্থিতির (বা অবস্থানের) পর জগতের মঙ্গলের জন্য প্রাণী ও অপ্রাণীসমূহের ধ্বংসের কাল উপস্থিত হয়। জীর্ণ-দশাপন্ন পুরাতনের বিনাশ প্রকাশমান তেজ ও সৌন্দর্যযুক্ত নূতনের শুভাগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। ঈশ্বর যখন রক্ষা করিবার প্রেরণা প্রকৃতির ভিতর হইতে প্রত্যাহার করিয়া লন এবং প্রকৃতির ভিতর সংহার করিবার প্রেরণা দান করেন, তখন ঈশ্বরের নাম হয় মহেশ্বর এবং প্রকৃতি সংহার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃতির নাম হয় কালী। কাল শব্দের দুইটি অর্থ আছে। ইহার প্রথম অর্থ কৃষ্ণবর্ণ-যুক্ত এবং দ্বিতীয় অর্থ সময়। জগতের সংহারকার্য আরম্ভ হইলে, জগতের আলোক ও সৌন্দর্য চলিয়া যায় এবং জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। প্রকৃতিকে নারীরূপে কল্পনা করা হয় এবং জগতের স্থিতির সময় প্রকৃতির যেন গৌরবর্ণ রূপ এইরূপ কল্পনা করিয়া সংহারিকা প্রকৃতির নাম দেওয়া হয় কালী অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা নারী প্রকৃতি। অতএব জগতের স্থিতির সময় যে আদ্যাশক্তি গৌরী বা দুর্গা নামে অভিহিত হন, তিনিই আবার ধ্বংসের সময় অন্যমূর্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণা কালী নামে অভিহিত হন। কালীর স্থূল মূর্তিকে ঐ জন্য কৃষ্ণবর্ণযুক্ত করা হয়। মা কালীর কালী নাম হইবার আর একটি সঙ্গত কারণও আছে। কাল শব্দের অন্য অর্থ সময় এবং কোন প্রাণী বা অপ্রাণীর কাল (অর্থাৎ স্থিতির সময়) পূর্ণ

হইলে, কেবল তখনই মহেশ্বর প্রকৃতির ভিতর প্রেরণা দিয়া তাহার সংহার বা বিনাশের ব্যবস্থা করেন। সেইজন্য মহেশ্বরের অন্য নাম মহাকাল (অর্থাৎ রুদ্র বা শিব) এবং গীতার ১১।৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো"—আমি (ঈশ্বর) লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ (অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে বা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কাল। এই কালের স্ত্রীলিঙ্গ কালী। অতএব মহেশ্বর যখন সংহারক কালের ভাব ধারণ করিয়া সংহার করিবার জন্য প্রকৃতির ভিতর প্রেরণা দান করেন, তখন আদ্যাশক্তি প্রকৃতির নামই কালী হইয়া যায়। মা কালীর যে স্থূল মূর্তি গঠন করা হয়, তাহাতে তাঁহাকে নৃমুণ্ডমালিনী ও ভীষণ মূর্তিধারিণীরূপে দেখান হয়। মা কালীর এইরূপ ভীষণ ও বিকট করাল মূর্তি কেন? তাঁহার কার্যের জন্য তাঁহার এইরূপ মূর্তি হইয়াছে—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যে প্রকৃতি সংহারিকা মূর্তি ধারণ করিয়া সংহারকার্য করিতেছে, তাহার কখনও লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী বা জগদ্ধাত্রীর মূর্তির ন্যায় মনোহর বা সুন্দর মূর্তি হইতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর হইতে কোটি কোটি লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সকলের স্থূল দেহ ছিল। কোথা হইতে তাহারা ঐ স্থূলদেহসমূহ লাভ করিয়াছিল এবং পরে আবার ঐ স্থূলগুলি কোথায় চলিয়া গেল? পূর্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রকৃতির নিকট হইতে তাহাদের স্থূলদেহসমূহ লাভ করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদানে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহাদের স্থূলদেহসমূহ গঠিত হয়। কাল (অর্থাৎ স্থূলদেহভাবে পৃথিবীতে থাকিবার কাল) পূর্ণ হইলে, প্রকৃতি আবার ঐ দেহগুলিকে নিজের বুকে টানিয়া লয় এবং তাহারা পুনরায় পঞ্চভূতে অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে মিশিয়া যায়। মৃত্যুকে সেই জন্য পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলা হয়। এই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য কালীর মূর্তিকে নৃমুণ্ডমালিনী নারীমূর্তিরূপে গঠন করা হয়। মহেশ্বরের সাধারণ রূপ উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির রূপ, কিন্তু

তাঁহার প্রেরণায় প্রকৃতি সংহারকার্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি শায়িত অবস্থায় চলিয়া গিয়া শববৎ (অর্থাৎ মৃতদেহের ন্যায়) নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করেন এবং তাঁহার বুকের উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতি কালীরূপে যথানিয়মে তাহার সংহারকার্য করিয়া যায়। মা কালীর মূর্তিতে চারিটি বাহু থাকে। বামদিকের একটি হস্তে খড়্গ এবং অন্য হস্তে সেই খড়্গের দ্বারা ছিন্ন একটি মুণ্ড থাকে। মা কালী ডানদিকের একটি হস্তের দ্বারা অভয়দান ও অন্য হস্ত দ্বারা বরদান করেন। মা কালী তাঁহার ভক্তগণকে বলেন, "আমার ভীষণ মূর্তি দেখিয়া, তোমরা ভয় পাইও না। ঐশ্বরিক বিধানে আমাকে সংহারকার্য করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাতে তোমাদের ভয়ের কিছুই নাই। তোমাদের আত্মাসমূহ অমর। বিভিন্ন মানুষের কাল পূর্ণ হইলে, আমি তাহাদের জরাজীর্ণ অথবা রোগভগ্ন দেহসমূহকে নিজের বুকে টানিয়া লই। ইহা তোমাদের নিকট অমঙ্গলজনক মনে হইলেও ইহা জগতের পক্ষে ও তোমাদের সমগ্র মনুষ্যসমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। তোমরা আমার সম্মুখে যে বলি দাও, তাহা হইতে মনে রাখিও যে কামনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি যে সমস্ত পাশবিক ভাব তোমাদের ভিতর আছে এবং দম্ভ, দর্প, মিথ্যাপ্রীতি, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যে সমস্ত আসুরিক ভাব তোমাদের মধ্যে আছে, তাহাদিগকে যত বেশী বলি দিতে পারিবে, অর্থাৎ হত্যা বা বিনষ্ট করিতে পারিবে, সেইভাবে তোমরা সুখ-শান্তির পথে ও মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমি তোমাদিগকে এই বর প্রদান করিতেছি। যাহারা সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইতে পারিবে এবং যোগসাধনা দ্বারা ঈশ্বর-সারূপ্য লাভ করিতে পারিবে, তাহারা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহারা ইহা করিতে পারিবে না, তাহাদের গতাগত অবস্থা চলিবে অর্থাৎ পৃথিবীর সুখভোগের পর তাহারা পরলোকে চলিয়া যাইবে, পৃথিবীর সুখভোগের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে আসিবে, আবার পরলোকে যাইবে। আবার পৃথিবীতে আসিবে (গীতা ৯।২১)। যতদিন মুক্তিলাভ না হয়,

ততদিন পর্যন্ত এইভাবে গমনাগমন চলিতে থাকিবে। কিন্তু যতই সাধনার পথে একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইবে, ততই মানসিক সুখশান্তি লাভ করিতে পারিবে।" অতএব কালীমূর্তি আমাদের সাধনার অত্যাবশ্যকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের উপকার করে।

উপরে মা কালীর মূর্তির সম্মুখে বলির কথা বলা হইয়াছে। সেইজন্য বলিদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। উপরে অদৃশ্য কোন কোন দেবদেবীর কথা, তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার কাজের কথা এবং আমাদের কর্তব্যের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা মনে করাইয়া দেওয়ার জন্যই স্থূল মূর্তি বা অন্য প্রকার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। বলিদানও একপ্রকার প্রতীক। আমাদের ভিতর যে কুপ্রবৃত্তিসমূহ রহিয়াছে, তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার আবশ্যকতার কথা এবং ক্রমাগত চেষ্টার দ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার আবশ্যকতার কথা মনে করিয়া দেওয়াই বলিদানের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার জন্য পশুবলি আবশ্যক নহে। পশুবলি তামসিক ব্যক্তিগণের তামসিক কার্য। পশুবলির পরিবর্তে কুষ্মাণ্ডবলির প্রথা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক। কুষ্মাণ্ড বলি হইবে সাত্ত্বিক বলি। পশু বলি পূজার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু কুষ্মাণ্ডবলি পূজার সাত্ত্বিক ভাবকে রক্ষা করে। সাধারণতঃ মা দুর্গার মূর্তির সম্মুখে এবং মা কালীর মূর্তির সম্মুখে পশুবলি দেওয়া হয়। অন্যান্য সমস্ত দেবদেবীর পূজা যদি পশুবলি ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে মা দুর্গা ও মা কালীর পূজা কেন পশুবলি ব্যতীত সিদ্ধ হইবে না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। মা দুর্গা সমস্ত প্রাণী অপ্রাণিগণের রক্ষয়িত্রী—এই ভাব লইয়া আমরা তাঁহার পূজা করি। কিন্তু আমরা তাঁহার মূর্তির সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার পশুকে বলি দিয়া সকলকে দেখাইয়া দিই যে তিনি তাহাদের 'রক্ষয়িত্রী নহেন। এইভাবে পশুবলি দ্বারা আমরা দুর্গাপূজাকে বিকৃত করিয়া ফেলি। এইপ্রকার অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট বলিয়া, পশুবলি দুর্গাপূজার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। বিভিন্ন মানুষের কাল পূর্ণ হইলে, মা কালী যেভাবে তাহাদের

স্থূল দেহসমূহকে নিজের বুকে টানিয়া লন, পশুগণের কাল পূর্ণ হইলে তিনি নিজেই সেইভাবে তাহাদের স্থূল দেহসমূহকে নিজের বুকে টানিয়া লইবেন। সেই জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন পশুর কাল পূর্ণ না হইলে, তাহাকে হত্যা করা কখনও মা কালীর ইচ্ছা হইতে পারে না। এই প্রকার বলিদান বা পশুহত্যার দ্বারা মা কালীকে সন্তুষ্ট করিবার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রাচীনকালে বেদের কর্মকাণ্ডের যুগে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল এবং অতিথি আসিলে অনেক সময় গোবৎস হত্যা করা হইত বলিয়া অতিথির একটি নাম হইয়াছিল গোঘ্ন। বৈদিক যজ্ঞের যুগে কখন কখন গোমেধ যজ্ঞও করা হইত। কিন্তু পরে গোমাংস ভক্ষণ ও গোমেধ যজ্ঞ পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইভাবে পূজার পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য পূজার ভিতর হইতে পশুবলি বর্জিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা ব্যতীত শিবপূজাও বেশ প্রচলিত আছে। কোন স্থূল মূর্তি গঠন না করিয়া একটি অপেক্ষাকৃত লম্বা প্রস্তরের সাহায্যে সাধারণতঃ শিবপূজা করা হয়। এই প্রস্তরকেই মহেশ্বর বা শিবের প্রতীক মনে করা হয়। শিবপূজায় মৃত্তিকা নির্মিত প্রতীকও ব্যবহার করা হয়। প্রজাপতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু লোকের মনে ভুল ধারণা থাকায় যেমন বিবাহে নিমন্ত্রণ পত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মার ছবি না ছাপিয়া কেহ কেহ পতঙ্গ প্রজাপতির ছবি ছাপে, সেইভাবে লিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু লোকের মনে ভুল ধারণা থাকায় তাহারা শিবলিঙ্গের সাহায্যে শিবপূজার কদর্থ ব্যাখ্যা করে। লিঙ্গ শব্দের প্রথম অর্থ চিহ্ন বা নিদর্শন। ইহার অন্য একটি অর্থ পুরুষের জননেন্দ্রিয়। শিবলিঙ্গ শব্দের প্রকৃত অর্থ শিবের চিহ্নমাত্র। শিব বা মহেশ্বর সর্বসংহারক। প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বর যখন প্রকৃতির ভিতর সমস্ত স্থূল মূর্তিকে ধ্বংস করিবার প্রেরণা দান করেন, তখনই তাঁহার নাম হয় মহেশ্বর বা শিব। যিনি সমস্ত স্থূল মূর্তিকে ধ্বংস করিবার মূলে রহিয়াছেন, তাঁহার আবার স্থূল মূর্তি হইবে কী ভাবে? সুতরাং তাঁহার পূজা করিবার সময় একটি

প্রস্তর নির্মিত অথবা মৃত্তিকা নির্মিত প্রতীক বা চিহ্নমাত্র ব্যবহার করা হয়। এই প্রতীকের সহিত কোন সমতল প্রস্তরখণ্ড যুক্ত থাকিলে, তাহাকে গৌরীপট্ট বলা হয়। পট্ট শব্দের অর্থ পাটা বা পিঁড়ি। সুতরাং গৌরীপট্টের অর্থ গৌরী বা দুর্গার প্রতীক বা চিহ্নস্বরূপ যে পাথরের পাটা তাহা। মহেশ্বর সর্বদা প্রকৃতির সহিত যুক্ত হইয়া আছেন এবং গৌরী বা দুর্গা এই প্রকৃতিরই একটি বৃহৎ রূপ। সুতরাং মহেশ্বর বা শিবের প্রতীকের সহিত গৌরীর প্রতীককে যুক্ত করা অসঙ্গত নহে। এই যুগ্ম প্রতীক আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয় যে দুর্গা যখন রক্ষয়িত্রীভাবে কার্য করেন, তখন শিব নিশ্চেষ্ট থাকেন। সাধারণ লোকে তখন শিবের মঙ্গলময় ভাবই লক্ষ্য করে। পরে কাল পূর্ণ হইলে, মহেশ্বর মহাকালরূপে কেবল স্থূল দেহেরই বিনাশ করেন। তখনও তিনি মানুষের অমঙ্গল করেন না। মানুষের আত্মা লিঙ্গদেহে বা সূক্ষ্মদেহে পরলোকে চলিয়া যায়। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি থাকিলে, ইহা পুনরায় পৃথিবীতে আসিতে পারে। কিন্তু বৈরাগ্য বা অনাসক্তি অভ্যাস করিয়া ইহা মুক্তির পথে ও দেবলোকের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং শিব মঙ্গলময় এইভাবে শিবের পূজা করা হয়। শিব শব্দের একটি অর্থ মঙ্গল বা মঙ্গলময়।

হিন্দুগণ যাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার মনে করে, তাহাদের মূর্তির সাহায্যে তাহারা কখন কখন ঈশ্বরের পূজা করে। এইভাবে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বা সীতারামের মূর্তির সাহায্যে তাহারা ঈশ্বরের উপাসনা করে। ঈশ্বরকে কৃষ্ণ আখ্যা দিয়া কেহ কেহ ঈশ্বরের উপাসনা করে।

(গ) দেশাত্মবোধ জাগাইবার কার্যে প্রতীকের ব্যবহার :—

দুর্গাপূজার সময় যে লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীর মূর্তি ব্যবহার করা হয়, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বা গ্রাজুইট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহা হইতে তাঁহার কল্পনাকে আরও প্রসারিত করিয়া তাঁহার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে ভারতমাতাকে

লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতী রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ও ইহার প্রাঞ্জল অর্থ দেওয়া হইল।

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্,
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটি-ভুজৈ-র্ধৃত-খর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল-ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে;
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং,
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্;
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

মার (অর্থাৎ ভারত মাতার) প্রশংসা করি। তুমি যথেষ্ট জলযুক্তা ও প্রচুর শস্যফলদাত্রী, (গ্রীষ্মের প্রারম্ভে দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে) মলয় পর্বতের উপর দিয়া যে বায়ু বহিয়া আসে, তাহার দ্বারা তোমার দেহ কতকটা শীতল হইয়া যায় এবং তোমার দেহ শস্যাবৃত হইয়া শ্যামলরূপ ধারণ করে; শুভ্র জ্যোৎস্নায় তোমার রাত্রি আনন্দযুক্ত হয় এবং প্রস্ফুটিত পুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা তুমি শোভাময় হও, (তোমাকে দেখিয়া মনে হয়) তুমি যেন মধুরভাবে হাস্য করিতেছ এবং অতি মধুরভাবে কথা বলিতেছ। তোমার সাহায্যে আমরা সুখলাভ করি এবং তুমি আমাদিগকে প্রার্থিত বস্তুসমূহ প্রদান কর।

তুমি সাতকোটি কণ্ঠের কলকল শব্দে ভীষণ মূর্তিধারিণী, চৌদ্দ কোটি বাহুদ্বারা তীক্ষ্ণ তরবারিধারিণী, এত শক্তি থাকিতে তুমি কিভাবে দুর্বল হইতে পারে? না, তুমি বহু শক্তিধারিণী, তুমি ত্রাণকর্ত্রী, তুমি সমস্ত শত্রুকে প্রতিহত করিতে পার, তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি বিদ্যাদান-করিয়াছ, তুমি ধর্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছ, তুমি আমাদের হৃদয়ে ও দেহের মর্মস্থানসমূহে অধিষ্ঠিত আছে, তুমি আমাদের শরীরে প্রাণশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছ; তুমিই আমাদের বাহুতে শক্তি দাও, তুমিই আমাদের হৃদয়ে ভক্তি জাগাইয়া দাও, আমরা মন্দিরে মন্দিরে যে (লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীর) মূর্তি গঠন করি, তাহা তোমারই প্রতিমূর্তি।

তুমিই দশ অস্ত্রধারিণী দুর্গা, প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহের উপর ক্রীড়াকারিণী লক্ষ্মী, বিদ্যাদাত্রী সরস্বতী, তোমাকে প্রণাম করি; নির্মলা, অতুলনীয়া, যথেষ্ট জলযুক্ত, প্রচুর শস্যফলদাত্রী মা লক্ষ্মীকে প্রণাম করি। শ্যামলা, সরলা, মৃদুহাস্যকারিণী, ভূষণশোভিতা, সর্বধারিণী, পোষণকারিণী, মার প্রশংসা করি।

বঙ্কিমচন্দ্র ডিপিউটি ম্যাজিস্ট্রেটভাবে সরকারী কর্মচারী হইলেও তিনি তাঁহার আনন্দমঠ নামক উপন্যাসে এই বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতটি

সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতে তিনি ভারতমাতাকেই প্রকৃতির অংশভাবে লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীরূপে কল্পনা করিলেন। দুর্গাপূজার সময় মা দুর্গাকে যেমন প্রধান্য দেওয়া হয়, বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতে ঐ ভাবে তিনি ভারতমাতার দুর্গারূপটিকে প্রাধান্য দিলেন। ভারতমাতার বহুকোটি সন্তান থাকায়, তাঁহার বিরাট জনবল রহিয়াছে। তাঁহার সাতকোটি সন্তান অস্ত্রধারণের সমর্থ। তাহারা যদি তাহাদের চৌদ্দকোটি বাহু দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া ভারতমাতার দশটি সুবৃহৎ সশস্ত্র বাহু গঠন করে এবং আপনাদিগকে দশদিকে প্রসারিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে ভারতমাতার সেই শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিবে। সেই শক্তি যে কোন শত্রুকে পরাভূত ও দূরীভূত করিতে পারিবে এবং তাহাকে প্রতিহত করিয়াও রাখিতে পারিবে। বিভিন্ন শব্দের দ্বারা ভারতমাতার লক্ষ্মীরূপের সুন্দর বর্ণনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ভারতমাতার সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। ভারতমাতার সন্তানগণের যাহাকিছু আবশ্যক, তাহা তাহারা তাহাদের মাতার সুবৃহৎ ভাণ্ডার হইতেই পাইবে। সুতরাং তাহাদের ধনবলের অভাব নাই। ভারতমাতা যে সরস্বতী-ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতাকে "বিদ্যাদায়িনী বাণী, তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম" বলিয়া সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। ভারতমাতার সন্তানগণ প্রাচীনকাল হইতে বিবিধ জাগতিক বিদ্যার চর্চা করিয়া আসিতেছে এবং ধর্মচর্চাতেও তাহারা অগ্রণী হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভারতমাতার সন্তানগণের বিদ্যাবলের ও ধর্মবলের অভাব নাই এবং তাহারা তাহাদের বিদ্যা-বলকে প্রয়োজন অনুসারে আরও বাড়াইতে পারিবে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন যে ভারতমাতার সন্তানগণের অস্ত্রবলের অভাব আছে; কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও বেশী অভাব রহিয়াছে তাহাদের মনোবলের। তাহারা যথেষ্ট মনোবল অর্জন করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে তাহাদের অস্ত্রবলের অভাব থাকিবে না সুতরাং বন্দে-মাতরম্ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসিগণকে তাহাদের জনবল,

ধনবল, বিত্তাবল ও ধর্মবলের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদের ভিতর দেশপ্রীতি জাগাইয়া দেওয়া এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈদেশিক শত্রুর সহিত যে সংগ্রাম আবশ্যক, তাহার জন্য ভারতবাসিগণের সংহতিসাধন করিয়া তাহাদের মনোবলের বৃদ্ধি সাধন করা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিদেশী শাসকগণ যখন অবিভক্ত বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার পরিকল্পনা করিল, তখন বাঙালীগণ ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিল। তখন বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কিছু কিছু শোনা গেল। পরে ভারতের অদ্বিতীয় জননায়ক মহাত্মা গান্ধী যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত আরও জনপ্রিয় হইল এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি একটি মহাশক্তিশালী রণহুঙ্কারে পরিণত হইল। এই ধ্বনি সমস্ত ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিল যে ভারতমাতা তাহাদেরই মাতা এবং মাতৃসম্পদের অধিকারী হইয়া, ইহাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। ইহা তাহাদিগকে আরও মনে করাইয়া দিল যে যে ইংরাজগণ ভারত অধিকার করিয়া আছে, তাহারা ভারতমাতার সন্তানগণের স্বাধীনতা অপহরণকারী ও সম্পদলুণ্ঠনকারী বৈদেশিক দস্যুমাত্র। সুতরাং তাহাদিগকে সর্বপ্রযত্নে বাধা দিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে। মহাত্মা-গান্ধীর আন্দোলন ক্রমশঃ দেশব্যাপী নিরস্ত্র নৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইল। এই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাহিরে গিয়া ইংরাজ শত্রুগণের সহিত সশস্ত্র সংগ্রাম করিবার জন্য তাঁহার আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করিলেন। তাঁহার সমরধ্বনি হইল "জয় হিন্দ" অর্থাৎ ভারতের জয় হউক। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন কোন নেতা ইংরাজগণের হস্তে বন্দী হইল এবং তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সেই সময় দেখা গেল যে ইংরাজগণের অধীনস্থ ভারতের নৌসেনাগণ এবং স্থলসৈনিকগণ আজাদ হিন্দ ফৌজের উল্লিখিত নেতাগণের

সশস্ত্র বিদ্রোহিতার সমর্থক। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের অগণিত জনগণের নিরস্ত্র বিদ্রোহিতা ইংরাজ শাসকগণকে ইতিপূর্বেই কতকটা বিপর্যস্ত করিয়াছিল। এখন যে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী সমূহের সাহায্যে তাহারা ভারতকে অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও বিদ্রোহীর সুস্পষ্ট মনোভাব আসিয়া গিয়াছে দেখিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ইংরাজগণ চিন্তান্বিত ও বিচলিত হইল। অবশেষে তাহাদের মনে সুবুদ্ধির উদয় হইল এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া তাহারা ভদ্রভাবে ভারতত্যাগ করিল। ইহার ফলে ইংরাজগণের সহিত ভারতবাসিগণের সদ্ভাব যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে আমরা দেখিতেছি যে ভারতের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক সুভাষচন্দ্রেরও অবদান রহিয়াছে এবং তাঁহার এই অবদান তাঁহাকেও স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ভারতের দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্থান লাভ করিয়াছে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্থায়ীমূল্য আছে। তাহারা সমস্ত ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে জাতিধর্মনির্বিশেষে তাহারা সকলেই ভারতমাতার সন্তান। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ভারতমাতার সম্পদে তাহাদের প্রত্যেকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।

দুর্গাপূজার সময় লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতীর যে মূর্তি গঠন করা হয়, ঐ তিনটি মূর্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে ভারতমাতারই প্রতিমূর্তি বলিয়াছেন এবং তাঁহার লেখনী দ্বারা ঐ তিনটি মূর্তিকে তিনি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা দুর্গাপূজার সময় গঠিত ঐ তিনটি মূর্তিকে কাগজের উপর বা অন্য কিছুর উপর সুন্দরভাবে চিত্রিত করিতে পারি। ঐ সময় মা দুর্গার দুইপুত্ররূপে কল্পিত কার্তিক ও গণেশের মূর্তিকে যে ভাবে স্থান দেওয়া হয়, আমরাও আমাদের চিত্রে কার্তিক ও গণেশকে দুইপ্রান্তে স্থান দিতে পারি। একই চিত্রের ভিতর এইভাবে লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশের

মূর্তি থাকায় তাহা ভারতমাতার কতকটা পূর্ণ প্রতীকরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে এবং বিভিন্ন লোকের নিকট ইহা বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক বা প্রকাশক হইয়া রহিবে। সিংহ ও অসুর দমনকারী দুর্গামূর্তি প্রত্যেক ভারতবাসীকে প্রত্যহ স্মরণ করাইয়া দিবে যে তাহার মধ্যে কোন পাশবিক বা আসুরিক ভাব থাকিলে, তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য তাহা তাহাকে যতদূর সম্ভব দমন করিয়া রাখিতে হইবে এবং ভারতের স্বাধীনতা ও সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্যও তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। চিত্রিত লক্ষ্মীমূর্তি সমস্ত ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া ভারতের সম্পদের বৃদ্ধিসাধন ও সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাদের দুঃখকষ্ট অন্ততঃ বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে। চিত্রিত সরস্বতী মূর্তি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া তাহারা ধর্ম বা ন্যায়ের পথে চলিলে জাগতিক বিদ্যা ও পরাবিদ্যা সম্মিলিতভাবে তাহাদিগকে সুখশান্তি লাভে সাহায্য করিবে। দেবসেনাপতি কার্তিকের চিত্রিত মূর্তি ভারতের সর্বপ্রকার সৈন্যবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ককে স্মরণ করাইয়া দিবে যে কার্তিকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভারতের স্বাধীনতা ও সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে এবং তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ও সৈন্যগণকেও ইহা তাহাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎকায় অহিংস প্রাণী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। গণেশ ক্ষুদ্রদেবগণের অধিপতি এবং নরহস্তীরূপে তাঁহার একটি দীর্ঘ শুণ্ড আছে। গণেশের চিত্রিত মূর্তি প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে তাঁহাকে সিদ্ধিদাতা গণেশের ন্যায় কার্য করিতে হইবে এবং ভারতের সমস্ত জনগণের অধিপতি ও শুভানুধ্যায়ীভাবে তাঁহাকে তাঁহার ভালবাসা, সদিচ্ছা ও হিতসাধনের শুণ্ডকে প্রসারিত করিয়া তাহার দ্বারা ভারতের অগণিত জনসাধারণকে বেষ্টিত ও আলিঙ্গনাবদ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে তিনি গণেশের রূপ ধারণ করিলে, তিনি সিদ্ধিদাতা

হইতে পারিবেন এবং ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে। পঞ্চমূর্তি সমন্বিত ভারতের এই প্রতীক প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে এবং আপত্তি না থাকিলে কোন অহিন্দু ভারতবাসীর গৃহে থাকিয়া ভারতের জাতীয় সংহতি সাধনে সাহায্য করিবে।

ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকাও ভারতের প্রতীক। পতাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ পবিত্রতার প্রতীক। ইহার উপরে অবস্থিত কমলালেবুর ত্বকের বর্ণ ত্যাগের প্রতীক। (ভারতের অনেক সন্ন্যাসী গৈরিকবর্ণকে ত্যাগের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন)। বৃক্ষলতাদির ভিতর শান্তি বিরাজ করে বলিয়া তাহাদের পাতার সবুজ রং শান্তির প্রতীক এবং পতাকার নিম্নভাগে এই সবুজ বর্ণকে স্থান দেওয়া হয়। সুতরাং ভারতের জাতীয় পতাকা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে যদি বিভিন্ন মানুষের ও জাতির অন্তরে ধর্মীয় বা নৈতিক পবিত্রতা থাকে এবং তাহারা যদি পরস্পরের জন্য ত্যাগ করিতে শেখে, তাহা হইলে যে শান্তি তাহারা চায়, তাহা পৃথিবীতে ও মানবসমাজে সহজেই নামিয়া আসিতে পারে। অন্তরের পবিত্রতা ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ হইতে শান্তি আসিতে পারে—ইহাই ভারতের জাতীয় পতাকার শিক্ষা। [বঙ্কিমচন্দ্র ভারতকে মাতৃরূপে দেখিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে অসঙ্গত মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহা অসঙ্গত নহে। আমাদের মানুষী মাতাগণ তাঁহাদের দেহের অন্তর্গত প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের দ্বারা আমাদের দেহসমূহকে গঠন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের দেহসমূহ ভারতের মাটি হইতে উৎপন্ন নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, ভারতের জল, ভারতের উপর আগত সূর্যের তেজ, ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ভারত প্রকৃতিমাতারই অংশমাত্র এবং প্রত্যেক ভারতবাসী তাহার মানুষী মাতার দেহের ভিতর দিয়া ভারতীয় প্রকৃতি হইতে তাহার দেহের উপাদানসমূহ লাভ করিয়াছে এবং ভারতীয় প্রকৃতিই তাহার দেহধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা তাহাকে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছে। সুতরাং যে ভারতীয় নাগরিকের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি জন্মিয়াছে, সে ভারতকে মাতা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না।]

দশম অধ্যায়

উপসংহার

তিন একত্ব—এক ঈশ্বর, এক মানবসমাজ ও এক মানবধর্ম

বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘ

১। এক ঈশ্বর :—

এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে সমগ্র বিশ্বের মূল সত্তাকে আমরা এক বলিতে পারি ; কারণ ঐ মূল সত্তায় চিৎশক্তি ও অচিৎ বা জড়শক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে অনাদিকাল হইতে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া যুক্ত হইয়া রহিবে। দ্বিভাবাপন্ন এই মূল সত্তার উৎপত্তি হয় নাই এবং বিনাশও হইবে না। ঐ মূল সত্তার নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বিশ্বের সর্বত্র সর্বদা সক্রিয়-ভাবে থাকেন না। কোন স্থানে চিৎশক্তি সক্রিয় হইলে, অচিৎ-শক্তিও সক্রিয় হইয়া উঠে। চিৎশক্তি সক্রিয় হইলে, তখন তাহার নাম দেওয়া হয় সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। বিশ্বের মূল সত্তায় যে জড়-শক্তি থাকে, তাহাকে মূল প্রকৃতি বলা হয়। ঈশ্বরের প্রেরণায় মূল প্রকৃতি নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ ধারণ করে। স্থূলরূপধারী প্রকৃতিকে আমরা জগৎ বলি এবং প্রকৃতিও বলি। জগৎ প্রাণিগণের স্থূলদেহ ধারণের উপযোগী হইলে, ঐশ্বরিক চিৎশক্তি জড়শক্তিকে প্রাণশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং এই প্রাণশক্তিকে ভিত্তি করিয়া চিৎশক্তি ক্রমশঃ নিজেকে বিভিন্ন স্তরে প্রকাশিত করে। পৃথিবীতে মানুষের ভিতর আমরা ঐশ্বরিক চিৎশক্তির উচ্চতম প্রকাশ দেখিতে পাই। সমস্ত মানুষের জীবাত্মা একই প্রকারের এবং এই জীবাত্মা-সমূহ এক ঈশ্বরের সনাতন অর্থাৎ চিরস্থায়ী অংশ। কিন্তু এই জীবাত্মাগণের পৃথক পৃথক দেহ, পৃথক পৃথক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পৃথক পৃথক পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক্ (কথা বলিবার জন্য মুখ, জিহ্বা প্রভৃতি), পাণি (দুইটি হস্ত),

পাদ (দুইটি পা), পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), পৃথক পৃথক মন, পৃথক পৃথক বুদ্ধি, পৃথক পৃথক অহঙ্কার (অর্থাৎ আমিত্ব-বোধ) থাকায় মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য হইয়া যায়। তাহার পর প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ মানুষের দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির ভিতর দিয়া বিভিন্নভাবে কার্য করিতে থাকায়, তাহাও মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য ঘটাইয়া দেয়।

ঈশ্বর এক হইলেও, প্রকৃতিযুক্ত ঈশ্বরের বা ঈশ্বরযুক্ত প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য অনুসারে ভারতের কিছু লোকে সেই এক ঈশ্বরকে বহুরূপী ঈশ্বর করিয়াছে এবং তাঁহাকে বহু দেবদেবীর আখ্যা বা নাম দিয়াছে। **কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সে যেকোন দেব বা দেবীর পূজা করুক না কেন, ইহা সেই এক ঈশ্বরেরই পূজা এবং সেই বিশ্বব্যাপী এক চিন্ময় ঈশ্বরের পূজাই সে করিতেছে।** ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকে ভাল ধারণা করিতে পারে না এবং এই তত্ত্বসমূহ তাহারা ভুলিয়াও যায়। সেইজন্য ভারতে নানাপ্রকার মূর্তিও অন্যান্য প্রকার প্রতীকের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই প্রতীক-গুলির প্রধান কার্য আমাদিগকে প্রথমতঃ এক ঈশ্বরের কথা এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের কর্তব্যাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। স্থিতপ্রজ্ঞ হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান মনে স্থিরতা লাভ করিলে, তখন আর কোন মূর্তি বা অন্যপ্রকার প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যক হয় না।

উত্তর গীতায় বলা হইয়াছে—

অনন্তং কর্ম শৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈব চ।
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥ ২।৪১

—(শাস্ত্রসমূহ হইতে এবং বিভিন্ন লোকের মুখ হইতে) মানুষ অনন্ত প্রকার ধর্মকর্মের কথা, শৌচের কথা, তপস্যা ও যজ্ঞের কথা এবং তীর্থযাত্রাদির কথা শুনিতে পাইবে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সে তদনুসারে কিছু কিছু কাজ করিতে পারে (২।৪১)।

হিন্দুধর্মে সমস্ত হিন্দুকে নিম্নাধিকারী ও উচ্চাধিকারী এই দুই

ভাগে বিভক্ত করা হয়। যাহারা ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতির ধারণা করিতে পারে না, বা তাহা মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের জন্যই নানাপ্রকার বাহ্যকর্ম, দ্রব্যময় যজ্ঞ, তীর্থযাত্রা, মূর্তি প্রভৃতির সাহায্যে পূজা ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। তাহারা নিম্নাধিকারী। যোগসাধনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। যাহারা যোগ-সাধনা করিতে সমর্থ, তাহারা উচ্চাধিকারী। তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত প্রকারের কোন বাহ্য অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না। সেই জন্য উত্তর গীতার ৩।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণ মৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যান পরায়ণাঃ॥

—অর্থাৎ আত্মধ্যানপরায়ণ যোগিগণ জলাশয়াদিযুক্ত তীর্থসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করেন না, কিংবা প্রস্তর বা মৃত্তিকা নির্মিত দেবমূর্তি-সমূহের সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা করেন না (৩।৬)।

অতএব যাহারা প্রকৃত ধর্মের পথে বা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চায়, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। সহজপ্রাপ্য গীতা পাঠ করিয়া, অথবা মাতৃভাষায় গীতার অনুবাদ শুনিয়া যে কোন লোক তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তিনটি উপায়ের কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন। এই তিনটি উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। অতএব প্রথমতঃ গীতা পঠন বা গীতা শ্রবণ আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ যাহা পাঠ করা হইবে বা শোনা হইবে, সেই সম্বন্ধে যখন তখন মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই মনন। তৃতীয়তঃ মনকে একাগ্র করিয়া ও অন্য সমস্ত চিন্তা মন হইতে দূরীভূত করিয়া, যে বিষয় সম্বন্ধে মনন করা হইতেছে, সেই সম্বন্ধে গভীর ধ্যান করিতে হইবে—ইহাই নিদিধ্যাসন। যাঁহারা তত্ত্বচিন্তা করেন, প্রয়োজন হইলে, তাঁহাদের সাহায্যও লওয়া যাইতে পারে।

গীতায় বলা হইয়াছে—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ॥ ৪।৩৪

-প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে এই জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন (৪।৩৪)।

২। এক **মানবসমাজ** :--

(ধর্মের অন্যান্য অঙ্গের সাধনার সহিত সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা)।

কেবল এক ঈশ্বরের ধারণায় উপনীত হইতে পারিলেই যে ধর্মসাধনা শেষ হইয়া গেল তাহা নহে। ঈশ্বরধ্যান ধর্মসাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গমাত্র। ধর্মসাধনার ছয়টি অঙ্গ আছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মসাধনার পাঁচটি অঙ্গের সাধনার কথা বলা হইয়াছে—(১) আত্মসংযম, (২) সমদর্শন, (৩) প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা (৪) নিষ্কামকর্ম ও দান, (৫) দৈবীসম্পদলাভের চেষ্টা। প্রথমতঃ, আত্মসংযমই ধর্মসাধনার ভিত্তি। কামনা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিকে কেহ যদি সংযত করিতে না পারে, সে কখনও প্রকৃতভাবে ধার্মিক হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মসাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে, সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। ধর্মসাধকের দৃষ্টিতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির ভিতর কোন ভেদজ্ঞান থাকিবে না। বহির্দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে কিছু ভেদ বা পার্থক্য আছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ নাই। তাহারা সকলেই এক ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদেব আত্মা লাভ করিয়াছে এবং এক প্রকৃতির নিকট হইতে তাহাদের স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়াছে। সুতরাং প্রকৃত ধর্মসাধকের দৃষ্টিতে থাকিবে পৃথিবীতে একটিমাত্র বিরাট মানবসমাজ। তাঁহাকে সর্বভূতাত্মভূতাত্মা হইতে হইবে (গীতা ৫।৭) অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আত্মাকে তাঁহার নিজের আত্মার ন্যায় মনে করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রাণীকেও যতদূর সম্ভব নিজের মত ভাবিতে হইবে। তাঁহাকে সর্বভূতহিতে রত হইতে হইবে (গীতা ৫।২৫, ১২।৪) অর্থাৎ তাঁহাকে সমস্ত মানুষের হিতকামী

হইতে হইবে এবং কাহারও কোনরূপ হিতসাধন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলে, তাহা তাঁহাকে করিতে হইবে; অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধেও তাঁহার ঐরূপ কর্তব্য হইবে। তৃতীয়তঃ, প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরধ্যান তাঁহাকে করিতে হইবে; কারণ ঈশ্বরের সহিত নিবিড় যোগের দ্বারা ঈশ্বরসারূপ্য লাভ তাঁহার সাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইবে। চতুর্থতঃ, ধর্মসাধকের পক্ষে কিছু কিছু নিষ্কাম কর্ম করাও আবশ্যক হয়। নিজের ও আত্মীয়স্বজনের জীবনধারণের জন্য বিবিধ কার্য ব্যতীত সমাজের মঙ্গলের জন্যও কিছু কিছু কার্য করা উচিত। কোন কিছুর জন্য প্রবল কামনা মনোমধ্যে না রাখিয়া কাজ করিতে হয় এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য অর্থদান সম্ভব না হইলে, অহঙ্কারশূন্য হইয়া শ্রমদান প্রভৃতি করিতে হয়। পঞ্চমতঃ, কোনরূপ অন্যায় না করিবার জন্য মনের অভয় ভাব, দেহবস্ত্রাদি ও মনের শুচিতা, দান, সরলতা, অহিংসা (অর্থাৎ অন্যকে কষ্ট না দেওয়া), সত্যপ্রীতি, দয়া, মৃদুতা, ক্ষমা, অন্য লোক অসম্মান করিলে তাহার প্রতি উপেক্ষা, প্রভৃতি যে গুণগুলিকে গীতায় দৈবীসম্পদ বলা হইয়াছে, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইপ্রকার গুণাবলী মানুষকে দেবভাবাপন্ন করে। সেইজন্য এইপ্রকার গুণসমূহ অর্জনের চেষ্টা ধর্মসাধককে করিতে হয়। বিদ্যাশ্রমে ধর্মের এই পঞ্চাঙ্গ সাধনার কথা এই পুস্তকে বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে ইহার সহিত আর একটি সাধনাকে যোগ করিতে বলা হইয়াছে। মানুষকে তাহার পার্থিব জীবনে আকাঙ্ক্ষার সাফল্য অসাফল্য, লাভক্ষতি, রোগনীরোগতা, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব বা বিপরীতভাবের সম্মুখীন হইতে হয়। অনুকূল কিছু ঘটিলে আনন্দে আত্মহারা হওয়া এবং প্রতিকূল কিছু ঘটিলে দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। এই দ্বন্দ্ব বা বিপরীত অবস্থাগুলি সাময়িক মনে করিয়া ধর্মসাধককে সর্বাবস্থায় মনের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্মসাধককে উল্লিখিত ষড়ঙ্গ সাধনা অর্থাৎ (১) আত্মসংযম, (২) সমদর্শন, (৩) প্রাত্যহিক ঈশ্বরধ্যান, (৪) নিষ্কাম কর্ম, (৫) দৈবীসম্পদ লাভের চেষ্টা এবং

(৬) মনের সমতারক্ষা—এই ছয়টি সাধনা করিতে হইবে। যাঁহারা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাদিগকে ইহার সহিত আরও দুইটি সাধনা যোগ করিতে হইবে। (৭) অনাসক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর কোন দ্রব্যের প্রতি বা পুত্রকন্যা কাহারও প্রতি সাধকের মনে কোনও প্রকার আসক্তি থাকিবে না। তিনি তাহাদের হিতকামী হইতে পারেন এবং সম্ভব হইলে নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে তাহাদের হিতসাধনও করিতে পারেন। (৮) ত্যাগ—জীবনধারণের জন্য যতটুকু খাদ্য প্রভৃতি আবশ্যক, তাহা ব্যতীত অন্যান্য সর্বপ্রকার পার্থিব দ্রব্য সাধক অবশেষে ত্যাগ করিবেন। উল্লিখিত আটটি সাধনাকে বেদান্তধর্মের অষ্টাঙ্গ সাধনা বলা হইয়াছে এবং ইহাই পূর্ণাঙ্গ সাধনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই সাধনার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক-ভাবের ভিতর দিয়া মনঃশিক্ষা, মনোনিয়ন্ত্রণ ও মনোগঠনের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে যতদূর সম্ভব সুখশান্তি লাভের চেষ্টা এবং অন্যেরও মঙ্গলসাধন।

৩। এক মানবধর্ম :—

ধর্মের উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধন করা। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ধর্মোপদেষ্টাগণ ধর্মোপদেশ দিয়াছেন। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে ধর্মোপদেশসমূহ প্রদত্ত হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ গড়িয় উঠিয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে চতুর্বেদ ষড়দর্শন, মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু স্মৃতিশাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া ধর্মসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেই তাহা শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রের এই গহন বা নিবিড় বন হইতে বাহির হইবার কিংবা নিষ্কৃতি লাভের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় সহজপ্রাপ্য গীতা পাঠ বা মাতৃভাষায় ইহার অনুবাদ পাঠ বা শ্রবণ। কিন্তু গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য এইরূপ মনে করাও উচিত নহে। মহাভারতের ভিতর

নানাপ্রকার উপাখ্যান প্রভৃতি যুক্ত করিয়া ইহাকে মহাকাব্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের অংশ গীতাকেও পল্লবিত করিয়া ইহাকে খণ্ডকাব্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে।

স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার। জন্মগ্রহণ করিবার সময় সে কোন স্থানে কাহারও নিকট এইভাবে দাসখত লিখিয়া দিয়া আসে নাই যে, সে যে ধর্মাবলম্বিগণের সমাজে জন্মগ্রহণ করিতেছে, সে সেই সমাজে প্রচলিত সমস্ত ধর্মমত নির্বিচারে স্বীকার করিয়া লইবে। যুক্তিবাদী জাব হিসাবে ইহা মানুষের আত্মমর্যাদার হানিকর। সত্যান্বেষী ও সত্যগ্রাহী (অর্থাৎ সত্যগ্রহণকারী)* হওয়া প্রত্যেক মানুষেরই উচিত। সুতরাং প্রথমতঃ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য ও হিতকর আছে, তাহাকে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ কোন ধর্মের সহিত অন্ধবিশ্বাস বা যুক্তিহীন বিশ্বাস জড়িত হইয়া থাকিলে বিচার করিয়া তাহাকে বর্জন করাই আমাদের উচিত। তৃতীয়তঃ অন্য কোন ধর্মের ভিতর কোন সত্য বা হিতকর কিছু থাকিলে, তাহাকে গ্রহণ করাই উচিত। কেবল এইভাবেই আমরা এক আদর্শ মানবধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে বিভিন্ন পদার্থবিদ্যা, বিভিন্ন রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি নাই। সেইভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিভিন্নধর্ম থাকা উচিত নহে। সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য সত্যের উপর ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক মানবধর্মের দিকে উল্লিখিতভাবে অগ্রসর হইয়া সেই মানবধর্মকে কার্যতঃ গ্রহণ করাই আমাদের সকলের কর্তব্য। ইহার ভিতর আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যধর্ম গ্রহণ বা নামপরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না; কারণ ইহার কোন প্রকার আবশ্যকতা নাই। কেবল এক মানবধর্মের ভিতর দিয়াই সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া উঠিতে পারে এবং ইহাই জগতের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইবে।

* সত্যের প্রতি কাহারও আগ্রহ থাকিলে তাহাকে সত্যাগ্রহী বলা হয়, কিন্তু কেহ সত্যকে গ্রহণ করিলে তাহাকে সত্যগ্রাহী বলা হয়।

বেদান্তধর্ম একটি সার্বজনীন ধর্ম এবং মানবধর্মের রূপ ধারণ করাই ইহার লক্ষ্য। মানুষের সমস্ত চিন্তার দুইটি সর্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহার প্রথম লক্ষ্য হইবে সত্যান্বেষণ ও সত্যগ্রহণ। কারণ শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হইবে, অসত্যের জয় হইবে না। কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ যেমন সহজে তাহা পরিত্যাগ করেন, বেদান্তিগণও ঐভাবে তাঁহাদের চিন্তাধারার ভিতর কোন অযৌক্তিক বা অসত্য কিছু দেখিতে পাইলে, তাহাকে পরিহার করেন; কারণ তাঁহারা সত্যের গ্রাহক, ধারক ও বাহক হইতে চান। কিন্তু ইহাও সকলকে মনে রাখিতে ইহবে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে সত্য নির্ণয় করা হয়, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিষয়ে সেইভাবে সত্য নির্ণয় সম্ভব হইবে না। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মে কিছু কিছু বিশ্বাসের স্থান থাকিয়া যাইবে। কোন বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ থাকিলে তাহাকে আমরা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস বলি। এই প্রকার বিশ্বাস সম্বন্ধেও মতভেদ ঘটিতে পারে। বিশ্বাস সম্বন্ধীয় মতভেদকে গুরুত্ব না দিয়া ইহাকে কতকটা উপেক্ষা করাই সঙ্গত হইবে। মানুষের সমস্ত চিন্তার দ্বিতীয় প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলসাধন এবং ধর্মের এই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকেই যতদূর সম্ভব গুরুত্ব দিতে হইবে।

৪। **বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘ :—**

উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য বেদান্তিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং একটি বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতে বেদান্তধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং ভারতের কোন সুবিধাজনক স্থানে বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় হওয়াই সঙ্গত হইবে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা গঠন করা আবশ্যক হইবে। বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘের পাঁচটি লক্ষ্য হইবে।

(১) সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যকে যতদূর সম্ভব সত্যগ্রাহী হইতে হইবে অর্থাৎ সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বেদান্তধর্মের সাধনার দ্বারা প্রত্যেক সভ্যকে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

(৩) আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অন্যান্য ব্যক্তিকে নিষ্কামভাবে সাহায্য করিতে হইবে।

(৪) সকলের হিতকামী হইয়া অন্য কাহারও হিতসাধন যেভাবে সম্ভব, তাহা প্রত্যেক সভ্যকে ধর্মানুমোদিতভাবে ও নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

(৫) পৃথিবীর দুঃখকষ্টহ্রাসের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে ও নিষ্কামভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমস্ত বেদান্তীকে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতের বাহিরে বিশ্ববেদান্তিসঙ্ঘ World Vedantic Association নামে পরিচিত হইবে।

লেখকের অন্য পুস্তক :—

Interpretation
of
Bondey Mataram,
the premier national song of India.